সিরিজ ॥ নারীর ফাঁদ-১
ঐতিহাসিক উপন্যাস

# ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাস

# ঈমানদীপ্ত দাস্তান

১

# ঈমানদীপ্ত দাস্তান-১

## আলতামাশ

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-১
আলতামাশ

অনুবাদ
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পরশমণি প্রকাশনা-৭
ISBN-984-8925-04-8


প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০১
পঞ্চম প্রকাশ
মে ২০০৬

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার (পাঠকবন্ধু মার্কেট)
ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

নিউ রহমানিয়া লাইব্রেরী
৭৩, সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৪৬৪০৭১

# প্রকাশকের কথা

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসনকাল। পৃথিবী থেকে–বিশেষত মিশর থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলে ক্রুশ প্রতিষ্ঠার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃস্টানরা। ক্রুসেডাররা সালতানাতে ইসলামিয়ার উপর নানামুখী সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনার পাশাপাশি বেছে নেয় নানারকম কুটিল ষড়যন্ত্রের পথ। গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী ভয়াবহ অভিযানে মেতে উঠে তারা। মুসলমানদের নৈতিক শক্তি ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী মেয়েদের। সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে একদল ঈমান-বিক্রেতা গাদ্দার তৈরি করে নিতে সক্ষম হয় তারা।

ইসলামের মহান বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী পরম বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, দু:সাহসিকতা ও অনুপম চরিত্র মাধুরী দিয়ে সেইসব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ছিনিয়ে আনেন বিজয়।

সুলতান আইউবী ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে অস্ত্র হাতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ লড়েছিলেন, খৃস্টানরা মুসলমানদের উপর যে অস্ত্রের আঘাত হেনেছিলো, ইতিহাসে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' নামে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত খৃস্টানদের নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও ছলনাময়ী রূপসী নারীদের লেলিয়ে দিয়ে মুসলিম শাসক ও আমীরদের ঈমান ক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্র এবং সুলতান আইউবীর তার মোকাবেলা করার কাহিনী এড়িয়ে গেছেন অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ। সেইসব অকথিত কাহিনী ও সুলতান আইউবীর দু:সাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হলো সিরিজ উপন্যাস 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'।

ভয়াবহ সংঘাত, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সুলতান আইউবীর ঈমানদীপ্ত কাহিনীতে ভরপুর এই সিরিজ বইটি ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়েপড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি বইটি পূর্ণমাত্রায় উপন্যাসের স্বাদও যোগাবে। আল্লাহ কবুল করুন।

বিনীত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা। **মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন**

সূচিপত্র ঃ

# নারীর ফাঁদ

১১৫৭ সালের এপ্রিল মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী আপন চাচাতো ভাই খলীফা সালেহ-এর গভর্নর সাইফুদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমরা খাঁচায় বন্দী রং-বেরংয়ের পাখি নিয়ে ফুর্তি করো। নারী আর সুরার প্রতি যাদের এতো আসক্তি, তাদের জন্য সৈনিক জীবন খুবই বেমানান।'

খলীফা সালেহ আর তার বংশজ গভর্নর সাইফুদ্দীন গোপনে মুসলিম খেলাফতের চিরশত্রু ক্রুসেডারদের চক্রান্তে ফেঁসে গেলেন। খেলাফতের রাজভাণ্ডার– মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত, দিনার-দেহরাম দিয়ে এই দুই শাসক ক্রুসেডারদের প্ররোচিত ও সহযোগিতা করতে লাগলেন সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে। সুলতান আইউবীকে হত্যা করার চক্রান্ত আঁটা হলো।

একদিন ঠিক কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি এসে গেলো ক্রুসেডারদের হাতে। তাঁরা মুসলিম শাসকদের মধ্যেই তালাশ করছিলো দোসর। খলীফা সালেহ স্বেচ্ছায় ক্রুসেডারদের সেই ভয়ানক চক্রান্তে পা দিলেন। খলীফা ও ক্রুসেডারদের সমন্বিত চক্রান্তে দু' দু'বার হত্যার উদ্দেশ্যে আইউবীর উপর আঘাত হানা হলো। দু'বারই সৌভাগ্যবশত বেঁচে গেলেন সুলতান সালাহুদ্দীন। তছনছ করে দিলেন ঘাতকদের সব চক্রান্ত। আঘাতে-প্রত্যাঘাতে পরাস্ত করলেন শত্রুদের। ফাঁস হয়ে গেল গভর্নর সাইফুদ্দীনের চক্রান্তের খবর।

গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে ক্রুসেডারদের দোসর গাদ্দার সাইফুদ্দীন ঘর-বাড়ী, বিত্ত-বৈভব ফেলে পালিয়ে গেলো। গভর্নরের আবাস থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ, বিলাস-ব্যসন। গভর্নরের বাড়িতে পাওয়া গেলো দেশী-বিদেশী অনিন্দসুন্দরী যুবতী, তরুণী, রক্ষিতা। এদের কেউ ছিলো নর্তকী, কেউ গায়িকা, কেউ বিউটিশিয়ান, কেউ ম্যাসেঞ্জার। সবই ছিলো সাইফুদ্দীনের মনোরঞ্জনের সামগ্রী ও ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের জঘন্য উপাদান।

সাইফুদ্দীনের বাড়ীতে আরো পাওয়া গেলো নানা রঙের নানা প্রজাতির অসংখ্য পাখি। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলানো ছিলো বিভিন্ন ভঙ্গিমার নগ্ন, অর্ধনগ্ন নারীদের উত্তেজক অশ্লীল ছবি। সুরাভর্তি অসংখ্য পিপা।

সালাহুদ্দীন খাঁচার বন্দী পাখীদের মুক্ত করে দিলেন। গভর্নরের বাড়ীতে বন্দী সেবিকা, নর্তকী, বিউটিশিয়ান ও শিল্পী-তরুণীদের আপনজনদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারপর সাইফুদ্দীনকে লিখলেন–

'তোমরা দু'জনে কাফের-বেঈমানদের দ্বারা আমাকে হত্যা করাবার অপচেষ্টায় মেতেছো। কিন্তু একবারও ভেবে দেখোনি, তোমাদের এই চক্রান্ত মুসলিম খেলাফতের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তোমরা আমাকে হিংসা করো। তাই আমাকে তোমরা ধ্বংস করে দিতে চাও। দু' দুইবার আমাকে হত্যা করার জন্যে লোক পাঠিয়েছো; কিন্তু সফল হতে পারোনি। আবার চেষ্টা করে দেখো, হয়তো সফল হবে। তোমরা যদি আমাকে এ নিশ্চয়তা দাও যে, আমার মৃত্যুতে ইসলামের উন্নতি হবে, মুসলমানদের কল্যাণ হবে, তাহলে কা'বার প্রভূর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের তরবারী দিয়ে আমার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করিয়ে তোমাদের পদতলে উৎসর্গ করতে অসিয়ত করে যাবো। আমি তোমাদের শুধু একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কাফের-বেঈমানরা কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। ইতিহাস তোমাদের চোখের সামনে। আমাদের সোনালী অতীতের দিকে একবার ফিরে দেখো। আশ্চর্য, রাজা ফ্রাংক-রেমণ্ডের মত প্রচণ্ড ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম শাসকরা তোমাদের সাথে একটু বন্ধুত্বের অভিনয় করলো, আর অম্নি তোমরা তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস যুগিয়েছো! ওরা যদি সফল হতো, তাহলে ওদের পরবর্তী প্রথম শিকার হতে তোমরা-ই। এরপর হয়তো দুনিয়া থেকে ইসলামী খেলাফত মুছে ফেলার কাজটিও সমাধা হতো।

তোমরা তো যোদ্ধা জাতির সন্তান। সৈন্য ও যুদ্ধ পরিচালনা তোমাদের ঐতিহ্যের অংশ। অবশ্য প্রত্যেক মুসলমান-ই আল্লাহর সৈনিক আর আল্লাহর সৈনিক হওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান ও কার্যকর ভূমিকা।

তোমরা খাঁচার পাখি নিয়ে ফুর্তি করো। মদ-নারীর প্রতি যাদের এত আসক্তি, সৈনিক জীবন ও যুদ্ধ পরিচালনা তাদের জন্যে খুবই বেমানান। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো। আমার সাথে জিহাদে শরীক হও। যদি না পারো, অন্তত আমার বিরুদ্ধাচারণ থেকে বিরত থাকো। আমি তোমাদের অপরাধের কোন প্রতিশোধ নেবো না। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আমীন।'

–সালাহুদ্দীন আইউবী

গভর্নর সাইফুদ্দীন গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নতুন চক্রান্তে মেতে উঠলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর চিঠি পড়ে তার মধ্যে দ্বিগুণ প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠলো। যোগ দিলো ইহুদী হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতক স্কোয়াডের সাথে। শুরু হলো নতুন চক্রান্ত। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র স্কোয়াড দীর্ঘ দিন ধরে ফাতেমী খেলাফতের আস্তিনের নীচে কেউটে সাঁপের মতো বিরাজ করছিলো।

❖ ❖ ❖

হাসান ইবনে সাব্বাহ্ একজন স্বভাব-কুচক্রী। ফাতেমী খেলাফতের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে সে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে তৎপর। শুভাকাঙ্ক্ষীর পোশাকে সর্বনাশী ষড়যন্ত্রের হোতা সে। অতি সংগোপনে ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করতে গোপনে গড়ে তোলে ঘাতক বাহিনী। বিস্ময়কর যাদুময়তায় সাধারণ মানুষের কাছে সজ্জন হিসেবে আসন গেড়ে নেয় তার বাহিনী। অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর মধ্যে। সাধারণ মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাস।

হাসান ইবনে সাব্বাহ'র গুপ্ত বাহিনীতে রয়েছে চৌকস নারী ইউনিট। ওরা যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমত্তী ও বিচক্ষণ। প্রাঞ্জল ভাষা ও বাকপটুতায় দক্ষ তারা। তাদের সংস্পর্শে গেলে যে কোন কঠিন মনের অধিকারী আর আদর্শিক পুরুষও মোমের মত গলে যায়। চক্রান্ত বাস্তবায়নে মাদক, নেশা, আফিম, হাশীশ, নাচ-গান ও ম্যাজিকের আশ্রয় নেয় তারা। এমনকি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হাসান বাহিনীর নারী গোয়েন্দারা নিজেদের দেহ বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। দীর্ঘ কঠোর প্রশিক্ষণ-অনুশীলনের মাধ্যমে উপযুক্ত হওয়ার পর শুরু হয় তাদের মূল কাজ। হাসান বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষ ইসলামী খেলাফতকে নির্মূল করতে এমন একটি ঘাতক বাহিনীর জন্ম দেয় যে, এই বাহিনীর প্রশিক্ষিত গোয়েন্দারা বেশ-ভূষা ও ভাষা বদল করে কৌশলী আচার-ব্যবহার দ্বারা ফাতেমী খেলাফতের শীর্ষ ব্যক্তিদের একান্ত বডিগার্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও হাত করে নেয়। এর ফলে বড় বড় সামরিক কর্মকর্তারা গুপ্ত হত্যার শিকার হতে থাকেন। কিন্তু ঘাতকের কোন নাম-নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অল্পদিনের মধ্যেই হাসান বাহিনীর গুপ্তদল 'ফেদায়ী' নামে সারা মুসলিম খেলাফতে ভয়ংকররূপে আবির্ভূত হয়। এদের প্রধান কাজ রাজনৈতিক হত্যা। এ কাজে এরা বেশী ব্যবহার করে সুন্দরী যুবতী আর মদ। শরাবে উচ্চমানের বিষ

মিশিয়ে আসর গরম করার পর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে তারা। কিন্তু তাদের মদ-নারী সালাহুদ্দীন আইউবীর বেলায় অকার্যকর। অবৈধ নারী সম্ভোগ আর হারাম মদ-সুরায় আইউবীর আজন্ম ঘৃণা। সালাহুদ্দীনকে হত্যা করার একমাত্র উপায় অতর্কিত আক্রমণ। কিন্তু এটা মোটেও সহজসাধ্য নয়। সুলতান সালাহুদ্দীন সবসময় থাকেন প্রহরী-পরিবেষ্টিত। তাছাড়া তিনি নিজেও খুব সতর্ক।

দু' দু'টি আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর সালাহুদ্দীন আইউবী ভেবেছিলেন, আমীর সালেহ ও গভর্নর সাইফুদ্দীন হয়তো তাঁর চিঠি পেয়ে তওবা করেছে। ওরা হয়তো আর তাঁর সাথে দুশমনি করবে না। কিন্তু না, ওরা প্রতিশোধের আগুনে অন্ধ হয়ে আছে। নতুন করে তৈরী করলো সালাহুদ্দীনকে খতম করার সুগভীর চক্রান্তের ফাঁদ।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ক্রুসেডার ও সাইফুদ্দীনের হামলা প্রতিহত করে বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে পাল্টা আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন। অগ্রণী আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের আরো তিনটি এলাকা দখল করে নিলেন তিনি। বিজিত এলাকার অন্যতম একটি হলো গাজা।

গাজার প্রশাসক জাদুল আসাদীর তাঁবুতে এক দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছেন সালাহুদ্দীন আইউবী। মাথায় তাঁর শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণের নীচে মোটা কাপড়ের পাগড়ী।

তাঁবুর বাইরে প্রহরারত দেহরক্ষী দল। আইউবীর দেহরক্ষীরা যেমন লড়াকু, তেমনি চৌকস।

রক্ষী দলের কমাণ্ডার কেনো যেনো প্রহরীদের রেখে একটু আড়ালে চলে গেলো। এক দেহরক্ষী সালাহুদ্দীনের তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিলো। ইসলামের অমিততেজী সিপাহসালার তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। দু' চোখ তাঁর মুদ্রিত। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন সালাহুদ্দীন। প্রহরী চকিত নেত্রে খাস দেহরক্ষীদের একবার দেখে নিলো। দেহরক্ষীদের তিন-চারজন দেখলো ওই প্রহরীর উঁকি মারার দৃশ্য। চোখাচোখি হলো পরস্পর। তারা বিষয়টি আমলে নিলো না। অন্যান্য প্রহরীদের নিয়ে গল্প-গুজবে মেতে উঠলো। বাইরের প্রহরী এই সুযোগে তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলো। কোমরে তার ধারাল খঞ্জর। বের করে এক নজর দেখে নিলো সেটা। বিড়ালের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা সালাহুদ্দীনের দিকে।

ঠিক তখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন আইউবী। খঞ্জর বিদ্ধ হলো সালাহুদ্দীন আইউবীর মাথার খুলি ঘেষে মাটিতে।

এই মুহূর্তে পার্শ্ব পরিবর্তন না করলে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতো তাঁর খুলি। সালাহুদ্দীন আইউবী বিদ্যুদ্বেগে ধড়-মড় করে শোয়া থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বুঝে ফেললেন, কী ঘটছে। ইতিপূর্বে দু'বার একই ধরনের আক্রমণ হয়ে গেছে তাঁর উপর। কালবিলম্ব না করে ঘাতকের চিবুকে পূর্ণ শক্তিতে একটা ঘুষি মারলেন আইউবী। চিবুকের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার মট্ মট্ শব্দ শোনা গেলো। পিছনের দিকে ছিট্‌কে পড়ে ভয়ানক আর্তচীৎকার দিলো ঘাতক।

এই ফাঁকে আইউবী খঞ্জর তুলে নিলেন হাতে। প্রহরীর ভয়ার্ত চীৎকারে দৌড়ে আরো দুই দেহরক্ষী তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলো। তাদের হাতে খোলা তরবারী। সুলতান বললেন, 'ওকে গ্রেফতার করো'। কিন্তু আইউবীর উপর ঝাপিয়ে পড়লো ওরাও। আইউবী নিজের খঞ্জর দিয়েই দুই তরবারীর মোকাবেলা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে গেলো ঘাতক দল।

ইত্যবসরে বাইরের দেহরক্ষী দলের সবাই ঢুকে পড়লো তাঁবুতে। লড়াই বেঁধে গেলো প্রচণ্ড। আইউবী দেখলেন, তাঁর নির্বাচিত দেহরক্ষীরা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত। বোঝার উপায় ছিলো না, এদের মধ্যে কে তাঁর অনুগত আর কে শত্রুর এজেন্ট। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে অবস্থা নিরীক্ষণ করলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লো উভয় পক্ষের কয়েকজন। আর কিছুসংখ্যক মারাত্মক আহত হয়ে কাতরাতে লাগলো। আহত অবস্থায় পালিয়ে গেলো বাকিরা।

লড়াই থেমে যাওয়ার পর অনুসন্ধানে ধরা পড়লো, আইউবীর একান্ত দেহরক্ষীদের মধ্যে সাতজনই হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ঘাতক সদস্য। যে ঘাতক প্রথম আঘাত হেনেছিলো, তাকে আইউবী নিজেই দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। ওই নরাধম তাঁবুতে প্রবেশ করার পর ভিতরের পরিস্থিতি পরিকল্পনার বিপরীত হয়ে গেলো। ওর আর্তচীৎকারে বাকিরাও তাঁবুতে প্রবেশ করলে প্রকৃত প্রহরীরাও ঘটনা আঁচ করতে পেরে দ্রুত প্রতিরোধে এগিয়ে এলো। শত্রুদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেলো। এ যাত্রায়ও বেঁচে গেলেন আইউবী।

ঘাতকের বুকে তরবারী রেখে আইউবী জিজ্ঞেস করলেন— 'কে তুমি? কোত্থেকে কীভাবে এখানে এসেছো? আর কে তোমাকে এ কাজে পাঠিয়েছে?' সত্য স্বীকারোক্তির বিনিময়ে আইউবী ঘাতকের প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঘাতক বলে দিলো, সে ফেদায়ী, আমীর সালেহ-এর এক কেল্লাদার গভর্নর গোমস্তগীন এ কাজে নিযুক্ত করেছে তাকে।

সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলিম মিল্লাতের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। খৃষ্টানদের কাছেও কখনোই বিস্মৃত হবার নন তিনি।

সালাহুদ্দীন আইউবীর কীর্তি-কাহিনী ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসে সংরক্ষিত। তবে তাঁর জীবন ও কর্মের বাঁকে বাঁকে আপনজন ও স্বগোত্রীয়দের হিংসাত্মক শত্রুতা, চরিত্র হনন, চারপাশের মানুষদের দ্বারা বিছানো বহু বিস্তৃত ভয়ংকর চক্রান্তজাল, শত্রুপক্ষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আঘাত আর তাঁর মিশন ব্যর্থ করতে খৃষ্টান-ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও সুন্দরী নারীদের পাতা ফাঁদের কথা ইতিহাসের পাতায় বিস্তারিত বিবৃত হয়নি। সেসব অজানা ইতিহাস আমি বলার ইচ্ছা রাখি।

❖ ❖ ❖

১১৬৯ সালের ২৩ মার্চ। সালাহুদ্দীন আইউবী সেনাপ্রধান হয়ে মিসরে আগমন করলেন। ফাতেমী খেলাফতের কেন্দ্রীয় খলীফা তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করে বাগদাদ থেকে প্রেরণ করেন।

মিসরের সেনাপ্রধান ও শাসকের গুরুত্বপূর্ণ পদে আইউবীর মত তরুণের নিযুক্তি স্থানীয় প্রশাসকদের দৃষ্টিতে ছিলো অনভিপ্রেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের দৃষ্টিতে আইউবী হলেন যথোপযুক্ত ব্যক্তি। বয়সে তরুণ হলেও আইউবী শাসক বংশের সন্তান। বাল্যকাল থেকেই কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করেছেন যুদ্ধবিদ্যা। অল্প বয়সেই যুদ্ধের ময়দানে প্রমাণ করেছেন নিজের বিরল প্রতিভা ও অসামান্য দূরদর্শিতা।

সালাহুদ্দীন আইউবীর দৃষ্টিতে দেশ শাসন বাদশাহী নয়– জনসেবা। জাতির ইজ্জত-সম্মান, সমৃদ্ধি-উন্নতি এবং সেবার মাধ্যমে নাগরিকদের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-ই শাসকদের দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু তিনি ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-অনৈক্য, একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্যে আমীর-ওমরার মধ্যে খৃষ্টানদের সাথে ভয়ংকর বন্ধুত্ব স্থাপনের আত্মঘাতি প্রতিযোগিতা।

শাসকদের সিংহভাগ জাগতিক বিলাস-প্রমোদে মত্ত। মদ, নারী আর নাচ-গানে শাসক শ্রেণী আকণ্ঠ ডুবন্ত। জীবনকে জাগতিক আরাম-আয়েশের বাহারী রঙে সাজিয়ে রেখেছে কর্তারা। মিল্লাতের ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত ও সম্ভাবনাকে শাসক শ্রেণী নিক্ষেপ করেছে অতল-গহ্বরে।

আমীর, উজীর, উপদেষ্টা ও বড় বড় আমলার হেরেমগুলো বিদেশী খৃষ্টান সুন্দরী তরুণীদের নৃত্য-গীতে মুখরিত। শাসকদের হেরেমগুলোকে আলোকিত

করে রেখেছে খৃষ্টান-ইহুদীদের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা কিশোরীরা। শাসকদের বোধ ও চেতনা সব ওদের হাতের মুঠোয়। খৃষ্টান গোয়েন্দা মেয়েরা মুসলিম শাসকদের হেরেমে অবস্থান করে মদ-সুরা, নাচ-গান আর দেহ দিয়ে শুধু শাসকদের কব্জায়-ই রাখছে না– মুসলিম খেলাফতের প্রাণরস ভিতর থেকে উঁই পোকার মত খেয়ে খেয়ে অসাড় করে দিচ্ছিলো তারা।

খৃষ্টান রাজারা ইসলামী সালতানাতগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। মুসলিম শাসকদের মধ্যে বপণ করছে সংঘাত ও প্রতিহিংসার ধ্বংসাত্মক বীজ। এ কাজে খৃষ্টানরা এতই সাফল্য অর্জন করলো যে, কিছুসংখ্যক মুসলিম শাসক খৃষ্টান সম্রাট ফ্র্যাংককে বাৎসরিক ট্যাক্সও দিতে শুরু করলেন। পরস্পর প্রতিহিংসাপরায়ণ মুসলিম শাসকদের ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোতে গোপন সন্ত্রাস ও হামলা চালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে নিরাপত্তা চাঁদাও আদায় করছিলো খৃষ্টান রাজারা। প্রজাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলেও ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করতে প্রজাদের রক্ত শুষে ট্যাক্স আদায় করে খৃষ্টান রাজাদের বাৎসরিক সেলামী আদায় করছিলো মুসলিম শাসকরা।

সামাজিক সংঘাত, আত্মকলহ ও শ্রেণীগত বিরোধে তখন মুসলমানদের একতা-সংহতি বিলীন। ধর্মীয় দলাদলি, মাযহাবী মতবিরোধে মুসলিম সম্প্রদায় শতধা বিভক্ত। হাসান ইবনে সাব্বাহ নামের এক ভণ্ড ইহুদী-পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির লোভে মিসরের সমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। গোপনে গড়ে তোলে নিজস্ব গোয়েন্দা, সেনা ও সুইসাইড বাহিনী। এরা জঘন্য গুপ্ত হত্যায় এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, 'হাশীশ বাহিনী' রূপে সারা মিসরে এরা খ্যাত।

এই সাব্বাহ বাহিনীর সাথে সালাহুদ্দীনের পরিচয় বাগদাদে। মাদরাসা নিজামুল মুল্‌কে পড়াশোনাকালীন সময়ে সালাহুদ্দীন জানতে পারেন, সাব্বাহ বাহিনীর গুপ্তঘাতকেরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো নিজামিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নিজামুল মুল্‌ককে।

নিজামুল মুল্‌ক ছিলেন মুসলিম খেলাফতের একজন যশস্বী গভর্নর। সুশাসক ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন তিনি। মুসলমানদের সর্বাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এবং ইহুদী-খৃষ্টানদের বিপরীতে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতেই গভর্নর নিজামুদ্দীন গড়ে তোলেন মাদরাসা নিজামিয়া। অল্পদিনের মধ্যে নিজামিয়া মাদরাসা বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং

শিক্ষা-দীক্ষায় খ্যাতি লাভ করে। ওখানকার শিক্ষার্থীরা ইসলাম বিরোধীদের উপযুক্ত মোকাবেলা করার যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠে। মাদরাসা নিজামিয়ায় আবশ্যিক রাখা হয় সামরিক প্রশিক্ষণ ও সমরকলা।

খৃষ্টানদের কাছে এ বিষয়টি মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠে তাদের অস্তিত্বের জন্যে। তাই ওরা চক্রান্ত আঁটে। ওদের যোগসাজশে নিজামুল মুল্‌কের দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয় সাব্বাহ বাহিনী। সাব্বাহ্ বাহিনীকে হাত করে খৃষ্টান চক্রান্তকারীরা হত্যা করে নিজামুল মুল্‌ককে। এ ঘটনা সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্মের প্রায় শত বছর আগের।

নিজামুল মুল্‌কের মৃত্যু হলেও মাদরাসা নিজামিয়া বন্ধ হয়ে যায়নি। অব্যাহত থাকে ইসলামের সৈনিক তৈরীর প্রচেষ্টা। ওখানেই জাগতিক ও ধর্মীয়- বিশেষ করে যুদ্ধ-বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নেন সালাহুদ্দীন। রাজনীতি, কূটনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ কৌশলের উপর আইউবীর গভীর আগ্রহের কারণে নুরুদ্দীন জঙ্গী ও চাচা শেরেকোহ তাঁর জন্যে স্পেশাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা অবস্থায়ই তাঁকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যেতো আইউবীর অসাধারণ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা। অনুপম কর্মকৌশলে মুগ্ধ হয়ে জঙ্গী তাকে মিসরের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এখান থেকেই আইউবীর সংগ্রামী জীবনের সূচনা।

❖ ❖ ❖

সেনাপ্রধান ও গভর্নর হয়ে মিসরে পদার্পণ করলেন সালাহুদ্দীন আইউবী। রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল তাঁর সম্মানে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা করলো জমকালো অনুষ্ঠানের। সার্বিক আয়োজনের নেতৃত্ব দিলেন সেনা অধিনায়ক নাজি।

নাজি মিসরের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান, পঞ্চাশ হাজার নিয়মিত বাহিনীর অধিনায়ক। মিসরে নাজি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। মুকুটহীন সম্রাট। ভবিষ্যত গভর্নর হিসেবে নিজেকেই একমাত্র ফাতেমী খেলাফতের যোগ্য উত্তরসূরী মনে করেন তিনি। সালাহুদ্দীন আইউবীর নিয়োগে স্বপ্নভঙ্গ হলো তাঁর। তবে দমে গেলেন না তিনি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে দেখেই নাজি আশ্বস্ত হলেন, এই বালক তাঁর জন্যে মোটেও সমস্যা হবে না। নিজের দাপট যথারীতি বহাল রাখতে পারবেন তিনি।

আইউবীর আগমনে বড় বড় সেনা অফিসার ও গুরুত্বপূর্ণ আমলাদের অনেকেরই ভ্রু কুঞ্চিত হলো। অনেকেই নিজেকে ভাবছিলো মিসরের ভাবী

গভর্নররূপে। তরুণ সালাহুদ্দীনকে দেখে চোখাচোখি করলো তারা। অনেকের দৃষ্টিতে ছিলো তাচ্ছিল্যের ভাব। তারা জানতো না সালাহুদ্দীন আইউবীর যোগ্যতা। শুধু জানতো, সালাহুদ্দীন শাসক পরিবারের ছেলে। তাঁকে চাচা শেরেকোহ'র স্থলাভিষিক্ত করে পাঠানো হয়েছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর সাথে তাঁর আত্মীয়তা রয়েছে।

এক প্রবীণ অফিসার টিপ্পনী কাটলো— 'ছেলে মানুষ; আমরা তাকে গড়ে নেব।'

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন আর অফিসারদের সমাবেশে আইউবী প্রথমে কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন। নাজির কটাক্ষ চাহনি আর কর্মকর্তাদের বিদ্রূপ আইউবী উপলব্ধি করলেন কি-না বলা মুশকিল। তবে বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কর্মকর্তাদের ভীড়ের মধ্যে নিজেকে নিতান্তই বালক মনে হচ্ছিলো তাঁর। দ্রুত নিজেকে সামলে অফিসারদের প্রতি মনোযোগী হলেন আইউবী। পিতার বয়সী জেনারেল নাজির প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলেন মোসাফাহার জন্যে। তোষামোদে সিদ্ধহস্ত নাজি পৌত্তলিকদের মত মাথা নীচু করে কুর্নিশ করলো আইউবীকে। তারপর কপালে চুমু দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললো–

'আমার বুকের শেষ রক্তফোঁটা দিয়ে হলেও তোমাকে হেফাজত করবো। তুমি আমার কাছে শেরেকোহ ও জঙ্গীর পবিত্র আমানত।'

'আমার জীবন ইসলামের মর্যাদার চেয়ে বেশী মূল্যবান নয় সম্মানিত জেনারেল! নিজের প্রতি ফোঁটা রক্ত সংরক্ষণ করে রাখুন। ক্রুসেডারদের চক্রান্ত কালো মেঘের মত আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।' নাজির হাতে চুমো খেয়ে বললেন আইউবী।

জবাবে মুচকি হাসলেন নাজি, যেন আইউবী তাকে মজার কোন কৌতুক শোনালেন।

নাজি অভিজ্ঞ অধিনায়ক। মিসরের সেনাবাহিনীর অধিপতি। তার বাহিনীতে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার সুদানী, যারা সবাই প্রশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। নাজির মুচকি হাসির রহস্য আইউবী বুঝতে না পারলেও এতটুকু অনুধাবন করলেন যে, এ কৌশলী ও বিজ্ঞ সেনাপতিকে তাঁর বড্ড প্রয়োজন।

নাজি মিসরেই শুধু নয়– গোটা ইসলামী খেলাফতের মধ্যে একজন ধুরন্ধর প্রকৃতির সেনাপতি। নিজ দক্ষতায় পঞ্চাশ হাজার সুদানী বাহিনী দিয়ে স্পেশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন সে। তার অধীন সৈন্যরাই পালন করতো শাসকদের

দেহরক্ষীর দায়িত্ব। মিসরের গভর্নরের দেহরক্ষীর দায়িত্বও ন্যস্ত ছিলো নাজির স্পেশাল বাহিনীর হাতে। স্পেশাল বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক নাজির অনুগত। তার নির্দেশে অকাতরে জীবন দিতে সামান্যতম দ্বিধা করে না কেউ। বিরাট বাহিনীর কর্তৃত্বের বদৌলতে নাজি মিসর ও আশ-পাশের অন্যান্য শাসকদের জন্য ছিলেন একটি ত্রাস। শক্তিশালী সেনাবাহিনী আর কূটচালে নাজি এ অঞ্চলের মুকুটবিহীন সম্রাট। তাকে চ্যালেঞ্জ করে এমন শক্তি কারো নেই। কূটকৌশলে নাজি এমনই দক্ষ যে, সরাসরি সিংহাসনে আসীন না হলেও তাকে মনে করা হতো মসনদের কারিগর। নিজের কূটচালে নাজি ইচ্ছেমত শাসকদের ক্ষমতায় আসীন করতেন আর ইচ্ছে হলে সরিয়ে দিতো। প্রশাসনে নাজিকে বলা হতো সকল দুষ্টবুদ্ধির আধার। সালাহুদ্দীন আইউবীর কথার জবাবে নাজির মুচকি হাসির রহস্য অন্যরা হয়ত ঠিকই বুঝে নিলো। সালাহুদ্দীন অতসব গভীর চিন্তা না করলেও এতটুকু ঠিকই ধরে নিলেন, এই শক্তিধর সেনাপতিকে তার বড় বেশি প্রয়োজন।

'অনেক পথ সফর করে এসেছেন মহামান্য গভর্নর! খানিক বিশ্রাম করে নিন।' বললো প্রবীণ এক অফিসার।

'আমার মাথায় যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, আমি সে গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য নই। এই দায়িত্ব আমার ঘুম আর আরাম কেড়ে নিয়েছে। আপনারা আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন, যেখানে কর্তব্যসমূহ আমার অপেক্ষা করছে।' বললেন আইউবী।

'দায়িত্ব বুঝে নেয়ার আগে আহারটা সেরে নিলে ভাল হয় না?' আইউবীর উদ্দেশে বললো নাজির সহকারী।

একটু কী যেন চিন্তা করলেন আইউবী। তারপর হাঁটা দিলেন সামনের দিকে।

বিশাল এক হলরুম। আইউবীর ডানে নাজি, বাঁয়ে নাজির সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড ঈদরৌস। আগে পিছনে সশস্ত্র দেহরক্ষী। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, গার্ড অব অনার দিচ্ছে নাজির স্পেশাল বাহিনীর নির্বাচিত সদস্যরা। স্পেশাল বাহিনীর সৌকর্য, সুঠামদেহ, উন্নত হাতিয়ার, অভ্যর্থনা আর গার্ড অব অনারের বিন্যস্ত আয়োজন দেখে আইউবীর চোখ আনন্দে চিক্ চিক্ করে উঠলো। এমন একটি সুগঠিত বাহিনীর স্বপ্ন-ই দেখছিলেন তিনি।

কিন্তু হলের গেটে গিয়ে আইউবী স্তম্ভিত হলেন। চিন্তায় ছেদ পড়লো তাঁর। থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

সুরম্য হলঘর। প্রবেশ পথে উন্নত গালিচা বিছানো।

দরজায় পা রেখেই মলিন হয়ে গেলো আইউবীর চেহারা। নেমে এলো বিষাদ। চার উর্বশী তরুণী তাকে দেখেই নৃত্যের ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন জানালো। তাদের হাতে ঝুড়িভর্তি তাজা ফুল। ফুলগুলো শৈল্পিক ভঙ্গিতে ছিটিয়ে দিতে থাকলো আইউবীর পদতলে, তাঁর যাত্রা পথে।

তরুণীদের পরনে মিহি রেশমের সাদা ধবধবে ঘাগরী। পিঠে ছড়ানো সোনালী চুল। তাদের ঝুলেপড়া জুলফি বাড়িয়ে তুলেছে চেহারার রওনক। তরুণীদের শরীরের দ্যুতি সূক্ষ্ম কাপড়ের বাইরে ঠিক্‌রে পড়ছে যেনো। ওদের নৃত্য-ভঙ্গিমার তালে বেজে উঠলো তবলা। সানাইয়ের সুর। সঙ্গীতের মূর্ছনা।

তাজা ফুল পায়ের কাছে নিক্ষিপ্ত হতেই দ্রুত পা পিছিয়ে নিলেন আইউবী। ডানে নাজি আর বাঁয়ে নাজির সহকারী। আইউবীকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালো তারা।

'মোলায়েম ফুল-পাপড়ি মাড়াতে আসেনি সালাহুদ্দীন।' ঠোঁটে রহস্যময় হাসির আভা ছড়িয়ে দিয়ে বললেন আইউবী। এমন নির্মল রহস্যময় হাসি আর দেখেননি কখনো নাজি।

'আমরা জনাবের চলার পথে আসমানের তারা এনেও বিছিয়ে দিতে পারি মাননীয় গভর্নর!' বললেন নাজি।

'আমার যাত্রা পথে শুধু একটা জিনিস বিছানো থাকলে তা আমাকে সন্তুষ্ট করবে।' বললেন আইউবী।

'আদেশ করুন হুজুর কেবলা!' –গদগদ চিত্তে বললো নাজির সহকারী– 'কোন্ সে জিনিস, যা আপনার পায়ের তলায় ছড়িয়ে দিলে আপনাকে আনন্দ দেয়?'

'ক্রুসেডারদের লাশ।' ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে মুচকি হেসে বললেন আইউবী। নিমিষেই তাঁর চেহারা কঠিন হয়ে গেলো। চোখ থেকে ঠিক্‌রে বেরুতে থাকলো অগ্নিদৃষ্টি। ভর্ৎসনামাখা অনুচ্চ আওয়াজে বললেন–

'মুসলমানদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয় জেনারেল!'

মুহূর্তের মধ্যে পান্ডুর হয়ে গেলো অফিসারের মুখমণ্ডল।

আইউবী বললেন— 'আপনারা কি জানেন না, খৃষ্টানরা মুসলিম সালতানাতকে ইঁদুরের মত কুরে কুরে টুকরো টুকরো করছে? বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে আমাদের? জানেন কি, কেন সফল হচ্ছে ওরা? যে দিন থেকে আমরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ফুলের পাপড়ী মাড়াতে শুরু করেছি, নিজেদের যুবতী কন্যাদের

নগ্ন করে ওদের সম্ভ্রম ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছি, সেদিন থেকে ব্যর্থতা-ই হয়ে গেছে আমাদের বিধিলিপি। আমরা মাতৃত্বের মর্যাদা আর নারীর ইজ্জত রক্ষা করতে পারছি না। আপনারা জেনে রাখুন, আমার দৃষ্টি ফিলিস্তীনে নিবদ্ধ। আপনারা আমার পথে ফুল বিছিয়ে মিসরেও কি ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করতে চান?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা এক নজর দেখে জলদগম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন আইউবী–

'আমার পথ থেকে ফুলগুলো সরিয়ে নাও। ফুল মাড়িয়ে গেলে ও-ফুলের কাঁটা আমার হৃদয়টাকে ঝাঝরা করে দেবে। আমার পথের তরুণীদের হটাও। আমি চাইনা ওদের রেশমী চুলে আটকে পড়ে আমার তরবারী অকেজো হয়ে যাক।'

'আর আমাকে কখনও 'হুজুর কেবলা' বলে সম্বোধন করবেন না।' কঠোর ঝাঝের স্বরে বললেন আইউবী। তাঁর তিরস্কারে যেন অফিসারদের দেহ থেকে মাথাগুলো সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

'হুজুর কেবলা' তো তিনি, যার আনীত কালেমা পড়ে আমরা সবাই মুসলমান হয়েছি। এই অধম তাঁর নগণ্য অনুগত উম্মত মাত্র। আমি তাঁর পয়গাম বুকে ধারণ করেই মিসর এসেছি। তাঁর আদর্শ রক্ষায় আমি আমার জীবন কোরবান করেছি। খৃষ্টানরা আমার বুক থেকে এই পবিত্র পয়গাম ছিনিয়ে নিতে চায়, মদের জোয়ার রোম সাগরে ডুবিয়ে দিতে চায় ইসলামের ঝাণ্ডা। আমি আপনাদের বাদশা হয়ে আসিনি– এসেছি ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হয়ে।'

নাজির ইশারায় তরুণীরা ফুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আড়াল হয়ে গেলো। দ্রুতপায়ে হলরুমে প্রবেশ করলেন সুলতান সালাহুদ্দীন।

রাজকীয় দরবার হল। মাঝখানে এক লম্বা টেবিলে থোকা থোকা ফুলের তোড়া। দীর্ঘ চওড়া টেবিলের চারপাশে সাজানো রাজসিক খাবার। আস্ত মুরগী, খাসির রান, দুম্বার বক্ষদেশের মোলায়েম গোশ্‌তের রকমারী আয়োজন। কক্ষময় খাবারের মৌতাত গন্ধ।

টেবিলের এক পার্শ্বে রক্ষিত সালাহুদ্দীনের জন্যে বিশেষ আসন। আইউবী দৃঢ়পদে আসনের পাশে দাঁড়ালেন। পাশের এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন–

'মিসরের সব নাগরিক কি এ ধরনের খাবার খেতে পায়?'

'না, সম্মানিত গভর্নর! সাধারণ মানুষ তো এ ধরনের খাবার স্বপ্নেও দেখে না।'

'তোমরা কি সে জাতির সদস্য নও, যে জাতির সাধারণ মানুষ এমন খাবার স্বপ্নেও দেখে না?'

কারো পক্ষ থেকে কোন জবাব এলো না।

'এখানে ডিউটিরত যত কর্মচারী আছে, সবাইকে ডেকে ভিতরে নিয়ে এসো। এ খাবার তারা সবাই খাবে।' নির্দেশের স্বরে বললেন আইউবী।

সালাহুদ্দীন একটি রুটি হাতে নিয়ে তাতে দু' টুকরো গোশত যোগ করে খেয়ে নিলেন। দ্রুত আহারপর্ব শেষ করে নাজিকে নিয়ে গভর্নরের দফতরে চলে গেলেন।

জাঁকজমকপূর্ণ গভর্নর হাউজ। দফতর নয়, যেন এক জান্নাতি বালাখানা। দাফতরিক প্রয়োজনের চেয়ে আয়েশী আয়োজন-উপকরণ-ই বেশী। দফতরের বিন্যাসে মারাত্মক বৈষম্য। গভর্নর হাউজের দাফতরিক পরিস্থিতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন আইউবী। তাঁর আগেই এখানে চলে আসা আলী বিন সুফিয়ান ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন গভর্নর হাউজের খুঁটিনাটি। আইউবী নাজির কাছ থেকে জেনে নিলেন বিভিন্ন বিষয়।

দু' ঘন্টা পর গভর্নর হাউজ থেকে বেরিয়ে এলো নাজি। দ্রুতপায়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। এক লাফে ঘোড়ায় আরোহণ করে লাগাম টেনে ধরলেন। প্রশিক্ষিত ঘোড়া ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেলো দৃষ্টিসীমার বাইরে।

নিঝুম রাত। নাজির খাস কামরায় জমে উঠেছে মদের আসর। মদপানে যোগ দিয়েছে নাজির একান্ত সহযোগী দুই কমাণ্ডার। আজকের আসরের আমেজ ভিন্ন। কোন নৃত্যগীত নেই। সবার চেহারা রুক্ষ। গ্লাসের পর গ্লাস ঢেলে দিচ্ছে সাকী। গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে তিনজন।

নীরবতা ভঙ্গ করে নাজি বললেন—

'এসব যৌবনের তেজ, বুঝলে? ক' দিনের মধ্যেই দেখবে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

অভাগা কথায় কথায় বলে– 'কা'বার প্রভুর কসম! ইসলামী সালতানাত থেকে খৃষ্টানদের বিতাড়িত না করে আমি বিশ্রাম নেব না।'

'হু! সালাহুদ্দীন আইউবী!' –তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করলো এক কমাণ্ডার– 'সে জানে না, ইসলামী সালতানাতের নিঃশ্বাস ফুরিয়ে আসছে। এখন হুকুমত চালাবে সুদানীরা।'

'আপনি কি বলেননি, স্পেশাল বাহিনীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সব সুদানী?' –নাজিকে জিজ্ঞেস করলো অপর কমাণ্ডার– 'বলেননি, যাদেরকে তিনি নিজের সৈন্য মনে করছেন, ওরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না?'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ঈদরৌস! আমি বরং তাকে আশ্বাস দিয়েছি, এই পঞ্চাশ হাজার সুদানী শার্দুল তাঁর আঙুলের ইশারায় খৃষ্টানদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ওদের নিশানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। অচিরেই ওদের বিশ্বাসের প্রতীক ক্রুশ ভূলুণ্ঠিত হবে। কিন্তু–

থেমে গেলেন নাজি।

'কিন্তু আবার কি?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো উভয় কমাণ্ডার।

নাজি বললেন, কিন্তু সে আমাকে বললো, 'মিসরের নাগরিকদের নিয়ে একটি সেনা ইউনিট গড়ে তুলুন।' বললো, 'এক এলাকার মানুষের উপর সৈন্যবাহিনীকে সীমিত রাখা উচিত নয়।' সে আমাদের বাহিনীর সাথে মিসরীয়দের মিশ্রণ ঘটাতে চায়।

'তা, আপনি কী বললেন?'

'আমি তাকে বলেছি, শীঘ্রই আপনার হুকুম তামিল করা হবে। কিন্তু বাস্তবে আমি কখনই এমনটি করব না।' বললেন নাজি।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর মেজাজ-মর্জি কেমন দেখলেন?' নাজিকে জিজ্ঞেস করলো ঈদরৌস।

'দেখে-ই বোঝা যায়, খুব জেদী।'

'আপনার অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা আর কৌশলের কাছে সালাহুদ্দীন কোন ফ্যাক্টর নয়। নতুন গভর্নর হলো তো, তাই কিছুটা গরম গরম ভাব। দেখবেন, অল্প দিনের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' বললো অন্য কমাণ্ডার।

'আমি তাঁর মনোভাব বদলাতে দেবো না। আমি তাকে ঘোরের মধ্যেই রাখতে চাই।' ক্ষমতার নেশায় বুঁদ করে রেখেই তাকে শায়েস্তা করবো।' বললেন নাজি।

নাজির খাস ভবনে গভীর রাত পর্যন্ত সুরাপান আর সালাহুদ্দীন আইউবী সম্পর্কে নানা আলোচনা হলো। নাজি সহকর্মীদের নিয়ে ঠিক করলেন যদি সালাহুদ্দীন আইউবী তার কতৃত্বের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে ওঠে, তবে তারা কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হলো।

একদিকে চলছে নাজির চক্রান্ত। অপরদিকে সালাহুদ্দীন আইউবী গভর্নর হাউজে অফিসারদেরকে তাঁর নিয়োগ ও কর্মকৌশলের কথা ব্যাখ্যা করছেন।

আইউবী অফিসারদের জানালেন— 'আমি মিসরের রাজা হয়ে আসিনি আর আমি কাউকে অন্যায় রাজত্ব করতেও দেবো না।'

আইউবী অফিসারদের বললেন— 'সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ছাড়া ইসলামী খেলাফতের দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।' এখানকার সেনাবাহিনীর কাঠামো ও বিন্যাস তাঁর পছন্দ নয়, তা-ও অবহিত করলেন। বললেন— 'পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের স্পেশাল বাহিনীতে সবাই সুদানী নাগরিক। ব্যাপারটি ঠিক নয়। কোন কাজে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য থাকা অনুচিত। আমরা সব অঞ্চলের মানুষকেই সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে চাই। সবাই যাতে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের সেবায় কাজ করতে পারে। তাতে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর হবে। সাধারণ মানুষের জীবন-মানের উন্নতিকল্পে এ পদক্ষেপ ফলপ্রসূ অবদান রাখবে।'

আইউবী অফিসারদের জানালেন— 'আমি জেনারেল নাজিকে বলে দিয়েছি, তিনি যেন মিসরের লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করেন।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন, নাজি আপনার নির্দেশ পালন করবে?' আইউবীর কাছে জানতে চাইলেন একজন প্রবীণ সচিব।

'কেন? সে আমার নির্দেশ অমান্য করবে নাকি?'

'এড়িয়ে যেতে পারেন'– সচিব বললেন– 'এ ফৌজী কার্যক্রমে তাঁর একক আধিপত্য। তিনি এ ব্যাপারে কারো হুকুম পালন করেন না, বরঞ্চ অন্যকে পালন করতে বাধ্য করেন।'

আইউবী চুপ হয়ে গেলেন। যেনো কথাটি তিনি বুঝতে-ই পারেননি। সচিবের কথায় তাঁর কোন ভাবান্তর হলো না। কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন নীরবে বসে থেকে তিনি সবাইকে গভর্নর হাউজ থেকে বিদায় করে দিলেন।

আলী বিন সুফিয়ান খানিকটা দূরে বসে আছেন। আইউবী তাঁকেই শুধু থাকতে ইশারা করলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর তাঁকে কাছে ডাকলেন।

আলী একজন দক্ষ গোয়েন্দা। বয়সে আইউবীর বড়। কিন্তু শরীরের শক্ত গাঁথুনি, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ আলীকে যুবকে পরিণত করেছে। নুরুদ্দীন জঙ্গীর বিশ্বস্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও দূরদর্শী কমাণ্ডার হিসেবে আলীর অবস্থান সবার উপরে। মিসরের স্থানীয় প্রশাসনের দুর্নীতি আর অবিশ্বস্ততার দিকটি বিবেচনায় রেখে জঙ্গী আলীকে আইউবীর সহকর্মী হিসেবে মিসর প্রেরণ করেন সালাহুদ্দীনের অধীনে শুধু আলী নিজেই আসেননি, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন

তার হাতেগড়া সুদক্ষ এক গোয়েন্দা ইউনিট। এরা কমাণ্ডো, গেরিলা অভিযান ও গোয়েন্দাকর্মে পটু। প্রয়োজনে আকাশ থেকে তারকা ছিনিয়ে আনতেও এর দ্বিধা করে না।

আলীর সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় গুণটি হল, তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর একই আদর্শে বিশ্বাসী। ইসলামী খেলাফত ও মুসলমানদের কল্যাণে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে আলী আইউবীর মত সদা প্রস্তুত।

'তুমি কি লক্ষ্য করেছো আলী! ওই অফিসার বলে গেলো, নাজি কারো হুকুম তামিল করে না, অন্যদেরকে সে নির্দেশ মানতে বাধ্য করে শুধু?'

'জী, শুনেছি। আমার মনে হয়, স্পেশাল বাহিনীর প্রধান নাজি নামের এই লোকটি খুবই কুটিল। এ লোক সম্পর্কে আগে থেকেই আমি অনেক কথা জানি। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা নেয়; অথচ প্রকৃত পক্ষে ওরা নাজির ব্যক্তিগত বাহিনী। ব্যক্তিস্বার্থে লোকটি দেশের প্রশাসনিক কাঠামোটিই নষ্ট করে দিয়েছে। প্রশাসনের পদে পদে অনুগত চর বসিয়ে রেখেছে।'

'সেনাবাহিনীতে সব এলাকার লোকের অনুপ্রবেশ ঘটানোর সিদ্ধান্তে আপনার সাথে আমি একমত। অচিরেই আমি এ ব্যাপারে আপনাকে বিস্তারিত জানাবো। সুদানী সৈন্যরা খেলাফতের আনুগত্যের বিপরীতে নাজির আনুগত্য করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেনাবাহিনীর কাঠামোটাই আমাদের বদলে ফেলতে হবে কিংবা এ পদ থেকে নাজিকে সরিয়ে দিতে হবে।'

'আমি প্রশাসনে আমার শত্রু তৈরী করতে চাই না আলী! নাজি আমাদের হাড়ির খবর রাখে। এ মুহূর্তে ওকে অপসারণ করা ঠিক হবে না। নিজেদের রক্ত ঝরাতে আমি তরবারী হাতে নেইনি। আমার তরবারী শত্রুর রক্তের পিয়াসী। আমি সদাচারণ ও ভালোবাসা দিয়ে নাজিকে বাগে আনার চেষ্টা করছি। তুমি ওর সৈন্যদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আমাকে জানাও বাহিনীটা আমাদের কতটুকু অনুগত।'

নাজি আনাড়ী লোক নয়। ভালোবাসা আর মমতা দিয়ে ওর দুষ্ট মানসিকতা বদলানোর অবকাশ নেই। নাজি এ-সবের অনেক ঊর্ধ্বে। বেটা একটা সাক্ষাত শয়তান। ক্ষমতা, চালবাজী, দুষ্কর্মই তার পেশা এবং নেশা। লোকটা এত-ই ধূর্ত ও চালাক যে, তোষামোদ দ্বারা সে পাথরকেও মোমের মত গলিয়ে দিতে পারে।

সালাহুদ্দীন আইউবীকেও ঘায়েল করার জন্যে চালবাজী শুরু করলেন নাজী। সামনে কখনো তিনি নিজের আসনে পর্যন্ত বসেন না। 'জী, হ্যাঁ' 'খুব

ভালো,' 'সব ঠিক' রাজ্যের যত তোষামোদ ও চাটুকারিতার উপযোগী শব্দ-বাক্য আছে, সবই তিনি আইউবীর সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। আইউবীর আস্থা অর্জনের জন্যে মিসরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীতে লোক রিক্রুট করতে শুরু করলেন তিনি।

ধূর্তামিপূর্ণ আচরণে আইউবী নাজির প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেন। নাজি আইউবীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, স্পেশাল বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক খেলাফতের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। সুদানী ফৌজ আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। তারা আপনাকে পেয়ে খুবই গর্বিত। আপনার সম্মানে তারা একটি সংবর্ধনার আয়োজন করার জন্যে আমার কাছে আবেদন করেছে। ওরা আপনাকে সম্মান জানাতে চায়; আপনাকে নিজেদের মতো করে কাছে পেতে ওরা খুব-ই উদগ্রীব।'

সালাহুদ্দীন আইউবী নাজির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। বললেন— 'আমি আপনার ফৌজের দেয়া সংবর্ধনায় যাবো।'

কিন্তু দাফতরিক কাজের ঝামেলায় আইউবী নাজির অনুষ্ঠানের জন্যে সময় বের করতে পারছিলেন না। তাই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি পিছিয়ে গেলো কয়েক দিনের জন্য।

নিঝুম রাত। নাজি তার খাস কামরায় অধীন দুই কমাণ্ডার নিয়ে সুরাপানে বিভোর। গায়ে হালকা কাপড়, পায়ে নুপুর, চোখে-মুখে প্রসাধনী মেখে অপ্সরা সেজে কামোদ্দীপক ভঙ্গিতে নাচছে দুই সুন্দরী নর্তকী।

নাজির খাস কামরায় যে কারোর প্রবেশাধিকার নেই। যারা নাজির ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আর একান্ত সেবিকা, নর্তকী, সাকি একমাত্র তাদেরই সিডিউল মতো নাজির ঘরে প্রবেশের অধিকার আছে। দারোয়ান জানতো, কখন কাদের প্রবেশের অনুমতি রয়েছে।

হঠাৎ নাজির ঘরে প্রবেশ করে কানে কানে কি যেনো বললো দারোয়ান। নাজি দারোয়ানের পিছনে পিছনে উঠে এলো সঙ্গে সঙ্গে। দারোয়ান নাজিকে পার্শ্বের কক্ষে নিয়ে গেলো।

কক্ষে উপবিষ্ট এক পৌঢ়। সাথে এক তরুণী। যৌবন যেন ঠিক্‌রে পড়ছে মেয়েটির দেহ থেকে। নাজিকে দেখেই তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালো।

চোখের চাহনিতে গলে পড়লো মায়াবী আকৃতি। তরুণীর রূপের জৌলুসে তন্ময় হয়ে দীর্ঘক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইলো নাজি।

তরুণীর গায়ে ফিনফিনে হালকা পোশাক। খুব দামী না হলেও বেশ আকর্ষণীয়।

নাজি অভিজ্ঞ নারী শিকারী। নিজের ভোগের জন্যই শুধু নয়, নারীকে তিনি ব্যবহার করেন অন্য বহু কাজে। বড় বড় অফিসার, আমীর-উমরাকে নারীর ফাঁদে ফাঁসিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা নাজির অন্যতম কৌশল। সুন্দরী তরুণীদের গোয়েন্দা কাজে ব্যবহার করেও নাজি সৃষ্টি করে রেখেছে নিরাপদ এক জগৎ। এ জগতে আধিপত্য শুধুই নাজির।

কসাই জন্তু দেখেই যেমন বলতে পারে এতে কত কেজি গোশত হবে, নাজিও নারী দেখলেই বলতে পারে, ও কী কাজের হবে, কোন্ কাজে একে ব্যবহার করলে বেশী ফায়দা পাওয়া যাবে।

নারী ব্যবসায়ী, চোরাচালানী, অপহরণকারীদের সাথে নাজির গভীর হৃদ্যতা। ওরা সবসময়ই নাজির জন্যে নিয়ে আসে সেরা চালান। নাজি অকাতরে অর্থ দিয়ে কিনে নেয় তার পছন্দনীয় মেয়েদের। এই পৌঢ় লোকটিও নারী ব্যবসায়ীর মতো। গায়ে আজানু-লম্বিত সুদানী পোশাক। নাজিকে বললো, এই মেয়েটি নাচ-গানে বেশ পারদর্শী। মুখের ভাষা যাদুমাখা। কথার যাদুমন্ত্রে পাথর গলাতে পারে। যে কাউকে মুহূর্তের মধ্যে বশ করতে পারঙ্গম। আর রূপ-লাবণ্য তো আপনার সামনেই। আমি এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে কমই দেখেছি। আপনিই এর যোগ্য বলে সরাসরি আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

তরুণীর সৌন্দর্যে নাজি মুগ্ধ। মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা যাচাই করার জন্যে দু'-চার কথায় তরুণীর ইন্টারভিউ নিয়ে নিলেন নাজি। তরুণীর সাথে কথা বলে নাজির মনে হলো, এ অনেক এক্সপার্ট। এ ধরনের মেয়েই তিনি তালাশ করছেন। সামান্য প্রশিক্ষণ দিলেই একে বিশেষ কাজে ব্যবহার করা যাবে।

দাম-দস্তর ঠিক হলো। মূল্য বুঝে নিয়ে চলে গেলো বেপারী। নাজি খাস কামরায় নিয়ে গেলেন মেয়েটিকে। কক্ষে তখন তুমুল নৃত্য-গান চলছে।

নাজি ঘরে প্রবেশ করতেই ওদের নাচ বন্ধ হয়ে গেলো। নাজি নতুন মেয়েটিকে নাচতে বললেন।

পরিধেয় কাপড়ের পাট খুলে দু' পাক ঘুরে হাত-পা-কোমর দুলিয়ে নাচ শুরু করতেই ওর নাচের মুদ্রা ও মনকাড়া ভঙ্গি দেখে হ্যা হয়ে তোলেন নাজি ও তার

সহকর্মীরা। অনির্বচনীয় এই তরুণীর নাচ। এ যেন নাচ নয়, মরুর বুকে তীব্র ঝড়। সে ঝড়ে মানুষের কামভাব, দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণাকে শুধু একই তন্ত্রে পুঞ্জিভূত করে। মেয়েটির উর্বশী শরীর, কণ্ঠের সুরলহরী আর অঙ্গের পাগলকরা কম্পন মুহূর্ত মধ্যে মাতিয়ে তুললো নাজির কক্ষটিকে।

নাজি এবং তার সাথীরাই অবাক্ হলো না শুধু। দুই পুরাতন নর্তকীর চেহারাও পান্ডুর হয়ে গেলো ওর যাদুময়ী কণ্ঠ আর নাচের তালে। নাজির মনে হলো, খুব বেশী সস্তায় অনেক দামী জিনিস পেয়ে গেছেন তিনি। যোগ্যতা ও সৌন্দর্যের হিসেবে দাম অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিলো মেয়েটির।

নাজির প্রতি ঝুঁকে নাচের ভঙ্গিতে কুর্নিশ করলো তরুণী। নাচের ঘুর্ণনে বার বার নাজির গায়ে বুলিয়ে দিচ্ছিলো কোমল অঙ্গের মোলায়েম পরশ। তরুণীর সৌন্দর্যে আনমনা হয়ে পড়লো নাজি।

আচমকা সবাইকে বিদায় করে দিলো নাজি। দরজা বন্ধ। কক্ষে শুধু নাজি আর তরুণী। কাছে ডাকলো তরুণীকে। বসাল নিজের একান্ত সান্নিধ্যে।

'নাম কী তোমার?'

'জোকি।'

'বেপারী বললো, তুমি নাকি পাথর গলাতে পারো। আমি তোমার এই যোগ্যতার পরীক্ষা নিতে চাই।'

'কোন্ সে পাথর, যাকে পানি করে দিতে হবে বলুন?'

'নয়া আমীর ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আইউবীকে। তাকে পানির মত গলিয়ে দিতে হবে তোমাকে।' বললেন নাজি।

'সালাহুদ্দীন আইউবী?' জিজ্ঞাসা করলো জোকি।

'হ্যাঁ, সালাহুদ্দীন আইউবী। তুমি যদি তাকে বশে আনতে পারো, তবে আমি তোমাকে তোমার ওজনের সমান স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবো।'

'তিনি কি মদপান করেন?'

'না। মদ, নারী, নাচ-গান, আমোদ-ফুর্তিকে সে এমনই ঘৃণা করে, যেমন একজন মুসলমান শূকরকে ঘৃণা করে।'

'আমি শুনেছি, আপনার কাছে নাকি এমন যুবতীও রয়েছে, যাদের দেহের সৌন্দর্য আর কলা-কৌশল নীল নদের স্রোতকেও রুদ্ধ করে দিতে পারে। ওদের যাদু কি ব্যর্থ?'

এ ক্ষেত্রে আমি ওদের পরীক্ষা করিনি। আমার বিশ্বাস, তুমিই এ কাজের জন্য উপযুক্ত। আমি তোমাকে আইউবীর আচরণ-অভ্যাস সম্পর্কে আরো বলবো!'

'আপনি কি তাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করাতে চান?'

'না। এখনই এমন কিছু করতে চাই না। তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই। আমি শুধু তোমার রূপের জালে তাকে ফাঁসাতে চাই। তাকে আমার পাশে বসিয়ে শরাব পান করাতে চাই। তাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে সে কাজ হাশীশ গোষ্ঠী দিয়ে আরো সহজেই করান যেতো।'

'তার মানে আপনি তাঁর সাথে মিত্রতা গড়ে তুলতে চান, তাই না?'

জোকির দূরদর্শিতায় অভিভূত হলেন নাজি।

কথার ফাঁকে জোকি নিজের দেহের উষ্ণতায় নাজিকে কাছে নিয়ে এলো। গায়ের সুগন্ধি, সোনালী চুল, মায়াবী চোখের চটুল চাহনী আর মুখের যাদুময়তায় নাজি ক্রমশ এলিয়ে দিচ্ছিলো নিজেকে জোকির দিকে।

জোকির বুদ্ধিদীপ্ত কথায় নাজি তার সোনালী চুলের গোছা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন— 'হ্যাঁ জোকি! আমি তার সাথে দোস্তী করতে চাই। তবে সে দোস্তী হবে আমার আনুগত্য ও মর্যাদার ভিত্তিতে। আমি চাই সেও আমার পানের আসরের একজন অতিথি হোক।'

'এর জন্য আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

নাজি একটু ভাবলেন। বললেন, বলছি তোমাকে কী করতে হবে। তবে তার আগেই তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবীর কথায় রয়েছে আমার চেয়েও বেশী যাদু। তোমার ভাষা, সৌন্দর্য, চালাকীর যাদু যদি কার্যকর না হয়, তবে তোমাকে জীবন্ত রাখা হবে না। সালাহুদ্দীন আইউবীও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর আমাকে ফাঁকি দিয়েও তুমি রক্ষা পাবে না। এ জন্যই আমি তোমাকে সব খোলাখুলি বলছি। অন্যথায় তোমার মতো একটি বাজারী মেয়ের সাথে আমার ন্যায় একজন সেনা অধিনায়ক প্রথম সাক্ষাতেই এতো কথা কখনও বলে না।'

'ভবিষ্যতই বলবে কার কথা ঠিক থাকে। আপনি আমাকে শুধু এতটুক বলে দিন, সালাহুদ্দীন আইউবী পর্যন্ত আমি কীভাবে পৌছবো?' বললো জোকি।

'আমি তাঁর সম্মানে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করছি। সেটি হবে রাতের বেলায়। খুবই আড়ম্বরপূর্ণ। ওই রাতে তাঁকে অনুষ্ঠানস্থলে একটি তাঁবুতে

রাখবো। তোমাকে সেই তাঁবুতে ঢুকিয়ে দেবো। শুধু এতটুকু কাজের জন্যই আমি তোমাকে আনিয়েছি।'

'ঠিক আছে। বাকি পরিকল্পনা আমিই ঠিক করে নেবো।'

চক্রান্তের জাল বুনতেই শেষ হলো রাত। রাতের চাদর ভেদ করে বেরিয়ে এলো দিন। আবার রাত। সমতালে চললো দেশপ্রেম আর দেশদ্রোহীতার বিপরীতমুখী স্রোতের ধারা। এক দিকে আলী ও আইউবী। অপরদিকে নাজি ও তার সহযোগীরা। এভাবে পেরিয়ে গেলো আরো কয়েক রাত। সালাহুদ্দীন আইউবী প্রশাসনিক কাজে বেজায় ব্যস্ত। নতুন সৈন্য রিক্রুটমেন্টের ঝামেলায় নাজির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানের অবসর পাচ্ছেন না তিনি।

ইত্যবসরে নাজি সম্পর্কে আলী যে রিপোর্ট দিলেন, তা শুনে আইউবীর মনে দেখা দিলো গভীর হতাশা। বললেন— 'তার মানে কি তুমি বলতে চাচ্ছো, এ লোকটি খৃষ্টানদের চেয়েও খতরনাক?'

'নাজি খেলাফতের আস্তিনে একটি কেউটে সাপ।' নাজির দীর্ঘ দুষ্কর্মের ফিরিস্তি শুনিয়ে আলী বললেন। নাজি কিভাবে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদের চক্রান্তের জালে আটকিয়ে নিঃশেষ করছে এবং অন্যদের তার নির্দেশ মান্য ও আনুগত্য করতে বাধ্য করছে তাও জানালেন। বললেন, তার নিয়ন্ত্রিত সুদানী বাহিনীর সিপাহীরা আপনার কমাণ্ড অমান্য করে তার কথা শুনবে তাতে সন্দেহ নেই। আপনি এ ব্যাপারে কী চিন্তা-ভাবনা করেছেন মাননীয় আমীর!

'শুধু চিন্তায় করিনি, কাজও শুরু করে দিয়েছি।' বললেন আইউবী।

'নতুন রিক্রুটমেন্টদের সুদানী সৈন্যদের সাথে মিশিয়ে দেবো। যার ফলে এরা না হবে সুদানী, না হবে মিসরী। নাজির একক আধিপত্য ও ক্ষমতা আমি খর্ব করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। এটি সমাপ্ত হলেই তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় সরিয়ে আনবো।

'আমি বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হয়েছি যে, নাজি খৃষ্টানদের সাথেও গাঁটছড়া বেঁধেছে। আপনি যে সময়টায় জীবনের তোয়াক্কা না করে ইসলামী খেলাফতের শক্তিবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির চেষ্টা করছেন, ঠিক তখন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আপনার এ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার চক্রান্ত করছে নাজি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এ ব্যাপারে তুমি কী করছো?'

'প্রতিরোধ কৌশলের ব্যাপারটি আমার উপরে ছেড়ে দিন। আমার কাজের অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা আমি যথাসময়েই আপনাকে অবহিত করবো।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি নাজির চার পার্শ্বে গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে দিয়েছি। ওর চলাচলের পথ ও অবস্থানে এমন দেয়াল তৈরী করে রেখেছি, যে শুনতেও পায়, অনুধাবনও করতে পারে। প্রয়োজনে প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে। আমার গোয়েন্দাদের ব্যারিকেডের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নাজির নেই।'

আলী বিন সুফিয়ান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিশ্বস্ত ব্যক্তি। শুধু বিশ্বস্তই নন, আলীর কর্ম দক্ষতার উপরও আইউবীর আস্থা অপরিসীম। তাই তাঁর পরিকল্পনার বিস্তারিত কিছু জানার প্রয়োজন বোধ করেননি আইউবী।

আলী বললেন— 'আমি জানতে পেরেছি, নাজি আপনাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করছে। এ তথ্য সঠিক হলে, আমি না বলা পর্যন্ত আপনি তার সংবর্ধনা সভায় যাবেন না। এটা আমার অনুরোধ।'

উঠে দাঁড়ালেন আইউবী। দু' হাত পিছনে বেঁধে মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলেন। পায়চারী করতে করতে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর কণ্ঠ চিরে। হঠাৎ দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে আলীর উদ্দেশে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

'আলী! জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। উদ্দেশ্যহীন বেঁচে থাকার চেয়ে জন্মকালেই মরে যাওয়া অনেক ভালো। আমার মাঝে মধ্যে-মনে হয়, জাতির ঐসব লোকই ভাগ্যবান, সুখী, যাদের মধ্যে কোন জাতীয় চিন্তা নেই। তাদের কওমের ইজ্জত-সম্মান, ইসলাম ও মুসলিমের অবনতি-উন্নতি নিয়ে কোন উদ্বেগ নেই, মাথা ব্যথা নেই। বড় আরামে তাদের জীবন কাটে। আয়েশের ঘাটতি হয় না তাদের জীবনে।'

'ওরা হতভাগ্য সম্মানিত আমীর!'

হ্যাঁ, আলী! ওদের নির্বিকার জীবন দেখে যখন আমার মধ্যে এসব চিন্তা ভর করে, তখন কে যেন আমার কানে কানে তোমার কথাটিই বলে দেয়। আমার ভয় হয় আলী! আমরা যদি মুসলিম মিল্লাতের অধঃপতনের ধারা ঠেকাতে না পারি, তবে অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম জাতি মরু-বিয়াবান আর পাহাড়-জঙ্গলে মাথা কুটে মরবে।

মিল্লাত আজ শতধাবিচ্ছিন্ন। খেলাফত তিন ভাগে বিভক্ত।

আমীররা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো দেশ শাসন করছে। খৃষ্টানদের কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে মিল্লাতের মর্যাদা। ওদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে রয়েছে তারা। আমার ভয় হয়, এ ধারা অব্যাহত থাকলে খৃষ্টানদের গোলামে পরিণত হবে সমগ্র জাতি। ওদের হুকুমবরদার হয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের ভবিষ্যত

বংশধরকে। এই অবস্থায় আমাদের কওম জীবিত থাকলেও পরিণত হবে অনুভূতিহীন এক মানবগোষ্ঠীতে।

আলী! বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখো। আমাদের শাসকদের অবস্থা কী করুণ হয়েছে!'

আইউবী নীরব হয়ে গেলেন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ তাঁর ভারী হয়ে এলো। ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন তিনি।

নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ। দাঁড়ালেন মাথা সোজা করে। আলীর দিকে তাকিয়ে বললেন–

'কোন জাতির ধ্বংস উপকরণ যখন জাতির ভেতর থেকেই উত্থিত হয়, তখন আর তাদের ধ্বংস রোখা যায় না আলী! আমাদের খেলাফতের আমীর-উমরার নৈতিক অধঃপতন যদি রোধ করা না যায়, তবে খৃষ্টানদের আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে না। পারস্পরিক সংঘাত, বিদ্বেষ, লোভ আর হিংসার যে আগুন আমরা নিজেদের মধ্যে প্রজ্বলিত করেছি, ঈমান ও জাতির মর্যাদা ও কর্তব্যকে ভুলে আত্মঘাতী যে সংঘাতে আমরা লিপ্ত হয়েছি, খৃষ্টানরা তাতে ঘি ঢালবে শুধু। আমরা ওদের চক্রান্তে নিজেদের আগুনেই ধ্বংস হয়ে যাবো। জাতির শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত আমাদের আত্মঘাতী সংঘাতেই ব্যয়িত হবে।

জানি না, আমি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবো কি-না। হয়ত খৃষ্টানদের কাছে আমার পরাজয়বরণ করতে হবে। আমি কওমকে এ কথাটাই জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিতে চাই শুধু–

'কাফেরের সাথে মুসলমানদের সখ্য হতে পারে না। বেঈমানদের সাথে ঈমানদারদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সমঝোতা হতে পারে না। ওদের শুধু বিরোধিতা নয়– কঠোরভাবে দমন করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এতে যদি যুদ্ধ করে জীবনও দিতে হয়, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই।'

'আপনার মধ্যে হতাশা ভর করেছে মাননীয় আমীর! কথা থেকেই বোঝা যায়, আপনি নিজের সংকল্পে সন্দিহান।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'হতাশা আমাকে ভর করেনি আলী! নিরাশা আমাকে কখনো কাবু করতে পারে না। আমি আমৃত্যু কর্তব্য পালনে সামান্যতম ত্রুটি করবো না।' বললেন আইউবী।

ফের আলীর দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আইউবী বললেন–

'সৈন্যভর্তির কাজটি বেগবান করো। এমন সব লোকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবে, যাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আর জরুরী ভিত্তিতে তুমি একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা ইউনিট গড়ে তোল। তারা গোয়েন্দাগীরির পাশাপাশি শত্রু এলাকায় রাতে গুপ্ত হামলা চালাবে। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে, যাতে মরুভূমির উটের মত দীর্ঘসময় ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই ইউনিটের সদস্যরা হবে বাঘের চেয়ে ক্ষিপ্র, বাজের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, হরিণের মতো সতর্ক আর সিংহের মতো সাহসী। মদের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ থাকবে না। নারীর প্রতি হবে নিরাসক্ত। সর্বোপরি ঈমানদার, নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে এই স্কোয়াডে প্রাধান্য দিবে।'

আলী! এ কাজটি তুমি খুব তাড়াতাড়ি সমাধা করে ফেলো। খেয়াল রাখবে, আমি সংখ্যাধিক্যে বিশ্বাসী নই। আমি চাই জানবাজ যোদ্ধা। অথর্বদের সংখ্যাধিক্য আমার দরকার নেই। আমি চাই এমন যোদ্ধা, যাদের মধ্যে আছে দেশপ্রেম, জাতিসত্ত্বার প্রতি যাদের আছে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার, যারা হবে সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ– যারা আমার উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে অনুধাবন ও ধারণ করতে সক্ষম। যারা কখনও এমন সংশয়াপন্ন হয় না যে, কেন আমাদের প্রাণঘাতি যুদ্ধে লিপ্ত করা হচ্ছে।'

দশদিন চলে গেলো। এই দশদিনে আমীরে মেসেরের সৈন্য বাহিনীতে দশ হাজারের বেশী অভিজ্ঞ যোদ্ধা ভর্তি হলো।

অপরদিকে এ দশদিনে নাজি জোকিকে ট্রেনিং দিয়েছে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে কীভাবে তার রূপের জালে ফাঁসাতে হবে।

জোকি ভেনাসের মতো সুন্দরী। নাজির যে সহকর্মীই জোকিকে দেখেছে, সে মন্তব্য করেছে, মিসরের ফেরাউন জোকিকে দেখলে তাকে পাওয়ার জন্যে সে খোদা দাবির কথা ভুলে যেতো।

নাজির নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী চক্রান্ত বাস্তবায়নে তৎপর। শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতার বিচারে এরা অসাধারণ।

নাজি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন, আলী বিন সুফিয়ান আইউবীর প্রধান উপদেষ্টা। একজন চৌকস আরব গোয়েন্দার মতোই মনে হয় আলীকে। আলীর সহযোগিতা থাকলে আইউবীকে ঘায়েল করা কঠিন হবে বুঝে নাজি আগে তার

গোয়েন্দা বাহিনীকে আলীর পিছনে নিয়োগ করলেন। তিনি গোয়েন্দাদের নির্দেশ দেন, 'আলীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে।'

সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফাঁসানোর জন্যে জোকিকে প্রস্তুত করছিলেন নাজি। অথচ মরক্কোর এই স্বর্ণকেশীর সোনালী চুলে বাঁধা পড়লেন তিনি নিজে। নাজি বিন্দুমাত্র টের পেলেন না, জোকির মুক্তাঝরা হাসি, অনুপম বাচনভঙ্গি আর নাচ-গানের ফাঁদে বাঁধা পড়ে গেছেন তিনি নিজেই।

জোকি নাজিকে এতোই আসক্ত করে ফেললো যে, চক্রান্তের প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় সে মেয়েটিকে নিজের কোলে বসিয়ে রাখতো। নাজিরই দেয়া পোশাক, সুগন্ধি আর প্রসাধনী ব্যবহার করে জোকি তাকে বেঁধে ফেললো। ফেঁসে গেলেন নাজী তার রূপ-যৌবনের মাদকতায়, যাদুকরী চাহনী আর দেহের উষ্ণতায়।

এ কয়দিনে নাজি ভুলে গেলেন তার একান্ত প্রমোদ সঙ্গীনীদের, যাদের নাচ-গান আর শরীরের উষ্ণতা ছিলো তার একান্ত চাওয়া-পাওয়া। চার-পাঁচ দিন চলে গেলো। একবারের জন্যও তিনি সেবিকাদের একান্তে খাস কামরায় ডাকলেন না। এ কয়দিন সারাক্ষণ জোকিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নাজি।

এই নর্তকী-সেবিকা– রক্ষিতাদের কাছে নাজি পরম আরাধ্য। এদের কাছে নাজির সান্নিধ্য ছিলো নারীত্বের বিনিময়ে দীর্ঘ ত্যাগের পরম পাওয়া। মুহূর্তের জন্যে তার সান্নিধ্য হাতছাড়া করা ছিলো এদের জন্যে মৃত্যুসম যন্ত্রণা।

জোকির আগমনে নাজির এ পরিবর্তন সহ্য করতে পারলো না দুই নর্তকী-রক্ষিতা। মেয়েটাকে হত্যা করে পথের কাটা সরিয়ে দেয়ার ফন্দি করলো ওরা। কিন্তু কাজটি সহজ নয় মোটেই।

জোকির ঘরের বাইরে সার্বক্ষণিক দুই কাফ্রীকে পাহারাদার নিযুক্ত করলেন নাজি। জোকি ঘর থেকে বের হতো না তেমন। অনুমতি নেই নতর্কীদেরও ঘরের বাইরে যাওয়ার। বহু চিন্তা-ভাবনা করে ওরা হেরেমের এক দাসীকে প্ররোচিত করার সিদ্ধান্ত নিলো।

দু'জন ঠিক করলো, দাসীর মাধ্যমে খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যা করবে জোকিকে।

❖ ❖ ❖

আলী বিন সুফিয়ান মিসরের পুরাতন আমীরের দেহরক্ষী বাহিনী বদল করে আইউবীর দেহরক্ষী বাহিনীতে নতুন লোক নিয়োগ করলেন। এরা সবাই আলীর

নতুন রিক্রুটকরা সৈন্য। যোগ্যতার বিচারে এরা অদ্বিতীয়। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান– বিশ্বস্ত আর সাহস ও বীরত্বে সকলের সেরা।

নিজের গড়া গার্ড বাহিনীর পরিবর্তন মেনে নিতে পারলেন না নাজি। কিন্তু প্রকাশ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ দেখালেন না তিনি। উল্টো গার্ড বাহিনীর পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে মোসাহেবী কথায় ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এরই ফাঁকে বিনয়ের সাথে আবার আইউবীকে সংবর্ধনায় যোগদানের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আইউবী নাজির দাওয়াত গ্রহণ করলেন। বললেন, দু'-একদিনের মধ্যে জানাবো আমার পক্ষে কোন্‌দিন অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হবে। মনে মনে কূটচালের সফলতায় উল্লসিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন নাজি।

নাজি চলে যাওয়ার পর আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের সাথে পরামর্শ করলেন। জানতে চাইলেন কোন্ দিন নাজির অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়।

'এখন যে কোন দিন আপনি অনুষ্ঠানে যেতে পারেন। আমার আয়োজন সম্পন্ন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

পর দিন নাজি দফতরে এলেই আইউবী জানালেন, যে কোন রাতেই আপনার অনুষ্ঠানে যাওয়া যেতে পারে।

নাজি অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করলেন। আইউবীকে ধারণা দিলেন, অনুষ্ঠানটি হবে জমকালো, অতিশয় আড়ম্বরপূর্ণ। শহর থেকে দূরে। মরুভূমিতে। উপস্থিত হবে বিশিষ্ট নাগরিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট কুচকাওয়াজ ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। অন্ধকার রাতে মশালের আলোয় অনুষ্ঠিত হবে পুরো অনুষ্ঠান। বিভিন্ন তাঁবু থাকবে। সম্মানিত আমীরসহ সবারই রাত যাপনের ব্যবস্থা করা হবে অনুষ্ঠানস্থলে। রাতে সৈন্যরা একটু আমোদ-ফুর্তি, নাচ-গান করবে।

আইউবী অনুষ্ঠানসূচী শুনছিলেন নাজির মুখ থেকে। নাচ-গানের কথা শুনেও তিনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না।

নাজি একটু সাহস সঞ্চয় করে বার কয়েক ঢোক গিলে বিনয়ী ভঙ্গিতে বললেন, 'সেনা বাহিনীতে বহু অমুসলিম সদস্য আছে। তাছাড়া দুর্বল ঈমানের অধিকারী নওমুসলিমও আছে অনেক। তারা মহামান্য আমীরের সৌজন্যে সংবর্ধনা সভায় একটু প্রাণ খুলে ফুর্তি করতে আগ্রহী। এজন্য তারা ওই দিন মদপানের অনুমতি চায়। তারা এ বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় ও আনন্দময় করে রাখতে চায়।'

'আপনি তাদের অধিনায়ক। আপনি প্রয়োজন বোধ করলে আমার অনুমতির প্রয়োজন কি?' বললেন আইউবী।

'আল্লাহ মহামান্য আমীরের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিন।' তোষামোদের সুরে বললেন নাজি। সামনে ঝুঁকে অনুগত গোলামের মত কুর্নিশের ভঙ্গিতে বললেন, 'অধম কোন্ ছার! আপনি যা পছন্দ করেন না, তার অনুমতি চেয়ে.........!

'আপনি ওদের জানিয়ে দিন, সংবর্ধনার রাতে হাঙ্গামা-বিশৃংখলা ছাড়া সামরিক নিয়ম মেনে তারা সবই করতে পারবে। মদপান করে কেউ যদি হাঙ্গামা বাঁধায়, তবে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' বললেন আইউবী।

নাজি কৌশলে মুহূর্ত মধ্যে ব্যারাকে এ খবর ছড়িয়ে দিলো। সালাহুদ্দীন আইউবী নাজির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছেন। শরাব-মদ, নাচ-গান সবকিছু চলবে সেখানে। আইউবী নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। একথা শুনে সৈন্য বাহিনীতে হুলস্থুল পড়ে গেলো। একজন আরেকজনের দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়, এসব কী শুনছি আমরা! কেউ কেউ দৃঢ় কণ্ঠে বললো, এসব নাজির মিথ্যা প্রচার। নিজের ইমেজ বাড়ানোর জন্য তিনি ভূঁয়া প্রচারণা চালাচ্ছেন।'

কেউ আবার সাবধানে মন্তব্য করলো, 'নাজির যাদু আইউবীকে ঘায়েল করে ফেলেছে। সৈন্য বাহিনীতে যারা সালাহুদ্দীন আইউবীর ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের মধ্যে কিছুটা হতাশা সৃষ্টি করলো এ সংবাদ।

অপরদিকে এ সংবাদ নাজির ভক্ত সেনা অফিসারদের হৃদয়-সমুদ্রে বয়ে আনলো খুশির বন্যা। আইউবীর আগমনের পর থেকেই সেনাবাহিনীতে মদ-সুরা, নাচ-গান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। এ ক'দিনে সেনাবাহিনীর মদ্যপ, লম্পট, প্রমোদবিলাসী অফিসারদের দিনগুলো কেটেছে খুব কষ্টে। যাক্ এবার শুক্‌নো হৃদয়-মন একটু ভিজিয়ে নেয়ার ফুরসত পাওয়া যাবে। তারা এই ভেবে উৎফুল্ল যে, কিছুদিন পরে হয়তো আমীর নিজেও মদ-সুরায় অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

আলী বিন সুফিয়ান ছাড়া আর কেউ জানতেন না, সালাহুদ্দীন আইউবীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মদপান ও নাচ-গানের এ অনুমতি দানের রহস্য কী।

❖❖❖

অবশেষে একদিন এসে পড়লো কাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যা। সূর্য ডুবে গেছে। মরু বিয়াবানে নেমেছে চতুর্দশী জোৎস্নার ঢল। চারদিকের মরুর বালু জোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় চিক্ চিক্ করছে। অসংখ্য মশালের আলোয় মরুভূমি উদ্ভাসিত।

ময়দানের একধারে বিশাল জায়গা জুড়ে সারি সারি তাঁবু। মাঝামাঝি স্থানে সুশোভিত মঞ্চ। অপরূপ কারুকার্যে সাজানো। রং-বেরঙের ঝাড়বাতি আর প্রদীপ্ত মশাল মঞ্চটিকে করে তুলেছে স্বপ্নীল। পাশেই বিশিষ্ট নাগরিক ও অফিসারদের বসার প্যান্ডেল। চতুর্দিকে হাজার হাজার সশস্ত্র প্রহরী। প্রাচীরের মতো নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।

মঞ্চ থেকে একটু দূরে অনুপম শিল্প সুষমায় তৈরী করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য তাঁবু। সেখানে রাতযাপন করবেন স্বয়ং আমীরে মেসের।

আলী বিন সুফিয়ান রাত নামার আগেই আইউবীর জন্য নির্ধারিত তাঁবুর আশেপাশে গোয়েন্দা বাহিনীর কমাণ্ডোদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এ সময় নাজি তার বিশেষ তাঁবুতে জোকিকে শেষ নির্দেশনা দানে মহাব্যস্ত।

জোকি আজ সেজেছে অপরূপ সাজে। আকাশ থেকে যেন মর্তে নেমে এসেছে কোন রূপের পরী। কড়া সুগন্ধী দিয়ে স্নাত হয়েছে মেয়েটি। সূক্ষ্ম কারুকার্যের ধবধবে সাদা কাশফুলের মত কোমল এক প্রস্থ কাপড়ে সেজেছে জোকি। সোনালী চুলগুলো ছেড়ে দিয়েছে উন্মুক্ত কাঁধে। শ্বেতশুভ্র কাঁধের চুলগুলো এলোমেলো হয়ে জোকিকে করে তুলেছে স্বপ্নকন্যা। পটলচেরা হরিণী চোখে কাজল মেখে যেন হয়ে উঠেছে রহস্যময়ী। কণ্ঠে তো রয়েছেই যাদুর বাঁশি। নৃত্যে রয়েছে হৃদয় ছিনিয়ে নেয়ার তাল। মাতাল করা তার সুরলহরী। এমন কোন দরবেশ নেই, আজ জোকিকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে। হালকা কাপড় ভেদ করে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে জোকির বিস্ফোরনুখ রূপ-লাবণ্য। রঙিন ঠোঁটের স্মিত হাসিতে যেন ঝরে পড়ছে গোলাপের পাপড়ী।

জোকির আপাদমস্তক একবার গভীর নিরীক্ষার দৃষ্টিতে দেখলেন নাজি। সাফল্যের নেশায় মনটা ভরে উঠছে তার। কিন্তু তারপরও সতর্ক নাজি। জোকিকে আবার সাবধান করে দিলো– 'যদি তোমার এই অপরূপ অনিন্দসুন্দর দেহখানা দিয়ে আইউবীকে বশ করতে না পারো, তাহলে প্রয়োগ করবে মুখের যাদু। আমার শেখানো কথাগুলো ভুলো না যেন। সাবধান! তাঁর কাছে গিয়ে আবার তাঁর দাসী হয়ে যেয়ো না। তুমি তাঁর কাছে হবে ডুমুরের ফুল, যা দূর থেকে দেখা যায়; কখনো ছোয়া যায় না।

এই রূপ-লাবণ্য দিয়ে তুমি তাকে ভৃত্য বানিয়ে নেবে। আমার বিশ্বাস, তুমি পাথর গলাতে পারবে। মিসরের এই মাটিই জন্ম দিয়েছিলো ক্লিওপেট্রার মতো রূপসীকে। নিজের সৌন্দর্য, প্ররোচনা, যাদুকরী কূটচাল আর রূপের আগুনে

গলিয়ে সীজারের মত লৌহমানবকেও মরুর বালিতে পানির মতো বইয়ে দিয়েছিলো সে। ক্লিওপেট্রা তোমার চেয়ে বেশী সুন্দরী ছিলো না। আমি এতোদিন তোমাকে ক্লিওপেট্রার কৌশলই শিখিয়েছি। রমণীর এ চাল ব্যর্থ হয় না কোনদিন।

নাজির কথায় মুচকি হাসলো জোকি। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো নাজির উপদেশগুলো। মিসরের এই রাতের মরুতে নাগিনীর রূপ ধরে ইতিহাসের পুরনো অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তির আয়োজন করলো নতুন এ ক্লিওপেট্রা।

সূর্য ডুবেছে একটু আগে। আঁধারে মিলিয়ে গেল পশ্চিম আকাশের লালিমা। জ্বলে উঠলো হাজারো মশাল।

ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অনুষ্ঠানের দিকে পা বাড়ালেন আইউবী। মিসরের নতুন আমীরের সম্মানে নাজির এই সংবর্ধনা, সামরিক মহড়া। মিসরের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

আইউবীর ডানে-বাঁয়ে, আগে-পিছে আলী বিন সুফিয়ানের অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী। ওরা আলীর কমাণ্ডো বাহিনীর বিশেষ সদস্য। দশজনকে আইউবীর তাঁবুর চার দিকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো আগেই।

সংবর্ধনা। রাজকীয় অভ্যর্থনা। সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। বেজে উঠলো দফ। পর পর তোপধ্বনি। 'আমীরে মেসের সালাহুদ্দীন আইউবী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠলো মরু উপত্যকা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে স্বাগত জানালেন নাজি। বললেন, 'ইসলামের রক্ষক, জীবন উৎসর্গকারী সেনাবাহিনী আপনাকে 'খোশ আমদেদ' জানাচ্ছে। তারা আপনার ইঙ্গিতে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আপনি তাদের প্রাণচাঞ্চল্য দেখুন। আপনাকে পেয়ে তারা ভীষণ গর্বিত।'

সালাহুদ্দীন আইউবী মঞ্চে নিজ আসনের সামনে দাঁড়ালেন। চৌকস সৈন্যদলের একটি দল তাঁকে গার্ড অব অনার দিলো। তিনি তাদের সালাম গ্রহণ করলেন। রাজকীয় মার্চ ফাষ্ট করে ওরা আড়ালে চলে গেলো।

রাজকীয় আসনে বসলেন আইউবী। দূর থেকে কানে ভেসে এলো এক অশ্ব ক্ষুরধ্বনি। প্যাণ্ডেলের আলোর সীমানায় এলে দেখা গেলো, দুই প্রান্ত থেকে চারটি ঘোড়া ক্ষীপ্রগতিতে মঞ্চের সামনে ময়দানের মাঝ বরাবর এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক ঘোড়ায় একজন করে সওয়ার। সবাই নিরস্ত্র।

দেখে মনে হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু না, চোখের পলকে মঞ্চের সোজাসুজি এসে থেমে গেলো তারা। আরোহীরা এক হাতে লাগাম টেনে

ধরে অন্য হাত প্রসারিত করে প্রতিপক্ষকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলো। এক পক্ষ অপর পক্ষের আরোহীকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। এক আরোহী প্রতিপক্ষের আরোহীকে বগলদাবা করে তার বাহন থেকে নিজের বাহনে নিয়ে দ্রুত দিগন্তে হারিয়ে গেলো। ঘোড়া থেকে ময়দানে পড়ে ডিগবাজী খাচ্ছিল দুই আরোহী। অশ্ববাহিনীর এই ক্রীড়া-নৈপুণ্যে উপস্থিত দর্শকদের হর্ষধ্বনিতে মরুভূমি কেঁপে উঠলো। হর্ষধ্বনিতে কানে তালা লাগার উপক্রম হলো।

এদের পর দু' প্রান্ত থেকে আরো চারজন করে অশ্বারোহী অনুরূপ ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখালো। একে একে এলো উষ্ট্রারোহী, পদাতিক বাহিনী। এলো নেজা, বল্লম ও তরবারীধারী সৈনিকরা। নানা রকম নৈপুণ্য দেখালো। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনিতে অনুষ্ঠানস্থল মুখরিত হয়ে উঠলো।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সৈনিকদের ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখে খুশী হলেন। এমন সৈনিকের প্রত্যাশা-ই মনে লালন করেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ানের কানে কানে বললেন, 'এ সৈনিকদের যদি ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করা যায়, তাহলে এদের দিয়েই খৃষ্টানদের পরাজিত করা যাবে।'

'নাজিকে সরিয়ে দিন; দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। নাজি না থাকলে এদেরকে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করা কঠিন হবে না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী নাজির মতো অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সিপাহসালারকে অপসারণ না করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুরাপানের সম্মতি দিয়ে তিনি নিজ চোখে দেখে নিতে চাচ্ছিলেন নাজির নিয়ন্ত্রিত সৈনিকরা আরাম-আয়েশে, ভোগ-বিলাসিতায় কতটুকু নিমজ্জিত; রণকৌশল ও কর্মদক্ষতায় কতটুকু পটু।

নাজির সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন ক্রীড়া-নৈপুণ্য, অস্ত্র-মহড়া, কমাণ্ডো অভিযানের প্রদর্শনীতে প্রমাণিত হলো যুদ্ধবিদ্যা ও বীরত্ব-সাহসিকতায় তারা অসাধারণ। কিন্তু মহড়া শেষে যখন আহারের পর্ব এলো, তখনই ধরা পড়লো তাদের আসল চরিত্র।

বিশাল প্যাণ্ডেলের একদিকে সৈনিকদের খাওয়ার আয়োজন; অপরদিকে আমীর, পদস্থ অফিসার ও বিশিষ্ট নাগরিকদের আহারের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠান তো নয়, যেন সুলাইমানী আয়োজন। হাজার হাজার আস্ত খাসি, দুম্বা, মুরগী আর উটের রকমারী রান্না। আরো যত রকম প্রাসঙ্গিক খাদ্য সামগ্রী হতে পারে, কোনটি বাকি রাখেননি নাজি। খাবারের মৌ মৌ গন্ধ গোটা প্যাণ্ডেল জুড়ে।

সৈনিকদের প্রত্যেকের সামনে একটি করে শরাবের মশক। খাবারের চেয়ে যেন মদের প্রতিই তাদের আগ্রহ বেশী। আহার শুরু হতে না হতেই সৈনিকদের মধ্যে মদের মশক দখলের হুড়োহুড়ি শুরু হলো। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত খাবারে হামলে পড়লো সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যে নিঃশেষিত আহারের অবশিষ্টাংশ আর মদের সোরাহি নিয়ে শুরু হলো ওদের চেচামেচি, হৈ-হুল্লোড়। উচ্ছৃংখলতা ও হৈ-হুল্লোড় ছড়িয়ে পড়লো ছাউনীর বাইরেও।

নীরবে আইউবী পর্যবেক্ষণ করলেন সৈনিকদের আহারপর্ব। ভাবলেশহীন তাঁর চেহারা। তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। সৈনিকদের উচ্ছৃংখল আচরণে তিনি নির্বাক্।

নাজিকে জিজ্ঞেস করলেন— 'হাজার হাজার সৈনিকের মধ্যে অনুষ্ঠানের জন্যে আপনি এদের কী করে বাছাই করলেন? এরা কি আপনার বাহিনীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সৈনিক?'

'না, মহামান্য আমীর!'– ভৃত্যের মত অনুগত ভঙ্গিতে বললেন নাজি– 'এই দু' হাজার সৈন্য আমার বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক। আপনি তো এদের মহড়া দেখলেন। যুদ্ধের ময়দানে এদের দুঃসাহসিক লড়াই দেখলে আপনি বিস্মিত হবেন। দয়া করে এদের সাময়িক বিশৃংখলা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। এরা আপনার ইঙ্গিতে জীবন বাজী রাখতে প্রস্তুত। আমি মাঝে-মধ্যে এদের একটু অবকাশ দেই, যাতে মরার আগে রূপ-রসে ভরা পৃথিবীর স্বাদ কিছুটা উপভোগ করে নিতে পারে।'

আইউবী নাজির অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় কোন মন্তব্য করলেন না। আইউবীকে তোষামোদের ঝরনায় স্নাত করে নাজি যখন বিশিষ্ট মেহমানদের কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশে ব্যস্ত, এ সুযোগে সালাহুদ্দীন আইউবী আলীকে বললেন–

'আমি যা দেখতে চেয়েছিলাম, দেখেছি। সুদানী ফৌজ মদ আর বিশৃংখলায় অভ্যস্ত। তুমি বলেছিলে এদের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও দেশপ্রেম নেই। আমি দেখছি এদের সামরিক যোগ্যতাও নেই। এই বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠালে যুদ্ধের চেয়ে এরা নিজের জীবন বাঁচানোর ধান্ধায় থাকবে বেশী। গনীমতের সম্পদ লুণ্ঠনের নেশায় থাকবে বিভোর। বিজিত এলাকায় নারীদের বাগে নিয়ে তাদের সাথে পাশবিক আচরণ করবে নিশ্চিত।'

'এর প্রতিকার হলো, আমাদের নতুন রিক্রুটকৃত মিসরীয় সৈনিকদেরকে এদের সাথে একীভূত করে দেয়া। তাহলে ভালোরা ভ্রষ্টগুলোর নৈতিকতাবোধ উন্নত করতে পারবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সালাহুদ্দীন আইউবী মুচকি হাসলেন। বললেন— 'আলী! তুমি দেখছি আমার মনের কথাই বলছো! আমিও কিন্তু তা-ই ভাবছিলাম। কিন্তু বিষয়টা আমি এখনই প্রকাশ করতে চাই না। সাবধান! এ পরিকল্পনার কথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

আলী বিন সুফিয়ানের অসাধারণ মেধা। তিনি চেহারা দেখেই মানুষের মনের লেখা পড়ে ফেলতে পারেন। মানুষ চেনার ব্যাপারে আলী কখনো ভুল করেন না। তিনি আইউবীকে কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন। এ সময়ে মঞ্চের সামনে হঠাৎ করে জ্বলে উঠলো বাহারী ঝাড়বাতি। মঞ্চের সামনে দামী গালিচা বিছানো। বাদক দলের যন্ত্রে বেজে উঠলো মনমাতানো সুর। ব্যাণ্ড দলের সুরের লহরি আর মরুর মৃদু বাতাসে দুলতে শুরু করলো মঞ্চের শামিয়ানা।

মঞ্চের পিছন থেকে বাজনার সুরে সুরে নৃত্যের তালে তালে এগিয়ে এলো একদল তরুণী। সংখ্যায় বিশজন। পরনে নাচের ঝলমলে পোশাক। আধখোলা দেহ। উন্মুক্ত কাঁধে ছড়ানো রেশমী চুল।

মরু রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে তরুণীদের গায়ের কাপড়। চোখ-মুখ ঢেকে দিচ্ছে চুল। প্রত্যেকের পোশাকের রঙ ভিন্ন; কিন্তু শরীরে গড়ন এক। সবাই উর্বশী তরুণী। আবক্ষ খোলা বাহু দিগন্তে প্রসারিত। বকের মত ডানা মেলে যেন এক গুচ্ছ ফুটন্ত গোলাপ উড়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে না তাদের পায়ের নড়াচড়া। এগিয়ে আসছে নৃত্যের ছন্দে দুলে দুলে, যেন বাতাসে ভর করে।

মঞ্চের সামনের গালিচায় এসে অর্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেলো তারা। আইউবীর দিকে দু' হাত প্রসারিত করে একই সাথে মাথা ঝুঁকালো সবাই। ওদের খোলা চুল এলিয়ে পড়লো কাঁধে। যেন কতগুলো তারা খসে পড়ছে আসমান থেকে। মাথার উপর কারুকার্যমণ্ডিত শামিয়ানা। পায়ের নীচের মহামূল্যবান কার্পেট। নর্তকীদের লতানো শরীর আর অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় সৃষ্টি হলো এক স্বপ্নীল নীরবতা।

মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে দৈত্যের মত এক হাবশী ক্ষীপ্রগতিতে এগিয়ে এলো। পরনে চিতা বাঘের চামড়ার মত পোশাক। হাতে বিশাল এক ডালা। ডালায় আধফোটা পদ্মের ন্যায় একটি বস্তু।

তরুণীদের অর্ধবৃত্তের সামনে এসে ডালাটা রেখে দ্রুত আড়াল হয়ে গেলো হাবশী।

সঙ্গীত দলের বাজনা তুঙ্গে উঠলো। বেজে উঠলো আরো জোরে। ডালা থেকে ধীরে ধীরে উত্থিত হলো এক কলি। দেখতে দেখতে সব পাপড়ী মেলে ফুটন্ত গোলাপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো এক অপ্সরী।

মনে হচ্ছিলো লাল মেঘের আবরণ ছিড়ে বেরিয়ে আসছে দ্বাদশীর চাঁদ। এক অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী। ঠোঁটে মুক্তা ঝরানো হাসির ঝিলিক। এ যেন মাটির মানুষ নয়, এক হিরে-পান্নার তৈরী ভিন গ্রহের মায়াবিনী।

দু' হাত প্রসারিত করে নৃত্যের তালে এক পাক ঘুরে অভিবাদন জানালো তরুণী। আইউবীর দিকে চোখের পটলচেরা কটাক্ষ হেনে পলক নেড়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। অভ্যাগত দর্শকরা নৃত্য সঙ্গীতের বাজনা আর তরুণীদের আখি মুদিরায় তন্ময়। নিঃশ্বাসটি বেরুচ্ছে না কারো।

আইউবীর দিকে তাকালেন আলী বিন সুফিয়ান। ঠোঁটে রহস্যপূর্ণ হাসি। বললেনল 'মেয়েটি এতটা সুশ্রী হবে ধারণা করিনি।'

'আমীরে মেসেরের জয় হোক' বলতে বলতে এগিয়ে এলেন নাজি। আইউবীর সামনে এসে গদগদ চিত্তে বললেন– 'এর নাম জোকি। আপনার খেদমতের জন্যে একে আমি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আনিয়েছি। এ তরুণী পেশাদার নর্তকী বা বারবণিতা নয়। মেয়েটি ভালো নাচতে ও গাইতে জানে। এটা এর শখ। কখনো কোন অনুষ্ঠানে নাচে না।

মেয়েটির পিঁতা আমার পরিচিত। মাছ ব্যবসায়ী। বাপ-বেটি দু'জনই আপনার খুব ভক্ত। এই মেয়েটি আপনাকে পয়গম্বরের মতো শ্রদ্ধা করে। এক কাজে আমি এর বাবার সাথে সাক্ষাত করতে এদের বাড়ী গেলে মেয়েটি আমাকে বললো– 'শুনেছি, সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের আমীর হয়ে এসেছেন। মেহেরবানী করে আপনি তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তাঁর পায়ে উৎসর্গ করার মতো আমার জীবন আর নাচ ছাড়া কিছুই তো নেই। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হতে চাই।'

'মহামান্য আমীর! আপনার কাছে নাচ-গানের অনুমতি চেয়েছিলাম শুধু এ মেয়েটিকে আপনার খেদমতে পেশ করার জন্যে।'

'আমি নগ্ন নারী আর নাচ-গান পছন্দ করি না, একথা কি আপনি ওকে বলেছিলেন? আর যে মেয়েদের আপনি পোশাক-পরিহিতা বলছেন, ওরা তো উলঙ্গ।' বললেন আইউবী।

'মাননীয় আমীর! আমি ওকে বলেছিলাম, মিসরের আমীর নাচ-গান পছন্দ করেন না। ও বললো, মাননীয় আমীর আমার নাচে অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার নাচে কোন নোংরামী থাকবে না, থাকবে শৈল্পিক উপস্থাপনা। মাননীয় আমীরের সামনে আমি নৃত্যের শিল্প সুষমাই উপস্থাপন করবো। মেয়েটি আরো বললো, হায়! আমি যদি ছেলে হতাম, তাহলে মহামান্য আমীরের দেহরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজের জান তাঁর জন্যে কুরবান করে দিতাম।' স্বলাজ কম্পিত কণ্ঠে বললেন নাজি।

'আপনি চাচ্ছেন, আমি মেয়েটিকে কাছে ডেকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি, 'তুমি হাজার হাজার পুরুষের সামনে উদ্দাম নৃত্যে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়েছো, পুরুষের পাশবিক শক্তি উস্কে দিতে তুমি খুবই পারঙ্গম, এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, তাই না?'

'না, না আমীরে মেসের! এমন অন্যায় চিন্তা আমি কস্মিনকালেও করিনি।' কাচুমাচু হয়ে বললেন নাজি।

আমি তাকে এই নিশ্চয়তা দিয়ে এনেছি যে, এখানে এলে আপনার সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবো। আপনার সাক্ষাতে ধন্য হতে প্রচণ্ড বাসনা নিয়ে সে অনেক দূর থেকে এসেছে।

আপনি ওর দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। ওর নাচে পেশাদারিত্বের নোংরামী নেই। নেই কোন পাপের আহ্বান। আছে শৈল্পিক কৌশলে আত্মোৎসর্গের বিনয়ভরা মিনতি। একটু চেয়ে দেখুন, মেয়েটি আপনাকে কী অপূর্ব শ্রদ্ধামাখা দৃষ্টিতে দেখছে। নিঃসন্দেহে ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু এই মেয়ে ওর অনুপম নাচ, মোহিনী দৃষ্টি সবকিছু উজাড় করে দিয়ে আপনার ইবাদত করছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনি ওকে আপনার তাঁবুতে যাওয়ার অনুমতি দিন। ওকে মনে করুন সেই মহিয়সী মা, যার উদর থেকে জন্ম নেবে ইসলামের সুরক্ষক জানবাজ মুজাহিদ। ও হবে সেই বীরপ্রসূ মায়েদের একজন। ও সন্তানদের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত সান্নিধ্যধন্য ভাগ্যবতী।'

নাজি আবেগময় ভাষায় আইউবীকে বিশ্বাস করাতে চাইলো যে, এই মেয়েটি এক সম্ভ্রান্ত পিতার নিষ্পাপ কন্যা।

'ঠিক আছে, ওকে আমার তাঁবুতে পৌছিয়ে দেবেন।' বলে নাজিকে আশ্বস্ত করলেন আইউবী।

❖ ❖ ❖

নিজের অপূর্ব নৃত্যকলা দেখাচ্ছিলো জোকি। ধীরে ধীরে শরীর সংকোচিত করে একবার গালিচার উপর বসে যাচ্ছিলো আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো। শারীরিক সংকোচন ও সংবর্ধনের প্রতি মুহূর্তে জোকির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো আইউবীর প্রতি। ওর ভুবন-মোহিনী মুচকি হাসির মধ্যেই ফুটে উঠেছিলো মনের হাজারো কথামালা, বিনয়-নম্র আত্মোৎসর্গের আকুতি। জোকির চারপাশে অন্য মেয়েরাও ডানাকাটা পরীর বেশে উড়ছে মনোহারী প্রজাপতির মতো পাখা মেলে। মরুভূমির চাঁদনী রাতের আকাশে কোটি তারার মেলায় অসংখ্য ঝাড়বাতির আলোয়, শিল্পমণ্ডিত চাদোয়ার নীচে মনে হচ্ছে যেন স্ফটিকস্বচ্ছ পানির পুকুরে রাণীকে কেন্দ্র করে সাঁতার কাটছে একদল জলপরী।

সালাহুদ্দীন আইউবী নীরব। কী ভাবছেন বলা মুশকিল। মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে নাজির সৈন্যরা। সবাই যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ধুঁকছে। ড্যাব-ড্যাবে চোখে তাকাচ্ছে নতর্কীদের প্রতি। দর্শকরা হারিয়ে গেছে স্বপ্নীল জগতে। একটানা বেজে চলছে সঙ্গীতের মৃদু তরঙ্গ। মরুভূমির নিশুতি রাতে অল্পক্ষণ মঞ্চস্থ হচ্ছে ইতিহাসের গোপন অধ্যায়, যা জানবে না সাধারণ মানুষ। যা স্থান পাবে না ইতিহাসের পাতায়।

নিজের সাফল্যে নাজি খুব খুশি। জোকি দেখিয়ে যাচ্ছে যাদুকরী নাচ। সমতালে চলছে বাজনা। গভীর হচ্ছে রাত।

❖ ❖ ❖

রাত অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। বিরতি টানা হলো নৃত্যসঙ্গীতে। সবাই চলে গেলো যার যার তাঁবুতে। জোকি শৈল্পিক ভঙ্গিতে হেলে-দুলে প্রবেশ করলো নাজির কামরায়।

নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন আইউবী। দক্ষ কারিগরের হাতে সাজানো তাঁবু। মেঝেতে ইরানী কার্পেট। দরজায় ঝুলান্ত রেশমী পর্দা। রাজকীয় পালঙ্কে চিতা বাঘের চামড়ায় মোড়ানো বিছানা। ঝুলানো ঝাড়বাতির আলোয় তাঁবুর ভিতরে চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা। বাতাসে দুর্লভ আতরের সুবাস।

আইউবীর পিছনে পিছনে তাঁবুতে ঢুকলো নাজি। বললেন— 'ওকে একটু সময়ের জন্যে পাঠিয়ে দেবো কি? আমি ওয়াদা ভঙ্গকে খুব ভয় করি।'

'হ্যাঁ, দিন।' বললেন আইউবী।

শিয়ালের মত নাচতে নাচতে নিজ তাঁবুর দিকে লাফিয়ে চললেন নাজি।

কয়েক মুহূর্ত পরে প্রহরীরা দেখলো আইউবীর তাঁবুর দিকে অতি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে এক তরুণী। গায়ে তার নর্তকীর পোশাক।

আইউবীর তাঁবুর চারপাশে প্রখর আলোর মশাল। নাজি তাঁবুর চতুর্দিকে কোন আলোর ব্যবস্থা রাখেননি। ব্যবস্থাটা করেছেন আলী বিন সুফিয়ান। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যেই এ আয়োজন, যাতে কোন দুষ্কৃতিকারীর আগমন হলে পরিষ্কার তাকে চেনা যায়। বিশেষ প্রহরার জন্যে আইউবীর তাঁবুর প্রহরীদেরও নিযুক্তি দেন আলী।

তাঁবুর কাছে আসতেই মশালের আলোয় প্রহরীরা দেখতে পেলো নর্তকীকে। এই সেই নর্তকী। এখনও গায়ে তার নাচের ফিনফিনে পোশাক। ঠোঁটে মায়াবী হাসির আভা।

পথ রোধ করে দাঁড়ালো প্রহরী দলের কমাণ্ডার। বললো, এদিকে যেতে পারবে না তুমি।

'মহামান্য আমীর আমাকে তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠিয়েছেন।' বললো জোকি।

'হু! সালাহুদ্দীন আইউবী তোমার ন্যায় বাজে মেয়েদের সাথে রাত কাটানোর মত আমীর নন।'

'না ডাকলে কোন্ সাহসে আমি এখানে আসবো?'

'কার মাধ্যমে তোমাকে ডেকে পাঠালেন?'

'সেনাপতি নাজি আমাকে বলেছেন, মহামান্য আমীর তোমাকে তাঁর তাঁবুতে ডেকেছেন।'

'বিশ্বাস না হলে তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন। যেতে না দিলে আমি ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু আমীরের নির্দেশ অমান্য করার দায়দায়িত্ব আপনার।'

'দেহরক্ষী কমাণ্ডার বিশ্বাস করতে পারছিলো না, সালাহুদ্দীন আইউবী এক নর্তকীকে রাতে তার শয়নঘরে ডেকে পাঠাবেন। আইউবীর চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে কমাণ্ডার অবগত। সে এ আদেশও জানতো যে, কেউ নর্তকী-গায়িকাদের সাথে রাত কাটালে তাঁকে একশ দোররা মারা হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো কমাণ্ডার। কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না সে। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত কমাণ্ডার আইউবীর তাঁবুতে ঢুকে পড়লো।

কম্পিত কণ্ঠে বললো— 'বাইরে এক নর্তকী দাঁড়িয়ে আছে। ও বলছে হুজুর জাঁহাপনা নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আইউবী।

বেরিয়ে এলো কমাণ্ডার।

আইউবীর তাঁবুতে প্রবেশ করলো জোকি। প্রহরীদের ধারণা, এক্ষুণি সালাহুদ্দীন আইউবী নর্তকীকে তাঁবু থেকে বের করে দেবেন। তারা আমীরের সে নির্দেশের জন্যে তাঁবুর কাছেই অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু না। এমন কোন আওয়াজ ভিতর থেকে এলো না।

রাত বাড়ছে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বর। অস্থির পায়চারী করছে দেহরক্ষী কমাণ্ডার। তাঁর মাথায় তোলপাড় করছে আকাশ-পাতাল ভাবনা। এক প্রহরী কমাণ্ডারকে বলেই বসলো– 'ও..... যত আইন শুধু আমাদের বেলায়?

'হ্যাঁ, আইন আর শাসন অধীনদেরই জন্য। শাস্তির যত খড়গ প্রজাদের জন্যে।' বললো এক সিপাই।

'মিসরের আমীরের জন্যে কি দোররার শাস্তি প্রযোজ্য নয়?' বললো অন্য এক সিপাই।

'না, রাজা-বাদশার কোন শাস্তি হয় না'– ঝাঝের কণ্ঠে বললো কমাণ্ডার– 'হয়ত সালাহুদ্দীন আইউবী মদও পান করেন। আমাদের উপর কঠোর শাসনের দণ্ড ঠিক রাখতে প্রকাশ্যে একটা পবিত্রতার ভান করেন মাত্র।'

একটি মাত্র ঘটনায় সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি সৈনিকদের এত দিনের বিশ্বাস কর্পূরের মত উড়ে গেলো। এতদিন যাদের কাছে সালাহুদ্দীন ছিলেন একজন ইসলামী আদর্শের মূর্তপ্রতীক, সে স্থলে তাদের কাছে এখন তিনি ভালো মানুষীর ছদ্মাবরণে পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বিলাসী চরিত্রহীন এক আরব শাহজাদা।

নাজি আজ পরম উৎফুল্ল। সালাহুদ্দীন আইউবীকে ঘায়েল করার সাফল্যে আজ মদ স্পর্শ করেনি সে। আনন্দে দুলছে লোকটা। সহকারী ঈদরৌসও নাজির তাঁবুতে বসা।

'গেলো তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মনে হয় আমাদের তীর সালাহুদ্দীন আইউবীর অন্তর ভেদ করেছে।' মন্তব্য করলো ঈদরৌস।

'আমার নিক্ষিপ্ত তীর কবে আবার ব্যর্থ হলো?'

বলতে বলতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো নাজি। ব্যর্থ হলে দেখতে, আমাদের ছোঁড়া তীর সাথে সাথে আমাদের দিকেই ফিরে আসতো।

'আপনি ঠিক-ই বলেছেন। মানবরূপী একটা যাদুর কাঠি জোকি।' বললো ঈদরৌস। মনে হয় ও হাশীশীদের সাথে কখনো থেকে থাকবে। না হয় মেয়েটা আইউবীর এমন পাথরের মূর্তি ভাঙ্গল কী করে।

'আমি ওকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, হাশীশীরা তা কল্পনাও করতে পারবে না।' সাফল্যের ভঙ্গিতে বললেন নাজি। এখন আইউবীর গলা দিয়ে মদ ঢুকানোর কাজটি শুধু বাকি।

কারো পায়ের শব্দে লাফিয়ে উঠে তাঁবুর বাইরের এলেন নাজি। না, জোকি নয়। এক প্রহরী স্থান বদল করতে হেঁটে যাচ্ছে। নাজি আইউবীর তাঁবুর দিকে তাকালেন। দরজায় পর্দা ঝুলানো। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী।

বিজয়ের হাসিমাখা কণ্ঠে তাঁবুর ভিতরে বসতে বসতে নাজি বললেন— 'এখন আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আমার জোকি এতক্ষণে পাথর গলিয়ে পানি করে ফেলেছে।

❖ ❖ ❖

রাতের শেষ প্রহর। আইউবীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো জোকি। নাজির তাঁবুতে না গিয়ে উল্টা দিকে রওনা দিলো ও। পথেই আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত এক ব্যক্তি দাঁড়ানো। ক্ষীণ আওয়াজে ডাকলেন— 'জোকি!' দ্রুত পায়ে জোকি চলে গেলো লোকটির কাছে। লোকটি জোকিকে নিয়ে একটি তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

জোকি অনেকক্ষণ কাটালো ওই তাঁবুতে। তারপর বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিলো নাজির তাঁবুর দিকে।

নাজি তখনও জাগ্রত। বারকয়েক তাকিয়ে দেখেছে আইউবীর তাঁবুর দিকে। সে জোকির আগমনের প্রতীক্ষায়। কিন্তু জোকিকে আসতে দেখেনি। তাঁর ধারণা, জোকি সালাহুদ্দীন আইউবীকে রূপের মায়াজালে আবদ্ধ করেছে। আসমানের সুউচ্চ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে জোকি তার মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।

'ঈদরৌস! রাত তো প্রায় শেষ। ও-তো এখনো এলো না!'

'ও আর আসবেও না'– বললো ঈদরৌস– 'আমীর তাকে সাথে নিয়ে যাবে। এমন হীরের টুকরোকে শাহজাদারা কখনো ফিরিয়ে দেয় না– এ কথাটি কখনো আপনি ভেবেছেন কি মাননীয় সেনাপতি?'

'না তো! এ দিকটি আমি মোটেও ভাবিনি।'

'এমনও হতে পারে যে, আমীর জোকিকে বিয়ে করে ফেলবেন'– বললো ঈদরৌস— 'তখন আর মেয়েটি আমাদের কাজের থাকবে না।'

'ও খুব সতর্ক মেয়ে। অবশ্য নর্তকীদের উপর ভরসা করা যায় না। তাছাড়া জোকি পেশাদার নর্তকী মেয়ে। এ ধরনের কাজে সে অভিজ্ঞ। ধোঁকা দেয়াটা অস্বাভাবিক নয়।' বললেন নাজি।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে নাজি। তার এতক্ষণের সাফল্যের ঝিলিককে ঘন মেঘমালার আড়ালে হারিয়ে দিয়েছে বিপরীত চিন্তা। এমন সময় পর্দা ফাঁক করে তাঁবুতে প্রবেশ করলো জোকি। হাসতে হাসতে বললো, 'এবার আমায় ওজন করুন আর পাওনা চুকিয়ে দিন।'

'আগে বল কী করে এলে?' পরম আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন নাজি।

'আপনি যা চাচ্ছিলেন, তা-ই করেছি। কে বললো, আপনাদের সালাহুদ্দীন আইউবী পাথর? আবার উনি নাকি ইস্পাতের মত ধারালো, মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর রহমতের ছায়া?

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ দিয়ে মাটি খুড়তে খুড়তে জোকি বললো, সে এখন এই বালু কণার চেয়েও হালকা। এখন সামান্য বাতাসই উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাঁকে।

'তোমার রূপের যাদু আর কথার মন্ত্র তাকে বালুতে পরিণত করেছে'– বললো ঈদরৌস– 'নয়তো হতভাগা পাথুরে পর্বতই ছিলো।'

'ছিলো বটে, তবে এখন বালিয়াড়িও নয়।'

'আমার সম্পর্কে কোন কথা হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করেন নাজি।

'হ্যাঁ, হয়েছে। সালাহুদ্দীন আইউবী জিজ্ঞেস করেছেন, নাজি কেমন মানুষ। আমি বলেছি, মিসরে যদি আপনার কারো উপর নির্ভর করতে হয়, সেই লোকটি একমাত্র নাজি। তিনি জানতে চেয়েছেন, আমি আপনাকে কিভাবে চিনি? বলেছি, নাজি আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আমাদের বাড়িতে যেতেন এবং আমার পিতাকে বলতেন, 'আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর গোলাম। তিনি যদি আমাকে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, নির্দ্বিধায় আমি তা করতে প্রস্তুত।' তারপর তিনি বললেন, তুমি তো সতী-সাধ্বী মেয়ে। বললাম, আমি আপনার দাসী; আপনার যে কোন আদেশ আমার শিরোধার্য। তিনি বললেন; কিছু সময় তুমি আমার কাছে বসে থাক। আমি তার পার্শ্বে গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। মুহূর্ত মধ্যে তিনি মোম হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য আমরা দু'জন প্রেমের অতল সমুদ্রে হারিয়ে গেলাম। পরে তিনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, জীবনে আমি এ-ই প্রথমবার পাপ করলাম; তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি বললাম, না, আপনি কোন পাপ করেননি। আমার সঙ্গে আপনি প্রতারণাও করেননি, জোর-জবরদস্তিও নয়। রাজা-বাদশাহদের ন্যায় আদেশ দিয়ে আপনি আমায়

ডেকে আনেননি। আমি নিজেই এসে স্বেচ্ছায় আপনার হাতে ধরা দিয়েছি। আসবো আবারো।' বললো জোকি।

আনন্দের আতিশয্যে নাজি বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলো মেয়েটিকে। নাজি ও জোকিকে মোবারকবাদ জানিয়ে ঈদরৌস বেরিয়ে যায় তাঁবু থেকে।

মরুর রহস্যময় রাতের উদর থেকে জন্ম নিলো যে প্রভাত, তা অন্য কোন প্রভাতের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিলো না। তবে প্রভাত-কিরণ তার আঁধার বক্ষে লুকিয়ে রেখেছিলো এমন একটি গোপন রহস্য, যার দাম সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর স্বপ্নের সালতানাতে ইসলামিয়ার মূল্যের সমান, যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে যৌবন লাভ করেছেন সুলতান আইউবী।

গত রাতে এ মরুদ্যানে যে ঘটনাটি ঘটলো, তার দিক ছিলো দু'টি। একটি দিক সম্পর্কে অবগত ছিলেন শুধু নাজি আর ঈদরৌস। অপর দিক সম্পর্কে অবহিত ছিলো সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনী। আর সুলতান আইউবী, গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান ও জোকী'র জানা ছিলো ঘটনার উভয় দিক।

সুলতান আইউবী ও তাঁর সহকর্মীদের মর্যাদার সাথে বিদায় জানান নাজি। পথের দু' ধারে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে 'সুলতান আইউবী জিন্দাবাদ' স্লোগান দিচ্ছে সুদানী ফৌজ। কিন্তু এই শ্লোগানের কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন না সুলতান। সামান্য একটু হাসির রেখাও দেখা গেলো না তার দু' ঠোঁটের ফাঁকে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেন সুলতান। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে নাজির সঙ্গে করমর্দন করে ছুটে চলেন তিনি।

হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ান ও এক নায়েবকে সঙ্গে করে কক্ষে প্রবেশ করেন। বন্ধ হয়ে যায় কক্ষের দরজা। বেলা শেষে রাত নামে। আঁধারে ছেয়ে যায় প্রকৃতি। বাইরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই কক্ষের এই তিনটি প্রাণীর। খাবার তো দূরের কথা, এত সময়ে এক ফোঁটা পানিও ঢুকলো না কক্ষে। কক্ষের দরজা খুলে যখন তিনজন বাইরে বের হন, রাত তখন দ্বি-প্রহর।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে চলে যান আইউবী। রক্ষী বাহিনীর এক কমাণ্ডার আলী বিন সুফিয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বিনীত সুরে বললো— 'মোহতারাম! বিনা বাক্যব্যয়ে আপনাদের আদেশ মান্য করে চলা আমাদের কর্তব্য। তথাপি একটি কথা না বলে পারছি না। আমার ইউনিটে এক রকম হতাশা ও অনাস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি নিজেও তার শিকার হতে চলেছি।'

'কেমন হতাশা?' জানতে চান আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার অভিযোগকে যদি আপনি গোস্তাখী মনে না করেন, তবেই বলবো। আমাদের মহামান্য গভর্নরকে আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করতাম এবং সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি ছিলাম উৎসর্গিত। কিন্তু রাতে .........।' বললো কমাণ্ডার।

'রাতে সুলতান আইউবীর তাঁবুতে একটি নর্তকী গিয়েছিলো, তা-ই তো? তুমি কোন গোস্তাখী করোনি। অপরাধ গভর্নর করুন কিংবা ভৃত্য করুক, শাস্তি দু'জনের-ই সমান। পাপ সর্বাবস্থায়-ই পাপ। তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমীরে মেসের ও নর্তকীর নির্জন মিলনের সঙ্গে পাপের কোন সংশ্রব ছিলো না। বিষয়টা কী ছিলো, তা এখনই বলবো না; সময়ে তোমরা সবই জানতে পারবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

আলী বিন সুফিয়ান কমাণ্ডারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন আমের বিন সালেহ! তুমি একজন প্রবীণ সৈনিক। তোমার ভালো করে-ই জানা আছে, সেনাবাহিনী ও সেনা কর্মকর্তাদের এমন কিছু গোপন রহস্য থাকে, যার সংরক্ষণ আমাদের সকলের কর্তব্য। নর্তকীর আমীরে মেসেরের তাঁবুতে রাত কাটানোও তেমনি এক রহস্য। তুমি তোমাদের জানবাজদের কোন সংশয়ে পড়তে দিও না। রাতে সুলতানের তাঁবুতে কী ঘটেছিলো, তা নিয়ে কাউকে ভুল বুঝবার সুযোগ দিও না।'

আলী বিন সুফিয়ানের বক্তব্যে কমাণ্ডার নিশ্চিত হয়ে যায়। দূর হয়ে যায় তার মনের সব সন্দেহ। বাহিনীর অন্য সকলের মনের খটকাও দূর করে ফেলে সে।

পরদিন দুপুর বেলা। আহার করছেন সুলতান আইউবী। ইত্যবসরে সংবাদ আসে, নাজি আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। সুলতানের খাওয়া শেষ হলে কক্ষে প্রবেশ করেন নাজি। তার চেহারা বলছে, লোকটা সন্ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ। খানিকটা চড়া গলায় বললো, 'মহামান্য আমীর! এ-কি আদেশ জারি করলেন আপনি! পঞ্চাশ হাজার অভিজ্ঞ সুদানী ফৌজকে মিসরের এই আনাড়ী বাহিনীর মধ্যে একাকার করে দিলেন!'

'হ্যাঁ, নাজি! আমি গতকাল সারাটা দিন এবং আধা রাত ব্যয় করে এবং গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তুমি যে বাহিনীটির সালার, তাকে মিসরী বাহিনীর সঙ্গে এমনভাবে একাকার করে ফেলবো যে, প্রতিটি ইউনিটে সুদানী সৈন্যের সংখ্যা থাকবে মাত্র দশ শতাংশ। আর এতক্ষণে তুমিও নির্দেশ পেয়ে গেছো, তুমি আর এখন সে বাহিনীর সালার নও, তুমি সেনা হেডকোয়ার্টারে চলে আসবে।'

'মহারাজ! আপনি আমাকে এ কোন্ পাপের শাস্তি দিচ্ছেন?' বললেন নাজি।

'আমার এ সিদ্ধান্ত যদি তোমার মনোঃপূত না হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার সেনাবাহিনী থেকে সরে দাঁড়াও।' বললেন সুলতান আইউবী।

'আমি বোধ হয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। আমি আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন মনে করি। হেডকোয়ার্টারে আমার অনেক শত্রু আছে।'

'শোন! প্রশাসন ও সেনাবাহিনী থেকে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা যেন চিরতরে দূর হয়ে যায়, তার জন্য-ই আমার এ সিদ্ধান্ত। আরেকটি কারণ, আমি চাই সেনাবাহিনীতে যার পদমর্যাদা যত উঁচু হোক কিংবা যত নিচু, যেন কেউ মদপান ও ব্যভিচার না করে এবং কোন সামরিক মহড়ায় নাচ-গান না হয়।' বললেন সুলতান আইউবী।

'কিন্তু আলীজাহ! আমি তো আয়োজনটা হুজুরের অনুমতি নিয়েই করেছিলাম।' বললেন নাজি।

'তা ঠিক। তুমি যে বাহিনীটিকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সৈনিক বলে দাবি করতে, মদ ও নাচ-গানের অনুমতি আমি তার আসল রূপটা দেখার জন্য-ই দিয়েছিলাম। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে আমি বরখাস্ত করতে পারি না। তাই মিসরী ফৌজের সঙ্গে একাকার করে আমি তাদের চরিত্র শোধরাবো। আর তুমি এ কথাটিও শুনে নাও যে, আমাদের মধ্যে কোন মিসরী, সুদানী, শামী ও আজমী নেই। আমরা মুসলমান। আমাদের পতাকা এক, ধর্মও অভিন্ন।' বললেন সুলতান আইউবী।

'আমীরে মোহতারাম কি ভেবে দেখেছেন, এতে আমার মর্যাদা কোথায় নেমে যাবে?' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন নাজি।

'দেখেছি; তুমি যার যোগ্য, তোমায় সেখানে-ই রাখা হবে। নিজের অতীতের পানে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নাও। নিজের কারগুজারী আমার কাছে শুনতে চেও না। যাও, তোমার সৈন্য, সামান-পত্র ও পশু ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করে এক্ষুণি আমার নায়েবের কাছে হস্তান্তর করো। সাতদিনের মধ্যে আমার হুকুমের তামিল সম্পন্ন হয়ে যায় যেন।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে চাইলেন নাজি। কিন্তু সুযোগ না দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান সুলতান আইউবী।

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবীর তাঁবুতে জোকির রাত যাপনের সংবাদ পৌঁছে গেছে নাজির গোপন হেরেমে। নাজির হেরেমের অন্যান্য মেয়েদের মনে জোকির

বিরুদ্ধে হিংসার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে আছে পূর্ব থেকে-ই। এই হেরেমে জোকির আগমন ঘটেছে মাত্র ক'দিন হলো। কিন্তু প্রথম দিনটি থেকে-ই তাকে নিজের সঙ্গে রাখতে শুরু করেছেন নাজি। পলকের জন্য চোখের আড়াল করছেন না সে নবাগতা এই মেয়েটিকে। থাকতে দিয়েছেন আলাদা কক্ষ।

মহলের অন্য মেয়েদের জানা ছিলো না, নাজি জোকিকে সালাহুদ্দীন আইউবীকে মোমে পরিণত করার এবং বড় রকম নাশকতামূলক পরিকল্পনায় কাজ করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। জোকি নাজিকে হাত করে নিয়েছে, এ দেখেই মহলের অন্য মেয়েরা জ্বলে-পুড়ে ছাই হচ্ছে।

হেরেমের দু'টি মেয়ে জোকিকে হত্যা করার কথাও ভাবছিলো। এবার তারা দেখলো, স্বয়ং মিসরের গভর্নরও মেয়েটিকে এমন পছন্দ করে ফেলেছেন যে, জোকিকে তিনি রাতভর নিজের তাঁবুতে রাখলেন। এতে পাগলের মতো হয়ে পড়েছে তারা।

জোকিকে হত্যা করার পন্থা দু'টি। হয়ত বিষ খাওয়াতে হবে, অন্যথায় ভাড়াটিয়া ঘাতক দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। এর একটিও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, জোকি এখন নিজের কক্ষ থেকে বের হয় না এবং তার কক্ষে ঢুকে বিষ প্রয়োগও সম্ভব নয়।

হেরেমের সবচে' চতুর চাকরানীটিকে হাত করে নিয়েছিলো তারা। এবার দাবি অনুপাতে পুরস্কার দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে চাকরানীর কাছে। বিচক্ষণ চাকরানী বললো, সালারের শয়নকক্ষে ঢুকে জোকিকে বিষপান করানো সম্ভব নয়। সুযোগমত খঞ্জর দ্বারা খুন করা যেতে পারে। তবে এর জন্য সময়ের প্রয়োজন।

জোকির গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় চাকরানী। মহিলা এ-ও বলে, আমি কোন সুযোগ বের করতে না পারলে হাশীশীদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। তবে তারা বিনিময় নেয় অনেক। বিনিময় যত প্রয়োজন হয় দেবে বলে নিশ্চয়তা দেয় মেয়ে দু'টো।

❖ ❖ ❖

ক্ষুব্ধ মনে নিজ কক্ষে পায়চারী করছেন নাজি। তাকে শান্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জোকি। কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে তার ক্ষোভ।

'আইউবীর কাছে আপনি আমাকে আরেকবার যেতে দিন। আমি লোকটাকে বোতলে ভরে ফেলবো।' বললো জোকি।

'লাভ হবে না। কমবখ্‌ত তার নির্দেশনামা জারি করে ফেলেছে; যার বাস্তবায়নও শুরু হয়ে গেছে। লোকটা আমার অস্তিত্ব-ই শেষ করে দিলো। তোমার যাদু তার উপর অচল। আমার বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রটা কে করলো, তা আমি জানি। বেটা আমার ক্রমবর্ধমান মর্যাদা ও যোগ্যতায় হিংসা করছে। আমি মিসরের গভর্নর হতে যাচ্ছিলাম। আমি মিসরের শাসকবর্গের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতাম। অথচ আমি ছিলাম একজন সাধারণ সালার। এখন আমি একজন সালারও নই।' গর্জে উঠে বললেন নাজি। দারোয়ানকে বললেন, ঈদরৌসকে এক্ষুণি ডেকে আনো।

সংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় নাজির নায়েব ঈদরৌস। নাজি বলেন, আমি এর উপযুক্ত একটা জবাব ঠিক করে রেখেছি।

'কী জবাব?' জানতে চায় ঈদরৌস।

'বিদ্রোহ।' বললেন নাজি।

শুনে নির্বাক নিষ্পলক নাজির প্রতি তাকিয়ে থাকে ঈদরৌস। ক্ষণকাল নীরব থেকে নাজি বললেন, তুমি অবাক্ হয়েছো? এই পঞ্চাশ হাজার সুদানী সৈন্য আমাদের ওফাদার হওয়ার ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ আছে? এরা কি সালাহুদ্দীন আইউবীর তুলনায় আমাকে ও তোমাকে বেশী মান্য করে না? তুমি কি তোমার বাহিনীকে এই বলে বিদ্রোহের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে না যে, সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদেরকে মিসরীদের গোলামে পরিণত করছে; অথচ মিসর তোমাদের?'

গভীর এক নিঃশ্বাস ছেড়ে ঈদরৌস বললো, 'এরূপ কোন পদক্ষেপ নিয়ে আমি চিন্তা করে দেখিনি। বিদ্রোহের আয়োজন আঙ্গুলের এক ইশারায়-ই হতে পারে। কিন্তু মিসরী বাহিনী আমাদের বিদ্রোহ দমন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। বাইরের সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থাও তাদের আছে। সরকারের বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আগে সবদিক ভালো করে ভেবে দেখা প্রয়োজন।'

'আমি সবই ভেবে দেখেছি। খৃষ্টান সম্রাটদের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠাচ্ছি। তুমি দু'জন দূত প্রস্তুত করো। তাদের অনেক দূর যেতে হবে। এসো, আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শোন। জোকি! তুমি তোমার কক্ষে চলে যাও।' বললেন নাজি।

নিজ কক্ষে চলে যায় জোকি। নাজি ও ঈদরৌস পরিকল্পনা আঁটে সারা রাত জেগে।

❖❖❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী দুই বাহিনীকে একীভূত করার সময় ঠিক করেছিলেন সাত দিন। কাগুজে কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। পূর্ণ সহযোগিতা করছেন নাজি। কেটে গেছে চারদিন। এ সময়ে নাজি আরেকবার সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে। কিন্তু কোন অভিযোগ করেননি। বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে সে সালাহুদ্দীন আইউবীকে নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, সপ্তম দিনে দুই বাহিনী এক হয়ে যাবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নায়েবগণও তাকে নিশ্চিত করে, নাজি বিশ্বস্ততার সাথে সহযোগিতা করছে। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের রিপোর্ট ছিলো ভিন্ন রকম। আলীর গোয়েন্দা বিভাগ রিপোর্ট করেছে, সুদানী ফৌজের সিপাহীদের মধ্যে অস্থিরতা ও বিশৃংখলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিসরী ফৌজের সঙ্গে একীভূত হতে তারা সম্মত নয়। তাদের মধ্যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মিসরী ফৌজের সঙ্গে একীভূত হলে তাদের অবস্থান গোলামের মতো হয়ে যাবে। তারা গনীমতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাদেরকে গাধার মত খাটতে হবে। সবচে' বড় ভয়, তাদের মদপান করার অনুমতি থাকবে না।

আলী বিন সুফিয়ান এ রিপোর্ট সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। জবাবে সুলতান বললেন, এরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিলাসিতা করে আসছে তো, তাই হঠাৎ এই পরিবর্তন মনোঃপূত হচ্ছে না। আশা করি ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাদের গা-সহা হয়ে যাবে। এতে চিন্তার কিছু নেই।

'আচ্ছা ঐ মেয়েটির সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করেন সুলতান।

'না। ওর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমার লোকেরাও ব্যর্থ হয়েছে। নাজি তাকে বন্দী করে রেখেছে।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

পরের রাতের ঘটনা।

সবেমাত্র আঁধার নেমেছে। জোকি তার কক্ষে উপবিষ্ট। ঈদরৌসকে সঙ্গে নিয়ে নাজি তার কক্ষে বসা। ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পায় জোকি। দরজার পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকায় সে। বাইরে দীপের আলোতে দু'জন আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে দেখতে পায় মেয়েটি। পোশাকে তাদেরকে বণিক বলে মনে হলো তার। কিন্তু ঘোড়া থেকে অবতরণ করে যখন তারা নাজির কক্ষের দিকে পা বাড়ায়, তখন তাদের চলনে বুঝা গেলো, লোকগুলো ব্যবসায়ী নয়।

ইত্যবসরে বাইরে বেরিয়ে আসে ঈদরৌস। তাকে দেখেই থেমে যায় আগন্তুকদ্বয়। সামরিক কায়দায় সালাম করে ঈদরৌসকে। ঈদরৌস তাদের চারদিক ঘুরে, আপাদমস্তক গভীরভাবে নিরীক্ষা করে বলে, অস্ত্র কোথায় দেখাও। চোগার পকেট ও আস্তিনের ভিতর থেকে অস্ত্র বের করে দেখায় তারা। ক্ষুদ্র আকারের একটি তরবারী ও একটি করে খঞ্জর। তাদেরকে ভিতরে নিয়ে যায় ঈদরৌস।

গভীর ভাবনায় হারিয়ে যায় জোকি। নিজের কক্ষ থেকে বের হয়ে নাজির কক্ষপাণে হাঁটা দেয়। কিন্তু দারোয়ান দরজায় তার গতিরোধ করে বলে, ভিতরে যেতে পারবেন না, নিষেধ আছে। জোকি বুঝে ফেলে, বিশেষ কোন ব্যাপার আছে। তার মনে পড়ে যায়, দু' রাত আগে নাজি তার উপস্থিতিতে ঈদরৌসকে বলেছিলো, 'আমি খৃষ্টান সম্রাটদের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। তুমি দু'জন দূত প্রস্তুত করো; অনেক দূর যেতে হবে।' তারপর আমাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বিদ্রোহের কথাও বলেছিলো।

নিজের কক্ষে চলে যায় জোকি। জোকি ও নাজির কক্ষের মধ্যখানে একটি দরজা, যা অপর দিক থেকে বন্ধ। এ দরজাটির সঙ্গে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে যায় জোকি। অপর কক্ষে নাজির কথা বলার ফিস্‌ফিস্ শব্দ শোনা গেলেও বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

কিছুক্ষণ পর নাজীর পরিষ্কার কণ্ঠ শুনতে পায় জোকি। সে বলছে, 'বসতি থেকে দূরে থাকবে। সন্দেহবশত কেউ তোমাদের ধরার চেষ্টা করলে সর্বাগ্রে পত্রটি গায়েব করে ফেলবে। জীবন বাজি রেখে কাজ করবে। পথে যে-ই তোমাদের গতিরাধ করবে, নির্দ্ধিধায় তাকে শেষ করে দেবে। সফর তোমাদের চার দিনের; কিন্তু পৌছে যাওয়ার চেষ্টা করবে তিন দিনে। দিকটা মনে রেখ; উত্তর-পশ্চিম।'

বাইরে বেরিয়ে পড়ে আগন্তুকদ্বয়। জোকিও বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। নাজি ও ঈদরৌস দাঁড়িয়ে আছে ফটকের সামনে। আরোহীদের বিদায় দেয়ার জন্য-ই তারা বের হয়েছে বোধ হয়।

দু'টি ঘোড়ায় চড়ে দু' আরোহী ছুটে চলে দ্রুত। জোকিকে দেখে নাজি ডাক দিয়ে বলেন, 'আমি বাইরে যাচ্ছি, অনেক কাজ আছে, ফিরতে দেরী হবে, তুমি আরাম করো। একাকী ভালো না লাগলে হেরেমে ঘুরে আসো।'

হাত তুলে 'ঠিক আছে' বলে সম্মতি জানায় জোকি।

মহল ত্যাগ করে চলে যায় নাজি ও ঈদরৌস। কক্ষে প্রবেশ করে জোকি। চোগা পরিধান করে কটিবন্ধে খঞ্জর বাঁধে। কক্ষের দরজায় তালা দিয়ে হাঁটা দেয় হেরেমের দিকে।

জোকির কক্ষ থেকে হেরেমের দূরত্ব কয়েকশ' গজ। দারোয়ানকে অবহিত করে হেরেমে প্রবেশ করে সে। অপ্রত্যাশিতভাবে জোকিকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে হেরেমের মেয়েরা। এ-ই প্রথমবার হেরেমে প্রবেশ করলো জোকি। হেরেমের মেয়েরা তাকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানায়। যে দু'টি মেয়ে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো, সহাস্যে অভিবাদন জানায় তারাও। কক্ষময় ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জোকি। সবার সাথে কথা বলে ফেরত রওনা হয়। যে চতুর চাকরানীটি তাকে খুন করার দায়িত্ব নিয়েছিলো, বিদায়ের সময় সেও সেখানে উপস্থিত। গভীর দৃষ্টিতে জোকির আপাদমস্তক একবার দেখে নেয় সে। জোকি বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

হেরেমের প্রাসাদ আর নাজির বাসগৃহের মধ্যবর্তী জায়গাটা অনাবাদী; কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। হেরেম থেকে বেরিয়ে জোকি নাজির বাসগৃহে না গিয়ে দ্রুতগতিতে হাঁটা দেয় অন্যদিকে। ওদিকে একটি সরু গলিপথও আছে।

অতি দ্রুত হাঁটছে জোকি। হঠাৎ গলিপথের পনের-বিশ গজ পিছনে একটি কালো ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে তার। সেটিও এগিয়ে চলছে দ্রুত। হয়তো বা কোন মানুষ। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি কালো চাদরে আবৃত থাকায় তাকে ভূত বলেই মনে হলো জোকির কাছে।

হাঁটার গতি আরো বাড়িয়ে দেয় জোকি। সাথে সাথে ভূতের গতি বেড়ে যায় আরো বেশী। সামনে ঘন ঝোপ-ঝাড়। তার মধ্যে অর্ন্তহিত হয়ে যায় জোকি। সেখান থেকে আড়াই থেকে তিনশ' গজ সম্মুখে সুলতান আইউবীর বাসগৃহ, যার আশপাশে সেনা বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের আবাস।

জোকি যাচ্ছিলো ওদিকেই। মেয়েটি ঘন ঝোপের মধ্য থেকে বের হলো বলে, এমন সময় বাঁ দিক থেকে ছায়া মূর্তিটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। জোছনা রাত। তবু ছায়াটির মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে না। তার পায়ের কোন শব্দ নেই। হাতটা উপরে উঠে যায় ছায়াটির। জোছনার আলোয় একটি খঞ্জর চিক করে ওঠে এবং বিদ্যুদগতিতে জোকির কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যখানে এসে বিদ্ধ হয়। জোকির মুখ থেকে কোন চীৎকার বেরোয়নি। খঞ্জর তার কাঁধ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এতো গভীর জখম খেয়েও মেয়েটি দ্রুতগতিতে কোমর থেকে খঞ্জর বের করে। ছায়া

মূর্তিটি তার উপর পুনর্বার আক্রমণ চালায়। এবার জোকি আক্রমণকারার খঞ্জরধারী হাতটা নিজের বাহু দ্বারা প্রতিহত করে নিজের খঞ্জরটা তার বুকে সেঁধিয়ে দেয়। আঘাত খেয়ে ছায়া মূর্তিটি চীৎকার করে ওঠে। এবার জোকি বুঝতে পারে আক্রমণকারী মূর্তিটি একজন নারী। জোকি খঞ্জরটা তার বুক থেকে বের করে পুনরায় আঘাত হানে। এবার বিদ্ধ হয় ছায়া মূর্তির পিঠে। আঘাত লাগে নিজের পাজরেও। ছায়া মূর্তিটি ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আক্রমণকারী লোকটা কে দেখার চেষ্টা করলো না জোকি। ছুটে চললো গন্তব্যপানে। তার শরীর থেকে ফিনকি ধারায় রক্ত ঝরছে। জোৎস্নালোকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বাসগৃহ দেখতে পাচ্ছে জোকি। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর মাথাটা চক্কর খেয়ে ওঠে তার। চলার গতি মন্থর হতে শুরু করেছে। জোকি চীৎকার করে ওঠে– 'আলী! আইউবী! আলী! আইউবী!

পরনের পোশাক রক্তে লাল হয়ে গেছে জোকির। সীমাহীন কষ্টে পা টেনে টেনে অগ্রসর হচ্ছে মেয়েটি। গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে সে। কিন্তু বাকি পথ অতিক্রম করা সম্ভব মনে হচ্ছে না। দেহের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে অনর্গল ডেকে চলছে আলী ও আইউবীকে।

নিকটেই একস্থানে একজন টহল সেনা টহল দিয়ে ফিরছিলো। জোকির ডাক শুনে ছুটে আসে সে। জোকি তার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে বললো– 'আমাকে আমীরে মেসেরের নিকট পৌছিয়ে দাও। দ্রুত– অতি দ্রুত। সান্ত্রী মেয়েটিকে পিঠে তুলে সুলতান আইউবীর বাসগৃহ অভিমুখে ছুটে যায়।

❖ ❖ ❖

নিজ কক্ষে বসে আলী বিন সুফিয়ানের নিকট থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। কক্ষে তাঁর দু'জন নায়েবও উপস্থিত। আলী বিন সুফিয়ান বিদ্রোহের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। সে নিয়েই আলাপ-আলোচনা করছেন তাঁরা। চরম ভয়ার্ত চেহারায় কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। বলে, এক সেপাহী একটি জখমী মেয়েকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, মেয়েটি নাকি আমীরে মেসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে।

শুনেই আলী বিন সুফিয়ান ধনুক থেকে ছুটে যাওয়া তীরের ন্যায় কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। সুলতান আইউবীও তার পেছনে পেছনে ছুটে যান। ইত্যবসরে মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে। সুলতান আইউবী বললেন– 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকো।' মেয়েটিকে সুলতান আইউবীর খাটের উপর শুইয়ে দেয়া হলো। মুহূর্ত মধ্যে বিছানাপত্র রক্তে ভিজে যায়।

'ডাক্তার-কবিরাজ কাউকে ডাকতে হবে না'- ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বললো- 'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

'তোমাকে কে জখম করলো জোকি?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন।

আগে জরুরী কথাগুলো শুনুন- জোকি বললো- 'উত্তর-পূর্ব দিকে ঘোড়া হাঁকান। দু'জন অশ্বারোহীকে যেতে দেখবেন। উভয়ের পোশাকই বাদামী বর্ণের। একটি ঘোড়া বাদামী, অপরটি কালো। লোকগুলোকে দেখতে ব্যবসায়ী মনে হবে। তাদের সঙ্গে সালার নাজির লিখিত পয়গাম আছে, যেটি খৃষ্টান সম্রাট ফ্রাংক বরাবর পাঠানো হয়েছে। নাজির এই সুদানী ফৌজ বিদ্রোহ করবে। আমি আর কিছু জানি না। আপনাদের সালতানাত কঠিন বিপদের সম্মুখীন। অশ্বারোহী দু'জনকে পথেই ধরে ফেলুন। বিস্তারিত তাদের নিকট থেকে জেনে নিন।' বলতে বলতে চৈতন্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করে মেয়েটি।

অল্পক্ষণের মধ্যে দু'জন ডাক্তার এসে পৌঁছেন। তারা মেয়েটির রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চেষ্টা শুরু করেন। মুখে ঔষধ খাইয়ে দেন। ঔষধের ক্রিয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে জোকি বাকশক্তি ফিরে পায়। জরুরী বার্তা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এবার বিস্তারিত বলতে শুরু করে। নাজি ও ঈদরৌসের কথোপকথন, তাকে নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া, নাজির ক্ষুব্ধ হওয়া- দৌড়-ঝাপ এবং দু'জন অশ্বারোহীর আগমন ইত্যাদি সব কথা। শেষে জোকি বললো, আক্রমণকারী কে ছিলো, আমি জানি না। তবে আমার আঘাত খেয়ে আক্রমণকারী যে চীৎকারটা দিয়েছিলো, তাতে বুঝা গেছে লোকটা মহিলা। জোকি আক্রমণের স্থান জানায়। তৎক্ষণাৎ সেখানে দু'জন লোক প্রেরণ করা হয়। জোকি বাঁচবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করে। তার পেট ও পিঠে দু'টি গভীর জখম।

জোকির রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। বেশির ভাগ রক্ত আগেই ঝরে গেছে। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হাত ধরে চুমু খেয়ে বললো- 'আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রাখুন। আপনি পরাজিত হতে পারেন না। সালাহুদ্দীন আইউবীর ঈমান কতো পরিপক্ক আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।' তারপর আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে বললো— 'আমি কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিনি তো? আপনি আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমি তা পালন করেছি।'

তুমি প্রয়োজনের বেশি দায়িত্ব পালন করেছো- আলী বিন সুফিয়ান বললেন- 'আমার তো ধারণাই ছিলোনা, নাজি এতো ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত এবং

তোমাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমি তোমাকে শুধু গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রেরণ করেছিলাম।'

'হায়, আমি যদি মুসলমান হতাম!'– জোকি বললো– তার চোখে অশ্রু নেমে আসে। বললো– 'আমার এ কাজের যা বিনিময় দেবেন, আমার অন্ধ পিতা ও চিররুগ্ন মাকে দিয়ে দেবেন। তাদের অক্ষমতাই বারো বছর বয়সে আমাকে নর্তকী বানিয়েছিলো।'

জোকির মাথাটা একদিকে ঝুঁকে পড়ে। চোখ দু'টো আধখোলা। ঠোঁট দুটোও এমনভাবে আছে, যেনো মেয়েটি মিটিমিটি হাসছে। ডাক্তার তার শিরায় হাত রাখেন এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি তাকিয়ে মাথা নাড়ান। জোকির প্রাণপাখি আহত দেহের খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন– 'মেয়েটার ধর্ম যা-ই থাকুক, তাকে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে দাফন করো। ইসলামের জন্য মেয়েটা নিজের জীবন দান করেছে। ইচ্ছে করলে আমাদেরকে ধোঁকাও দিতে পারতো।'

দারোয়ান কক্ষে প্রবেশ করে বললো, বাইরে এক নারীর লাশ এসেছে। সুলতান আইউবী ও আলী বেরিয়ে দেখেন। মধ্য বয়সী এক মহিলার লাশ। অকুস্থলে দু'টি খঞ্জর পাওয়া গেছে। মহিলাকে কেউ চেনেনা। এ নাজির হেরেমের সেই চাকরানী, যে পুরস্কারের লোভে জোকির উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছিলো।

জোকিকে রাতেই সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হলো। আর চাকরানীর লাশ পূর্ণ অবজ্ঞার সাথে গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। তবে দু'টো কর্মই সম্পাদন করা হলো গোপনে।

সময় নষ্ট না করে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী উন্নত জাতের আটটি তাগড়া ঘোড়া এবং আটজন কমাণ্ডো নির্বাচন করে তাদেরকে আলী বিন সুফিয়ানের কমাণ্ডে নাজির প্রেরিত লোক দুটিকে ধাওয়া করে ধরতে পাঠিয়ে দেন।

জোকি ছিলো মারাকেশের এক নর্তকী। কেউ জানতো না তার ধর্ম কী ছিলো। তবে মুসলমান ছিলো না, খৃষ্টানও নয়। আলী বিন সুফিয়ান জানতে পারেন, সুদানী ফৌজের সালার নাজি একজন কুচক্রী ও শয়তান চরিত্রের মানুষ। তার অন্দর মহলের খবরাখবর জানার জন্য আলী গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একটি তথ্য জানতে পারেন, নাজি হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ফেদায়ীদের ন্যায় প্রতিপক্ষকে রূপসী মেয়ে ও হাশিশ দ্বারা ফাঁদে আটকায় এবং

নিজের অনুগত বানায় কিংবা খুন করায়। আলী বিন সুফিয়ান বহু খোঁজাখুঁজির পর এক ব্যক্তির মাধ্যমে জোকিকে মারাকেশ থেকে আনান এবং কৌশলে নাজির নিকট পাঠিয়ে দেন। মেয়েটির মধ্যে এমনই জাদু ছিলো যে, নাজি তাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফাঁসানোর কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মেয়েটি যে তারই জন্য একটি পাতা ফাঁদ, তা সে জানতো না। সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে নাজি নিজেই জোকির ফাঁকে আটকে যায়। জোকির মাধ্যমে তার গোপন সব তথ্য চলে যেতে শুরু করে আইউবী ও আলীর কানে। এই তথ্য গ্রহণই ছিলো মহড়ার দিন মেয়েটিকে নিজ তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের তাৎপর্য। তাঁবুতে নিয়ে সুলতান আইউবী মেয়েটির সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেননি– নাজির কাছে থেকে তার প্রাপ্ত তথ্যাবলীর রিপোর্ট গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটির দুর্ভাগ্য যে, নাজির হেরেমে তার শত্রু জন্মে যায়, তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটা হয় এবং তাকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়।

❖ ❖ ❖

আট দ্রুতগামী অশ্বারোহী নিয়ে ছুটে চলছেন আলী বিন সুফিয়ান। গন্তব্য দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। সম্রাট ফ্রাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় তাঁর জানা আছে। সে পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ-ঘাটও চেনা।

এখন পরদিন ভোর বেলা। রাতে তেমন বিশ্রাম করেননি। আরবী ঘোড়া ক্লান্ত হয়েও তাগড়া থাকে। দূর দিগন্তে খেজুর বীথির মধ্যে দু'টি ঘোড়া দেখতে পান আলী। রাস্তা পরিবর্তন ও আড়ালের জন্য তিনি টিলার কোল ঘেঁষে ঘেঁষে চলছেন। মরুভূমির ভেদ-রহস্য তার জানা আছে। লোকালয় ফেলে এখন অনেক দূরে চলে এসেছেন তিনি। বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা নেই তাঁর।

চলার গতি আরো বাড়িয়ে দেন আলী বিন সুফিয়ান। সামনের দুই আরোহী আর তাঁর দলের মধ্যকার ব্যবধান কমপক্ষে চার মাইল ছিলো। এখন দূরত্বটা কমিয়ে এনেছেন তিনি। কিন্তু ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আলী বিন সুফিয়ান ও তার বাহিনী এখন খেজুর বীথির নিকটে এসে পৌঁছেছেন। সম্মুখের আরোহী দু'জন দু' মাইল দূরে একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলছে। বোধ হয় তাদের ঘোড়াও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আরোহী দু'জন ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

ওরা পাহাড়ের আড়ালে বসে পড়েছে বলেই আলী বিন সুফিয়ান রাস্তা বদল করে ফেলেন।

দু' দলের মাঝে ব্যবধান কমে আসছে। এখন দূরত্বটা কয়েক শ' গজের বেশি হবে না। সম্মুখের আরোহীদ্বয় আড়াল থেকে সামনে চলে আসে। পিছনে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসা ঘোড়ার পদধ্বনি শুনে ফেলেছে তারা। তারা একদিকে সেরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আলী বিন সুফিয়ানের ঘোড়ার গতি আরো বেড়ে যায়। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ঘোড়া আপত্তি জানায় না। তারাও জানে, এই মিশনে আলী ও আইউবীকে সফল হতেই হবে। অতএব, কর্তব্যে অবহেলা করা চলবে না।

দলবলসহ পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন আলী। দু'টি ঘোড়া সে পথে অতিক্রম করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলো। কিন্তু এখনো বেশিদূর যেতে পারেনি। বোধ হয় পিলেয় ভয় ধরে গেছে তাদের। সম্ভবত তারা বেরুবার পথ পাচ্ছে না। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ছুটাছুটি করে ফিরছে শুধু।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোড়াগুলো এক সারিতে বিন্যস্ত করে সামনে-পিছনে ঘুরিয়ে দেন এবং পলায়নপর আরোহীদের কাছাকাছি পৌঁছে যান। দু' দলের মাঝের দূরত্ব এখন মাত্র একশ' গজ। এক তীরান্দাজ ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে তীর ছোঁড়ে। তীরটা একটি ঘোড়ার সামনের এক পায়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আরো কিছু দৌড়-ঝাঁপের পর পলায়নপর লোক দু'জন আলীর বাহিনীর বেষ্টনীতে চলে আসে। তারা অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

আলী বিন সুফিয়ান তাদের পরিচয় জানতে চান। তারা মিথ্যা বলে। নিজেদের ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তল্লাশি নেয়ার পর সেই বার্তাটি পাওয়া গেলো, যেটি নাজি তাদের দিয়ে প্রেরণ করেছিলো। উভয়কে হেফাজতে নিয়ে নেয়া হলো। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামের জন্য সময় দেয়া হলো। অভিযান সফল করে আলী বিন সুফিয়ান ফেরত রওনা হন।

অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছেন সুলতান আইউবী। দিন কেটে গেছে। রাতটাও অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। মধ্যরাতে সুলতান আইউবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখ লেগে গেছে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় কতোক্ষণ বসে থাকা যায়।

রাতের শেষ প্রহরে আইউবীর কক্ষের দরজায় আলতো করাঘাত পড়ে। তাঁর চোখ খুলে যায়। ধড়মড় করে উঠে দরজা খোলেন। আলী বিন সুফিয়ান দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে দণ্ডায়মান তাঁর আট অশ্বারোহী ও দু' কয়েদি। সুলতান

আইউবী আলী এবং কয়েদী দু'জনকে নিজের শয়নকক্ষে ডেকে নিয়ে যান এবং নাজির পত্রখানা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করেন। প্রথম প্রথম তার চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে ওঠলেও পরক্ষণেই মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নাজির বার্তাটি বেশ দীর্ঘ। সে খৃষ্টানদের জনৈক সম্রাট ফ্রাংককে লিখেছে, অমুক দিন, অমুক সময় ইউনানী, রোমান ও অন্যান্য খৃষ্টানদের সমুদ্র পথে রোম উপসাগরের দিক থেকে সৈন্য অবতরণ করিয়ে আক্রমণ করুন। আপনার আক্রমণের সংবাদ পেলেই পঞ্চাশ হাজার সুদানী সৈন্য আইউবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। মিসরের নতুন বাহিনী আপনার আক্রমণ ও আমার বিদ্রোহের একসঙ্গে মোকাবেলা করতে পারবে না। বিনিময়ে সমগ্র মিসর কিংবা মিসরের সিংহভাগ অঞ্চলের শাসন আপনাকে দান করা হবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বার্তাবাহী লোক দু'জনকে কয়েদখানার পাতাল প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখেন। তৎক্ষণাৎ নিজের নতুন বাহিনী প্রেরণ করে নাজি ও তার নায়েবদের নিজ গৃহে নজরবন্দি করে ফেলেন। হেরেমের সকল নারীকে মুক্ত করে দেন এবং নাজির যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করেন। এ সকল অভিযান গোপন রাখা হয়।

নাজির উদ্ধারকৃত পত্রটিতে আক্রমণের যে তারিখ ছিলো, সুলতান আইউবী সেটি পরিবর্তন করে অন্য তারিখ লিখে দু'জন বিচক্ষণ লোককে সম্রাট ফ্রাংকের নিকট প্রেরণ করেন। বলে দেন, তোমরা নিজেদেরকে নাজির লোক বলে পরিচয় দেবে। তাদের রওনা করিয়ে সুলতান সুদানী বাহিনীকে মিসরী বাহিনীতে একীভূত করে ফেলার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন।

আটদিন পর দূতরা ফিরে আসে। তারা সম্রাট ফ্রাংককে নাজির পত্র পৌঁছিয়ে উত্তর নিয়ে আসে। ফ্রাংক লিখেছেন, আমার আক্রমণের দু'দিন আগে যেনো সুদানীরা বিদ্রোহ করে, যাতে আইউবীর আক্রমণ মোকাবেলা করার হুঁশ-জ্ঞান না থাকে। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর অনুমতিক্রমে এই দূত দু'জনকে নজরবন্দি করে রাখেন, যাতে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে।

যেসব স্থানে খৃষ্টানদের নৌযান এসে ভেড়ার কথা, সুলতান আইউবী সেই স্থানগুলোতে নিজের সৈন্য লুকিয়ে রাখেন।

পত্রে উল্লেখিত তারিখে সম্রাট ফ্রাংক আক্রমণ চালান। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে খৃষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনী রোম উপসাগরে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিকদের পরিসংখ্যান মোতাবেক খৃষ্টানদের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা ছিলো একশত পঁচিশ।

তন্মধ্যে বারোটি ছিলো বেশ বড়। সেগুলোতে বোঝাই ছিলো সৈন্য, যারা মিসর আক্রমণ করতে এসেছিলো। এই বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন এম্লার্ক, যার পালতোলা জাহাজগুলোতে রসদ ছিলো। লাইন ধরে আসছিলো জাহাজগুলো।

প্রতিরক্ষার কমাণ্ড নিজের হাতে রাখেন সুলতান আইউবী। তিনি খৃষ্টানদেরকে সাগরের কূলে ভেড়ার সুযোগ দেন। সর্বাগ্রে বড় জাহাজটি লঙ্গর ফেলে। হঠাৎ তার উপর আগুনের বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। এগুলো মিনজানিক দ্বারা নিক্ষিপ্ত আগুন। মুসলমানদের বর্ষিত এই অগ্নিগোলা খৃষ্টানদের জাহাজ-কিশতিগুলোর পালে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঠের তৈরি জাহাজগুলোর গায়েও আগুন ধরে যায়। অপর দিক থেকে মুসলমানদের লুকিয়ে থাকা জাহাজ এসে পড়ে। তারাও খৃষ্টানদের জাহাজের উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এখন মনে হচ্ছে, যেনো রোম উপসাগরে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে এবং সাগরটা জ্বলছে। খৃষ্টানদের জাহাজগুলো মোড় ঘুরিয়ে পরস্পর ধাক্কা খেতে ও একটি অপরটিতে আগুন ধরাতে শুরু করে দেয়। নিরুপায় হয়ে জাহাজের খৃষ্টান সেনারা সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের যারা কূলে এসে ভিড়ে, তারা সুলতান আইউবীর তীরান্দাজদের নিশানায় পরিণত হয়।

ওদিকে নুরুদ্দীন জঙ্গী সম্রাট ফ্রাংকের দেশের উপর আক্রমণ করে বসেন। ফ্রাংক মিসর প্রবেশের জন্য তার বাহিনীকে স্থলপথে রওনা করিয়ে নিজে নৌ বাহিনীতে যোগ দেন। নিজ দেশে আক্রমণের সংবাদ শুনে বড় কষ্টে তিনি দেশে ফিরে যান। গিয়ে দেখেন সেখানকার চিত্র-ই বদলে গেছে।

রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের সম্মিলিত বহরটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সৈন্যরা আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে এবং আইউবীর সৈন্যদের তীর খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। তাদের এক কমাণ্ডার এম্লার্ক প্রাণে বেঁচে গেছেন। তিনি আত্মসমর্পণ করে সন্ধির আবেদন জানালে সুলতান আইউবী চড়া মূল্যের বিনিময়ে তা মঞ্জুর করেন। ইউনানী ও সিসিলির কয়েকটি জাহাজ রক্ষা পেয়েছিলো। সুলতান আইউবী তাদেরকে জাহাজগুলো ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু ফেরার পথে সমুদ্রে এমন ঝড় ওঠে যে, সবগুলো জাহাজ নদীতে ডুবে যায়।

১১৬৯ সালের ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ খৃষ্টানরা তাদের পরাজয়ে স্বাক্ষর করে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে জরিমানা আদায় করে।

কিন্তু এ জয়ের পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর জীবন ও তার দেশ মিসর আগের তুলনায় বেশির সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

# সপ্তম মেয়ে

ক্রুসেডারদের নৌ-বহর ও সেনাবাহিনীকে রোম উপসাগরে ডুবিয়ে মেরে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এখনো মিসরের উপকূলীয় অঞ্চলেই অবস্থান করছেন। সাতদিন কেটে গেছে। সুলতান আইউবী খৃষ্টানদের থেকে জরিমানাও আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু রোম উপসাগর এখনো একের পর এক নৌ-জাহাজ গলাধঃকরণ করে চলছে আর উদগীরণ করছে মানুষের লাশ। মাঝি-মাল্লা ও সৈন্যরা আগুন ধরে যাওয়া জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছিলো। এখন এক এক করে ভেসে উঠছে তাদের-ই মৃতদেহ।

দূরে মাঝ দরিয়ায় সাতদিন পরও আজ কয়েকটি জাহাজের পাল বাতাসে ফড় ফড় করছে। কোন মানুষ নেই তাতে। ছেঁড়া পাল জাহাজগুলোকে সমুদ্রের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সেগুলোর তল্লাশী নেয়ার জন্য কয়েকটি নৌকা প্রেরণ করেন। বলে দেন, যদি কোন জাহাজ বা কিশ্‌তী অক্ষত থাকে, কাজে আসার মতো হয়, তাহলে রশি বেঁধে টেনে নিয়ে আসবে। আর যেগুলো অকেজো, সেগুলোর মাল-পত্র বের করে আনবে।

খৃষ্টানদের ভাসমান জাহাজগুলোর তল্লাশী নেয়া হলো। যা পাওয়া গেলো, তন্মধ্যে বেশীর ভাগ অস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য আর মানুষের লাশ।

ভাসমান লাশগুলোকে সমুদ্রের উর্মিমালা তুলে তুলে তীরে ছুঁড়ে মারছে। লাশগুলোর কতিপয় আগুনেপোড়া। কিছু মাছেখাওয়া। অসংখ্য লাশ এমন যে, সেগুলোর গায়ে একটি বা একেরও অধিক তীর গাঁথা।

কাঠ-তক্তা ও ভাঙ্গা কিশ্‌তী অবলম্বন করে সাঁতার কেটে কেটে এখনো কিছু লোক কূলে এসে উঠছে। ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত, ক্লান্ত-অবসন্ন সেই ভাগ্যাহত লোকগুলোকে ঢেউ যাকে যেখানে ছুঁড়ে মারছে, লাশের মত সেখানে-ই পড়ে থাকছে আর মুসলমানরা তাদের তুলে আনছে। সমুদ্রতীরে মাইলের পর মাইল এই একই দৃশ্য বিরাজ করছে।

সুলতান আইউবী তার বাহিনীকে মিসরের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং যেখানে-ই কোন শত্রুসেনা সমুদ্র থেকে তীরে উঠে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুক্‌নো পোশাক আর পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ্ করার এবং আহত হলে ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারপর একস্থানে জড়ো করছেন বন্দীদের।

ঘোড়ায় চড়ে উপকূলীয় এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুলতান আইউবী। তাঁবু ছেড়ে কয়েক মাইল দূরে চলে গেছেন তিনি। সম্মুখে ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা। টিলার একদিকে সমুদ্র আর পিছনে ধু ধু মরু-প্রান্তর। এই সবুজ-শ্যামল মরুদ্যানে সারি সারি খেজুর বৃক্ষ ছাড়াও আছে নানা প্রকার মরুজাত গাছ-গাছালী, ঝোপ-ঝাড়, বৃক্ষ-লতা।

সুলতান আইউবী ঘোড়া থেকে নামলেন এবং পায়ে হেঁটে টিলার পাদদেশ বেয়ে এগিয়ে চললেন। সঙ্গে তাঁর রক্ষী বাহিনীর চার অশ্বারোহী। সুলতান নিজের ঘোড়াটা রক্ষীদের হাতে দিয়ে তাদের সেখানে-ই দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। তিন সালারও আছে তাঁরর সঙ্গে। তার মধ্যে একজন হলেন সুলতান আইউবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ। এই যুদ্ধের মাত্র একদিন আগে তিনি আরব থেকে এসেছেন। ঘোড়াটা রক্ষীদের হাতে দিয়ে সুলতানের সঙ্গে হাঁটা দেন তিনিও।

এখন শীতের মওসুম। শান্ত সমুদ্র। সুলতান আইউবী হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন অনেক দূর। দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন রক্ষীদের। এখন তার সামনে-পিছনে-বাঁয়ে উঁচু-নীচু টিলা। ডানে বালুকাময় সমুদ্রতীর। দু' আড়াই গজ উঁচু এক খণ্ড পাথরের উপর উঠে দাঁড়ান সুলতান। দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন রোম উপসাগরের প্রতি। তাঁর ঈমান-আলোকিত অবয়বে বিজয়ের আনন্দ-দীপ্তি। এক নাগাড়ে তাকিয়ে আছেন শান্ত-সমাহিত নীলাভ সমুদ্রপাণে। হঠাৎ নাকে হাত রেখে তিনি বলে উঠলেন— 'কেমন উৎকট একটা দুর্গন্ধ আসছে, না?'

সমুদ্রোপকূলে এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করে সুলতান আইউবী ও তাঁর সালারদের দৃষ্টি। কিসের যেন ফড় ফড় শব্দ কানে ভেসে আসে তাদের। তারপর হালকা চেঁচামেচি ও কন্‌কন্ শব্দ। উপর থেকে তিন-চারটি শকুন ডানা মেলে নীচে নামতে দেখা গেলো। টিলার আড়ালে সমুদ্রের তীরের দিকে অবতরণ করলো শকুনগুলো। সুলতান আইউবী বললেন— 'লাশ আছে'।

ওদিকে হেঁটে গেলেন তাঁরা। পনের-বিশ গজের বেশি যেতে হলো না। তিনটি লাশ। শকুনগুলো ভাগাভাগি করে খাচ্ছে লাশগুলো। পাঞ্জা করে একটি

মানবমুণ্ড নিয়ে  উড়ে গেলো এক শকুন। উঠে-ই চক্কর কাটে আকাশে। হঠাৎ পা থেকে ছুটে নীচে পড়ে যায় মুণ্ডটি। পতিত হয় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ঠিক সামনে।

মুণ্ডটির চোখ দু'টো খোলা। যেন চেয়ে আছে সুলতানের দিকে। মুখমণ্ডলের আকৃতি ও মাথার চুল বলছে, এটি কোন খৃষ্টানের মাথা। সুলতান আইউবী অনিমেষ নয়নে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মুণ্ডটির প্রতি। তারপর সালারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন— 'এদের  মুণ্ড সেইসব বিশ্বাসঘাতক ঈমান-বিক্রয়কারী মুসলমানদের মুণ্ড অপেক্ষা অনেক ভালো, যাদের ষড়যন্ত্রে আমাদের খেলাফত আজ নারী ও মদের চিতায় বলি হতে চলেছে।'

'খৃষ্টানরা ইঁদুরের ন্যায় আমাদের সালতানাতে ইসলামিয়াকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।' বললেন এক সালার।

'আর আমাদের বাদশাহ তাদেরকে কর দিচ্ছেন। ফিলিস্তীন আজ ইহুদীদের কজায়। মহামান্য সুলতান! আমরা কি আশা রাখতে পারি যে, ফিলিস্তীন থেকে আমরা ওদেরকে বিতাড়ন করতে পারবো?' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না শাদ্দাদ!' জবাব দেন সুলতান আইউবী।

'আল্লাহর রহমত থেকে নয়– আমরা আমাদের ভাইদের থেকে নিরাশ হয়েছি।' বললেন অপর এক সালার।

'তুমি ঠিক-ই বলেছো। যে আক্রমণ বাইরে থেকে আসে, তা আমরা প্রতিহত করতে পারি। তোমরা কেউ কি ভেবেছিলে, কাফিরদের এতো বিশাল নৌ-সেনাবহরকে এতো সামান্য শক্তি দিয়ে এতো সাফল্যের সাথে আমরা সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে পারবো? তোমরা হয়ত অনুমান করতে পারোনি, এই বহরে যে পরিমাণ সৈন্য আসছিলো, তারা সমগ্র মিসরে মাছির মতো ছেয়ে যেতো! মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহস দিয়েছেন। আর আমরা একটু কৌশল করে তাদের গোটা বহরকে সমুদ্রতলে ডুবিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার বন্ধুগণ! যে আক্রমণ ভিতর থেকে আসছে, অত সহজে তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না। তোমার ভাই যখন তোমার উপর আঘাত হানবে, তখন তুমি আগে ভাববে, সত্যি-ই কি এ-কাজ আমার ভাই করেছে, নাকি অন্য কেউ। তোমার মনে সংশয় জাগ্রত হবে, আমি ভুল বুঝছি না তো! বাহুতে তুমি তার উপর তরবারীর আঘাত হানার শক্তি পাবে না। আর যদি সাহস করে তরবারী উত্তোলন করেও ফেলো,

তখন সুযোগ বুঝে দুশমন তোমাকে ও তাকে দু'জনকে-ই খতম করে দেবে।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবী।

সঙ্গীদের নিয়ে টিলার গা ঘেঁষে ঘেঁষে সুলতান আইউবী সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গেলেন। মাথা নুইয়ে বালি থেকে একটা কি যেন তুললেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বস্তুটি হাতের তালুতে নিয়ে সকলকে দেখালেন।

কাঠের তৈরি একটি ক্রুশ। শক্ত একখণ্ড সুতায় বাঁধা। শকুনরা যে লাশগুলো খাচ্ছিলো, সুলতান আইউবী সেগুলোর বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলো দেখলেন। তারপর চোখ ফেললেন মুণ্ডটির প্রতি, যা শকুনের পাঞ্জা থেকে ছুটে তাঁর সামনে এসে পড়েছিলো। দ্রুত হেঁটে আবার মুণ্ডটির কাছে গেলেন। মুণ্ডটির মালিকানা নিয়ে লড়াই করছে তিনটি শকুন। সুলতান আইউবীকে দেখে আড়ালে চলে যায় শকুনগুলো। সুলতান মুণ্ডের উপর ক্রুশটি রাখলেন এবং দৌড়ে সালারদের নিকট চলে গেলেন। বলতে শুরু করলেন— 'আমি একবার খৃষ্টানদের এক কয়েদী অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তার গলায়ও ক্রুশ ছিলো। সে আমাকে বলেছিলো, যেসব খৃষ্টান সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়, ক্রুশে হাত রেখে তাদের থেকে শপথ নেয়া হয় যে, ক্রুশের নামে তারা জীবনবাজি রেখে লড়াই করবে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে সর্বশেষ মুসলমানটি খতম না করে ক্ষান্ত হবে না। এই হলফের পর প্রত্যেক সৈন্যের গলায় একটি করে ক্রুশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এখানে বালির মধ্যে আমি একটি ক্রুশ কুড়িয়ে পেয়েছি। কার ছিলো জানি না। রেখে দিয়েছি ঐ খুলিটির উপর, যাতে তার আত্মা ক্রুশবিহীন না থাকে। লোকটা ক্রুশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। একজন সৈনিককে তার শপথের মর্যাদা দেয়া উচিত।'

'মাননীয় সুলতান! আপনার অবশ্যই জানা আছে, খৃষ্টানরা জেরুজালেমের মুসলিম নাগরিকদেরকে কী পরিমাণ কষ্ট দিচ্ছে। স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওখানকার মুসলমানরা। লুণ্ঠিত হচ্ছে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত-সম্ভ্রম। আমাদের বন্দীদেরকে ওরা এখনো মুক্তি দেয়নি। তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। খৃষ্টানদের থেকে কি আমরা এর প্রতিশোধ নেবো না?' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'প্রতিশোধ নয়– নেবো ফিলিস্তীন। কিন্তু ফিলিস্তীনের পথ যে আগলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শাসকগোষ্ঠী!' বললেন সুলতান আইউবী।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে সুলতান আইউবী আরো বললেন, ক্রুশে হাত রেখে সালতানাতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে খৃষ্টানরা। আমি আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুকে হাত রেখে শপথ নিয়েছি, ফিলিস্তীন উদ্ধার আমি

করবো-ই। আমি সালতানাতে ইসলামিয়ার সীমানা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবো। কিন্তু আমার বন্ধুগণ! আমার কাছে আমাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। এক সময় এমন ছিলো যে, খৃষ্টানরা ছিলো রাজা, আমরা ছিলাম যোদ্ধা। আর এখন আমাদের বুজুর্গরা পরিণত হচ্ছেন রাজায় আর খৃষ্টানরা হচ্ছে যোদ্ধা। উভয় জাতির গতি-প্রকৃতি দেখে আমার মনে হচ্ছে, একটি সময় এমন আসবে, যখন মুসলমানরা রাজায় পরিণত হয়ে যাবে ঠিক; কিন্তু তাদের উপর শাসন চালাবে খৃষ্টানরা। মুসলমানরা রাজা হওয়ার আনন্দে-ই বিভোর হয়ে থাকবে। তারা বলবে, আমরা স্বাধীন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের স্বাধীন সত্ত্বা বলতে কিছু-ই থাকবে না। তারা কাফিরদের দাসত্ব ছাড়া এক পা-ও চলতে পারবে না। আমি ফিলিস্তীন উদ্ধার করার সংকল্প গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু মুসলমানদের গাদ্দারী ঠেকাবে কে? খৃষ্টানদের মস্তিষ্ক বড় উর্বর। পঞ্চাশ হাজার সুদানী সৈন্যকে পুষছিলো কারা? আমাদের খেলাফত নিজের আঁচলে পুষেছিলো নাজি নামক একটি বিষধর সর্পকে। আমিই বোধ হয় মিসরের প্রথম গভর্নর, যে দেখতে পেয়েছে, এই বাহিনী দেশের জন্য অনর্থক-ই নয়– ভয়ঙ্করও বটে। নাজির চক্রান্ত যদি ফাঁস না হতো, তাহলে আমরা এই বাহিনীটির হাতে নিঃশেষ-ই হয়ে গিয়েছিলাম।'

হঠাৎ হাল্কা একটা শো শব্দ ভেসে আসে সকলের কানে। একটি তীর এসে গেঁথে যায় সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর দু' পায়ের মাঝে বালিতে। সুলতান আইউবীর পিঠের দিক থেকে ছুটে আসে তীরটি। সেদিকে দৃষ্টি ছিলো না কারুর।

তীরটি যেদিক থেকে ছুটে আসে, হঠাৎ চমকে উঠে সেদিকে চোখ তুলে তাকায় সকলে। উচু-নীচু কয়েকটি টিলা ছাড়া দেখা গেলো না কিছু-ই। সবাই উঠে দাঁড়ান। দৌড়ে গিয়ে দেয়ালের মত উঁচু একটি টিলার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেন। আরো তীর আসার আশঙ্কা আছে। খোলা ময়দানে তীরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাহাদুরী নয়। মুখে আঙ্গুল রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সজোরে শিস্ দেন শাদ্দাদ। রেকাবে পা রেখে প্রস্তুত হয়ে-ই ছিলো রক্ষী বাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে তাদের ঘোড়াগুলো। তার সঙ্গে তিনজন সালার ছুটে যান সেদিকে, যেদিক থেকে তীরটি এসেছিলো। তিনজন তিন পথে উঠে যায় টিলায়। সালাহুদ্দীন আইউবীও ছুটে যান তাদের পিছনে। দেখে এক সালার বললো, 'সুলতান! আপনি আসবেন না।' কিন্তু তার বাধা মানলেন না সুলতান আইউবী।

ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে রক্ষী বাহিনী। সুলতান আইউবী তাদের বললেন, 'ঘোড়াগুলো এখানে রেখে টিলার পিছনে যাও। ওদিক থেকে একটি তীর এসেছে। যাকে-ই পাবে, ধরে নিয়ে আসবে।'

একটি টিলার উপরে উঠে যান সুলতান। চারদিক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছোট-বড়, উঁচু-নীচু অসংখ্য টিলা চোখে পড়ে তাঁর। সালারদের নিয়ে পিছন দিকে নেমে পড়েন তিনি। চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখে আবার উঠে আসেন। টিলায় চোখ বুলিয়ে চতুর্দিক তাকালেন। কিন্তু নাম-গন্ধও নেই কোন মানুষের।

পাথুরে এলাকার ভিতরে, উপরে-নীচে, ডানে-বাঁয়ে সর্বত্র পাতিপাতি করে খুঁজে বেড়ায় রক্ষীরা। কিন্তু কিছু-ই দেখতে পেলো না তারা।

নীচে নেমে সুলতান আইউবী সে স্থানে চলে আসলেন, যেখানে বালিতে তীরটি বিদ্ধ হয়েছিলো। সহকর্মীদের ডাকলেন এবং তীরটির গায়ে হাত রাখলেন। পড়ে গেলো তীরটি। সুলতান বললেন— 'দূর থেকে এসেছে, তাই পায়ের পাশে পড়েছে। অন্যথায় ঘাড়ে কিংবা পিঠে এসে বিদ্ধ হতো। আর বালিতেও বেশী গাঁথেনি।' তীরটি হাতে তুলে নিয়ে সুলতান আইউবী দেখলেন এবং বললেন, 'হাশীশীদের নয়– খৃষ্টানদের তীর।'

'সুলতানের জীবন হুমকীর সম্মুখীন।' বললেন এক সালার।

'আর আজীবন হুমকীর মধ্যে-ই থাকবে'– মুখে হাসি টেনে সুলতান বললেন– 'আমি রোম উপসাগরে কাফিরদের সেসব জাহাজ-কিশ্‌তী দেখার জন্য বের হয়েছিলাম, যেগুলো মাঝি-মাল্লাবিহীন ভাসছিলো। কিন্তু আমার প্রিয় বন্ধুগণ! খৃষ্টানদের কিশতী সমুদ্রে ভাসছে ভাববেন না। তারা আবার আসবে। আসবে বজ্রের মতো গর্জন করতে করতে। বর্ষিবেও। তারা আঘাত হানবে মাটির নীচ আর পিঠের পিছন থেকে। এখন থেকে খৃষ্টানদের সঙ্গে আমাদের এমন লড়াই লড়তে হবে, যা শুধু সৈন্যরা-ই লড়বে না। সামরিক প্রশিক্ষণে আমি নতুন এক মাত্রা যোগ করছি। তা হলো গোয়েন্দা লড়াই।'

তীরটি হাতে নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন সুলতান আইউবী। রওনা দিলেন ক্যাম্পের দিকে। তাঁর সালারগণও ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। একজন নিজের ঘোড়া নিয়ে এলেন সুলতানের ডান দিকে। একজন আসলেন বাঁ দিকে। একজন অবস্থান নিলেন সুলতানের পিছনে, ঠিক তার সন্নিকটে, যাতে কোন দিক থেকে তীর আসলে তা সুলতানের গায়ে আঘাত হানতে না পারে।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তীর ছোঁড়া হলো। কিন্তু সে জন্য বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই তাঁর। খৃষ্টান গুপ্তচর ও কমাণ্ডোরা কিরূপ ক্ষতি-সাধন করছে, নিজের তাঁবুতে বসে সালারদের কাছে তারই বিবরণ দিচ্ছেন

তিনি। সুলতান আইউবী বললেন— 'আলী বিন সুফিয়ানকে আমি একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। বিলম্ব না করে তোমরা নিজ নিজ সিপাহী ও কমাণ্ডারদের মধ্য থেকে এমন কিছু লোক বেছে নাও, যারা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী ও উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। তাদের মধ্যে থাকবে উটের ন্যায় দিনের পর দিন ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করার শক্তি, সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার দক্ষতা। যাদের দৃষ্টি হবে ব্যাঘ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, যারা দৌড়াতে পারে খরগোশ ও হরিণের মতো। যারা বিনা অস্ত্রে লড়াই করতে পারে সশস্ত্র দুশমনের সঙ্গে। সর্বোপরি তাদের মধ্যে থাকবে না কোন প্রকার মদ-মাদকতার অভ্যাস। তারা লোভে পড়ে নীতি-নৈতিকতা ত্যাগ করবে না। যতো রূপসী নারী-ই তাদের হাতে আসুক, যত সোনা-দানা, অর্থ-বৈভব তাদের পায়ে নিক্ষিপ্ত হোক, সবকিছু উপেক্ষিত হয়ে দৃষ্টি থাকবে তাদের কর্তব্যের প্রতি।'

তোমরা তোমাদের অধীন সকলকে বলে দাও, বুঝিয়ে দাও যে, গুপ্তচরবৃত্তি, সেনাদের মধ্যে অশান্তি-অস্থিরতা বিস্তার এবং চেতনার দিক থেকে সৈন্যদের অথর্ব করে তোলার জন্য খৃষ্টানরা সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করছে। আমি মুসলমানদের মধ্যে একটি দুর্বলতা লক্ষ্য করছি, তারা নারীর প্রলোভনে অল্প সময়ে অস্ত্র ত্যাগ করে। এমন কাজে আমি মুসলিম নারীদের কখনো দুশমনের এলাকায় প্রেরণ করবো না। আমরা নারীর ইজ্জতের মোহাফেজ। সেই ইজ্জতকে আমরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। আলী বিন সুফিয়ানের হাতে কয়েকটি মেয়ে আছে। কিন্তু ওরা মুসলমান নয়, খৃষ্টানও নয়। তারপরও আমি এর পক্ষপাতি নই।

তাঁবুতে প্রবেশ করে রক্ষীবাহিনীর কমাণ্ডার। বলে, আমার বাহিনীর লোকেরা কয়েকজন পুরুষ ও কয়েকটি মেয়ে ধরে নিয়ে এসেছে। সুলতান আইউবী বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিন সালারও বেরিয়ে আসেন তাঁর সঙ্গে। বাইরে পাঁচজন লোক দণ্ডায়মান। লম্বা চোগা, পাগড়ী আর ধরণ-প্রকৃতি বলছে, লোকগুলো বণিক। সঙ্গে তাদের সাতটি মেয়ে। সব ক'টিই যুবতী এবং একজন অপেক্ষা অপরজন অধিক রূপসী।

রক্ষীদের একজন– যে সুলতান আইউবীর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা তীরের উৎসের সন্ধানের গিয়েছিলো– বললো, আমরা সমগ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলাম; কিন্তু কোন মানুষের সন্ধান পেলাম না। পিছনে আরো দূরে

চলে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম, এরা তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছে। সঙ্গে তিনটি উট।

'এদের তল্লাশী নেয়া হয়েছে কি?' এক সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, হয়েছে। বলছে, এরা ব্যবসায়ী। আমরা এদের জিনিসপত্র সব খুলে দেখেছি। দেহ-তল্লাশীও নিয়েছি। কিন্তু এই খঞ্জরগুলো ছাড়া আর কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি।' বলেই পাঁচটি খঞ্জর সুলতান আইউবীর পায়ের কাছে রেখে দেয় এক রক্ষী।

'আমরা মারাকেশের ব্যবসায়ী। যাবো ইস্কান্দারিয়া। দু'দিন আগে আমাদের অবস্থান ছিলো এখান থেকে দশ ক্রোশ পিছনে। পরশু সন্ধ্যায় এই মেয়েগুলো আমাদের হাতে আসে। তখন তাদের পরিধানের পোশাক ছিলো ভেজা। তারা আমাদের জানালো, তারা সিসিলির বাসিন্দা। খৃষ্টান সৈন্যরা এদের ঘর থেকে উঠিয়ে এনে একটি জাহাজে তুলে নেয়। এরা গরীব পিতা-মাতার সন্তান। এরা বলছে, বিপুলসংখ্যক জাহাজ ও নৌকা রওনা হয়েছিলো। এদেরকে যে জাহাজে তোলা হয়েছিলো, তাতে কমাণ্ডার গোছের কয়েকজন লোক এবং বেশ ক'জন সৈন্যও ছিলো। তারা নিজেরা মদ খেয়ে, এদেরও মদ খাইয়ে আমোদ করতে থাকে। সমুদ্রের এ-পারের নিকটবর্তী হলে জাহাজগুলোতে আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষগুলো জাহাজ থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। এদেরকে তারা একটি নৌকায় বসিয়ে জাহাজ থেকে সমুদ্রে নামিয়ে ভাসিয়ে দেয়। এরা বলছে, এদের কেউ নৌকা বাইতে জানে না। তাই মাঝি-মাল্লাবিহীন নৌকাটি সমুদ্রে হেলে-দুলে ভাসতে থাকে। পরে একদিন আপনা-আপনি-ই নৌকাটি কূলে এসে ভিড়ে। আমরা কূলের কাছাকাছি-ই অবস্থান করছিলাম। এরা আমাদের কাছে চলে আসে। বড় বিপন্ন অবস্থায় ছিলো মেয়েগুলো। আমরা এদের আশ্রয় প্রদান করি। এই অসহায় নারীদেরকে তাড়িয়েও দিতে পারছিলাম না; আবার বুঝেও আসছিলো না যে, এদেরকে আমরা কী করি। অগত্যা এদেরকে নিয়ে আমরা সম্মুখে রওনা হই এবং একস্থানে এসে ছাউনি ফেলি। হঠাৎ এই আরোহীগণ এসে পড়েন এবং আমাদের তল্লাশী নিতে শুরু করেন। আমরা তাদের নিকট এই তল্লাশীর কারণ জানতে চাই। তারা বললেন, এটা মিসরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ। আমরা অনুনয়-বিনয় করে বলি, আমাদেরকে তোমরা সুলতানের কাছে নিয়ে চলো; তাঁকে-ই আমরা নিবেদন করবো, যেন এই অসহায় মেয়েগুলোকে

তিনি তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নেন। চলার পথে আমরা এদেরকে কোথায় নিয়ে ফিরবো।'

মেয়েদের সঙ্গে কথা বললে তারা সিসিলী ভাষায় জবাব দেয়। বড় ভীত-সন্ত্রস্থ মনে হলো তাদের। দু' তিনজন একত্রে-ই কথা বলতে শুরু করে। সুলতান সালাহুদ্দীন বণিকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ এদের ভাষা বুঝ কি? একজন বললো, শুধু আমি বুঝি। এরা নিবেদন করছে, সুলতান যেন এদেরকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে নেন। এরা বলছে, আমরা বণিক কাফেলার সঙ্গে যেতে রাজি নই। এমনও হতে পারে, পথে দস্যুরা আমাদের তুলে নিয়ে যাবে। তাছাড়া এখন যুদ্ধ চলছে। সর্বত্র খৃষ্টান ও মুসলিম সেনারা গিজগিজ করছে। আমরা সৈন্যদের অনেক ভয় পাই। ঘর থেকে যখন আমাদেরকে অপহরণ করা হয়, তখন আমরা কুমারী ছিলাম, খৃষ্টান সৈন্যরা জাহাজে আমাদেরকে গণিকায় পরিণত করেছে।

এক মেয়ে কিছু বললে বণিক তার তরজমা করে বললো, 'মেয়েটি বলছে, আমাদেরকে মুসলমানদের রাজার নিকট পৌছিয়ে দিন; হয়ত তিনি আমাদের প্রতি সদয় হবেন।'

মুখ খুললো অপর এক মেয়ে। বণিক বললো, এই মেয়েটি বলছে, 'আমাদেরকে আর যা-ই করুন, খৃষ্টান সৈন্যদের হাতে তুলে দেবেন না। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের স্ত্রী হতে পারবো এই নিশ্চয়তা পেলে আমি মুসলমান হয়ে যাবো।'

পিছনে দাঁড়িয়ে মুখ লুকাবার চেষ্টা করছে দু' তিনটি মেয়ে। মুখে তাদের ভীতির ছাপ। ভয়ে কিংবা লজ্জায় কথা বলতে পারছে না তারা।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী বণিককে বললেন, এদেরকে বলো, এরা খৃষ্টানদের কাছে ফিরে যাক আর না যাক আমরা কিন্তু এদেরকে মুসলমান হতে বাধ্য করবো না। এই যে মেয়েটি একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের স্ত্রী হওয়ার নিশ্চয়তার শর্তে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো, তাকে বলো, আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা, মেয়েটি এক অপারগ অবস্থায় ও বিপদের মুহূর্তে মুসলমান হতে চাইছে। তাদের বলো, যদি আমার প্রতি তাদের আস্থা থাকে, তাহলে মুসলিম নারীর ন্যায় তাদেরকে আমি আমার আশ্রয়ে নিয়ে নেবো। রাজধানীতে পৌছে আমি তাদেরকে জেরুজালেমে খৃষ্টান পাদ্রীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।

দোভাষী বণিকের মুখে সুলতান আইউবীর সিদ্ধান্তের কথা শুনে মেয়েরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। আনন্দের ঝিলিক ফুটে উঠে তাদের চোখে-মুখে। তারা সুলতান আইউবীর এই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে। সুলতান আইউবী মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র তাঁবুর ব্যবস্থা করেন এবং বাইরে সর্বক্ষণ একজন প্রহরী নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দেন।

বন্দী মেয়েদের তাঁবু কোথায় স্থাপন করা হবে বলতে যাচ্ছিলেন সুলতান আইউবী। এমন সময় তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসা হয় ছয়জন খৃষ্টান কয়েদী। লোকগুলোর পরনের কাপড় ভেজা। স্থানে স্থানে রক্তের দাগ ও বালিমাখা। মড়ার মত ফ্যাকাশে চেহারা, বিধ্বস্ত শরীর।

কমাণ্ডার জানায়, এরা এখান থেকে দেড়-দু' মাইল দূরে সমুদ্রতীরে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে ছিলো। এরা সমুদ্র মাঝে একটি ভাঙ্গা নৌকায় ভাসছিলো। ভিতরে পানি ঢুকে একদিন নৌকাটি ডুবে যায়। এরা সাঁতার কেটে বহু কষ্টে কূলে এসে উঠে। ছিলো বাইশজন। এখন জীবিত আছে মাত্র এই ছয়জন।

তারা খৃষ্টান বাহিনীর সদস্য। সুলতান আইউবীর সামনে এসে বসে পড়ে ধড়াস্ করে। একজনের চেহারা বলছে, লোকটি সাধারণ সৈনিক নয়। সে কোঁকাচ্ছে। পোশাকে তার রক্তের দাগ নেই; আহতদের চেয়ে বেশী কষ্টে আছে বলে মনে হলো তাকে। মেয়েগুলোর প্রতি এক নজর দৃষ্টিপাত করে আবার কোঁকাতে শুরু করে লোকটি।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নির্দেশ ছিলো, যখন যে ধরা পড়বে, তাকে-ই যেন তাঁর সামনে হাজির করা হয়। সমুদ্রে খৃষ্টান বাহিনীর নৌ ও সেনাবহর ধ্বংস হওয়ার পর এখন জীবনে রক্ষা পাওয়া খৃষ্টান সেনারা একের পর এক বন্দী হচ্ছে আর নীত হচ্ছে সুলতান আইউবীর দরবারে। সুলতান আইউবী এ বন্দীদের প্রতিও চোখ তুলে তাকালেন; কিন্তু বললেন না কিছু-ই। তবে অফিসার গোছের যে লোকটি বেশী কোঁকাচ্ছিলো এবং যার পোশাকে রক্তের দাগ নেই, তাকে খুটিয়ে খুটিয়ে নীরিক্ষা করে দেখলেন তিনি। ক্ষীণকণ্ঠে সালারদের বললেন, 'আলী বিন সুফিয়ান এখনো আসলো না! এই বন্দীদের তো অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার ছিলো, এদের কাছ থেকে তথ্য নেয়ার প্রয়োজন ছিলো।' এ কয়েদীর প্রতি ইঙ্গিত করে সুলতান বললেন— 'এ লোকটিকে কমাণ্ডার বলে মনে হয়। একে চোখে চোখে রাখতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান আসলে বলবে, এদেরকে যেন ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য নেয়। সম্ভবত এ লোকটা ভিতরে আঘাত পেয়েছে,

হাড়-গোড় ভেঙ্গে গেছে। এদের এখনি আহত কয়েদীদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও। খাবার-পানি দাও, ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসা করাও।'

ছয় পুরুষ বন্দীকে নির্ধারিত তাঁবুর দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েগুলো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তাদের প্রতি। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েদেরও।

ফৌজি ক্যাম্পের সামান্য দূরে মেয়েদের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। সেখান থেকে কয়েকশ' গজ দূরে আহত বন্দীদের তাঁবু। নতুন একটি তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে সেখানেও। পার্শ্বে মাটিতে পড়ে আছে ছয় নতুন আহত বন্দী। মেয়েগুলো তাকিয়ে আছে তাদের প্রতি।

তাঁবু দু'টো দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েরা চলে গেছে তাদের তাঁবুতে। আহত বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয় নতুন তাঁবুতে। মেয়েদের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে যায় একজন প্রহরী। অল্পক্ষণের মধ্যে খাবার চলে আসে। মেয়েরা আহার করে নেয়। একটি মেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে নতুন আহত বন্দীদের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন আর তার চেহারায় ভীতির ছাপ নেই। প্রহরী তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। সে-ও প্রহরীর দিকে তাকায়। চোখাচোখি হয় দু'জনের। মেয়েটি মুখে হাসি টেনে ইঙ্গিতে বলে, আমি একটু ঐ আহত লোকগুলোর তাঁবুতে যেতে চাই। প্রহরীও ইশারায় তাকে বারণ করে। মেয়েদের তাঁবু থেকে বের হয়ে কোথাও যাওয়ার বা কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নেই। মেয়েদের ও আহত বন্দীদের তাঁবুর মাঝে অনেকগুলো বৃক্ষ। বাঁ দিকে মাটির একটি টিলা। টিলাটি ঝোপ-ঝাড়ে আচ্ছন্ন।

সূর্য ডুবে গেছে। রাত আঁধার হতে চলেছে। নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে প্রকৃতি। রাতের নিস্তব্ধতায় আহত বন্দীদের কোঁকানির শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। দূরবর্তী রোম উপসাগরের কুলকুল রবও চাপা গুঞ্জনের ন্যায় কানে আসতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নিজের তাঁবুতে বিরাজ করছে দিনের পরিবেশ। কারো চোখে ঘুম নেই সেখানে। তিন সালার উপবিষ্ট সুলতানের কাছে।

সুলতান আইউবী পুনরায় বললেন— 'আলী বিন সুফিয়ান এখনো আসলো না?' কণ্ঠে তাঁর অস্থিরতার সুর। একটু থেমে আবার বললেন— 'তার দূতও আসলো না, না?'

'কোন অসুবিধা হলে তো সংবাদ পেতাম। আশা করি সেখানে সব ঠিক আছে।' বললেন এক সালার।

'আশা তো এমন-ই থাকা উচিত। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সৈন্য-ই যদি বিদ্রোহ করে বসে, তবে তো সামলানো কঠিন হয়ে পড়বে। আমাদের সৈন্য মাত্র সাড়ে তিন হাজার। দেড় হাজার অশ্বারোহী আর দু' হাজার পদাতিক। তাদের মোকালোয় সুদানী সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক বেশী, অভিজ্ঞও বটে।' বললেন সুলতান আইউবী।

'নাজি ও তার কুচক্রী সহচরদের নির্মূল করার পর বিদ্রোহ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া সেনাবিদ্রোহ হয় না।' বললেন অপর এক সালার।

'আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্যে যে আলীকে দরকার!' বললেন সুলতান আইউবী।

ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ অভিযানে সুলতান আইউবী নিজেই এসে পড়েছিলেন এখানে। সুদানী সৈন্যদের বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকায় আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছিলেন রাজধানীতে। এতক্ষণে ফিরে এসে সুলতানকে সেখানকার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার কথা। কিন্তু আলী আসলেন না এখনো। তাই সুলতান অস্থির। ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে তার উৎকণ্ঠা।

সালারদের সঙ্গে কায়রোর পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন সুলতান আইউবী। গোটা ক্যাম্প গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জেগে আছে শুধু সেই সাতটি মেয়ে, সুলতান আইউবী যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পর্দা ফাঁক করে তাঁবুর ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে প্রহরী। ভিতরে বাতি জ্বলছে। টের পেয়ে জাগ্রত মেয়েগুলো ঘুমের ভান করে নাক ডাকতে শুরু করে। মেয়েগুলোকে গুণে দেখে প্রহরী। ঠিক আছে– সাতজন। ঘুমিয়ে আছে সবাই। পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে সরে আসে প্রহরী। বসে পড়ে তাঁবুর কাছ ঘেঁষে।

তাঁবুর পর্দাসংলগ্ন শায়িত মেয়েটি নীচ থেকে পর্দাটা উঁচু করে সতর্কতার সাথে বাইরে তাকায়। পার্শ্বের মেয়েটির কানে কানে বলে, 'বসে পড়েছে'। পার্শ্বের জন তার পার্শ্বের জনকেও বলে, 'বসে পড়েছে'। এভাবে এক এক করে সব ক'টি মেয়ের কানে খবর পৌঁছে যায়, 'প্রহরী বসে পড়েছে'।

তাঁবুর অপর দরজার কাছে শুয়ে আছে যে মেয়েটি, সাবধানে উঠে বসে সে। মাটিতে বিছানো শয্যা। একটি কম্বল বিছানায় এমনভাবে ছড়িয়ে রাখে যে, দেখতে মনে হয়, কম্বলের নীচে একজন মানুষ শুয়ে আছে।

পা টিপে টিপে দরজার নিকটে চলে যায় মেয়েটি। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাঁবু থেকে। অপর ছয়জন ধীরে ধীরে নাক ডাকতে শুরু করে।

প্রহরী জানে, এরা সমুদ্রের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া আশ্রিতা— কোন বিপজ্জনক বন্দী নয়। তাই নিরুদ্বেগ বসে বসে ঝিমুচ্ছে সে।

পা টিপে টিপে টিলা অভিমুখে হাঁটা দেয় মেয়েটি। প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে টিলার কাছে পৌঁছে মোড় নেয় আরেকটি তাঁবুর দিকে। নতুন বন্দী ছয়জন অবস্থান করছে এ তাঁবুতে। অন্ধকার রাত। বেশ কিছু গাছ-গাছালিও আছে এখানে। প্রহরীরা মেয়েটিকে দেখে ফেলার কোন-ই জো নেই এখন।

মেয়েটি বসে পড়ে। পা পা করে এগিয়ে চলে সম্মুখে। বালির টিপির মত কতগুলো কি যেন দেখা যাচ্ছে সামনে। সেগুলোর আড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে তাঁবুর নিকটে চলে আসে মেয়েটি। দরজার সামনে টহল দিচ্ছে একজন প্রহরী।

একটি টিপির আড়ালে শুয়ে পড়ে মেয়েটি। কালো ছায়ার মত তাকে দেখে ফেলে প্রহরী। মেয়েটি এখন দুই প্রহরীর মাঝে। একজন নিজের তাঁবুর প্রহরী। অপরজন অন্য জখমীদের তাঁবুর। তার আশঙ্কা, জখমীদের তাঁবুর প্রহরী এদিকে আসলে নিশ্চিত ধরা খেয়ে যাবে।

ইতিউতি দৃষ্টি ফেলে, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে প্রহরী চলে যায় অন্য জখমীদের তাঁবুর দিকে। এ সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর সন্নিকটে পৌঁছে যায় মেয়েটি। পর্দা তুলে ঢুকে পড়ে ভিতরে।

তাঁবুর ভেতরটা অন্ধকার। ক্ষীণ কণ্ঠে কোঁকাচ্ছে দু' তিনজন জখমী। সম্ভবত তাঁবুর পর্দা ফাঁক হওয়া দেখে ফেলেছে এদের একজন। তাই অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করে— 'কে?'

'কে?' প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটি ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রবিন কোথায়?' জবাব আসে, ঐ ও-দিকে তৃতীয়জন।

গুণে গুণে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে চলে যায় মেয়েটি। পা ধরে নাড়া দেয় তার। আওয়াজ আসে— 'কে?' মেয়েটি জবাব দেয়— 'মুবী'।

ধড়মড় করে উঠে বসে রবিন। হাত বাড়িয়ে বাহুবন্ধনে টেনে নেয় মেয়েটিকে। শুইয়ে দেয় নিজের বিছানায়। নিজের ও তার গায়ে একটি কম্বল ছড়িয়ে দিয়ে বলে— 'প্রহরী এসে পড়তে পারে, আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাক।'

রূপসী কন্যা মুবীর দেহের উষ্ণতা গ্রহণ করে রবিন। মৌনতায় কাটে কিছুক্ষণ। তারপর রবিন বলে, তোমরা-আমার এই মিলনে আমি বিস্মিত। এ এক অলৌকিক ঘটনা। এতে প্রমাণিত হয়, যীশুখৃষ্ট আমাদের সাফল্য মঞ্জুর করেছেন।

ছয় আহত কয়েদীর যাকে সুলতান আইউবী ব্যতিক্রমী এবং উচ্চপদস্ত সেনা বলে অনুমান করেছিলেন, রবিন সেই ব্যক্তি। সুলতান আইউবী বলেও দিয়েছিলেন— 'একে সাধারণ সিপাই বলে মনে হয় না, এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। আলী বিন সুফিয়ান এসে তদন্ত নেবে।'

'তোমার জখম কেমন? হাড়-গোড় ভেঙ্গে যায়নি তো?' জিজ্ঞেস করে মুবী।

'আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। একটি আঁচড়ও নেই দেহের কোথাও। আইউবীর সামনে ভান করেছিলাম মাত্র।' জবাব দেয় রবিন।

'তাহলে এখানে এসেছো কেন?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'মিসর প্রবেশ করে সুদানী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইসলামী ফৌজ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঢুকবার কোন পথ পেলাম না। অবশেষে কৌশলের আশ্রয় নিলাম। এই পাঁচজন জখমীকে খুঁজে জড়ো করে জখমীর ভান ধরে এদের সঙ্গে আমিও ঢুকে পড়লাম। এখন তো পালাবারও কোন পথ পাচ্ছি না।' জবাব দেয় রবিন।

এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রবিন বলে, তুমি আমার দু'টি প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন, আইউবীকে আমি জিন্দা দেখেছি। কারণটা কি? তীর নিঃশেষ হয়ে গেলো, নাকি হারামখোরটা কাপুরুষ হয়ে গেলো? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমরা সাতটি মেয়ের সব ক'জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো কেন? ওরা পাঁচজন কি মরে গেছে, নাকি পালিয়ে গেছে?'

'না, তারা জীবিত আছে। তুমি বলছো, যীশুখৃষ্ট আমাদের বিজয় মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু আমি বলছি, আমাদের খোদা আমাদেরকে কোন একটা পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। আর সালাহুদ্দীন আইউবীও এখনো জীবিত থাকার কারণ, তীরটা তার দু' পায়ের মাঝে বালিতে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো।' বললো মুবী।

'তীর কি কোন মেয়ে ছুঁড়েছিলো? ক্রিস্টোফর ছিলেন কোথায়?' জানতে চায় রবিন।

'না, তীর ছুঁড়েছিলেন ক্রিস্টোফর নিজেই। কিন্তু...'

'কিন্তু ক্রিস্টোফরের তীর ব্যর্থ গেছে, তাই না? যার তীরান্দাজী দেখে শাহ অগাস্টাস অভিভূত হয়েছিলেন, এখানে এসে তার নিশানা এত-ই ব্যর্থ হয়ে গেলো যে, ছয় ফুট দীর্ঘ আর তিন ফুট চওড়া একটা সালাহুদ্দীন তার তীর থেকে বেঁচে গেলো! অভাগার হাতটা ভয়ে কেঁপে উঠেছিলো বোধ হয়।' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো রবিন।

'ব্যবধান ছিল অনেক। তাছাড়া ক্রিস্টোফর বললেন, ধনুক থেকে তীরটি বের হবে হবে অবস্থায় একটি পোকা এসে তার চোখে পড়ে এবং সে অবস্থায়-ই লক্ষ্যহীনভাবে তীরটি বেরিয়ে যায়।'

'তারপর কী হলো?'

'যা হওয়ার ছিলো, তা-ই হলো। সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ছিলো তিনজন কমাণ্ডার এবং চারজন দেহরক্ষী। তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিলো। ক্রিস্টোফর টিলার আড়ালে নিরাপদে ফিরে আসেন। আমরা তীর-ধনুকগুলো বালিতে পুঁতে ফেলে উপরে উট বসিয়ে রাখি। আইউবীর সিপাইরা এসে পড়লে ক্রিস্টোফর জানালেন, তারা পাঁচজন মারাকেশী বণিক আর আমরা ছয়টি মেয়ে সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। মুসলিম সৈন্যরা আমাদের সামান-পত্র অনুসন্ধান করে ব্যবসার পণ্য ছাড়া আর কিছু-ই পেলো না। তারা আমাদের সবাইকে সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট নিয়ে যায়। আমরা ভাবে বুঝালাম যে, আমরা সিসিলি ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানি না। ক্রিস্টোফর আইউবীকে বললেন, তিনি আমাদের ভাষা বুঝেন। আমরা মেয়েরা চেহারায় ভীতি ও শঙ্কার ভাব ফুটিয়ে তুললাম।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে আরো যেসব কথা হলো, রবিনকে সবিস্তার সব শোনালো মুবি। এই সাতটি মেয়ে এবং মারাকেশী বণিকবেশী পাঁচজন পুরুষ আক্রমণের দু'দিন আগে কূলে অবতরণ করেছিলো। বণিকবেশী পুরুষ পাঁচজন ক্রুসেডারদের অভিজ্ঞ গুপ্তচর ও সেনাকমাণ্ডার। মেয়েগুলোও গুপ্তচর। তারা অত্যন্ত রূপসী। গুপ্তচরবৃত্তি ও মনন ধ্বংসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তাদের। গোপনে হত্যাকাণ্ড সংঘটনেও তারা বেশ পারদর্শী। পুরুষ পাঁচজনের মিশন ছিলো সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা আর নাজির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। মিসরের ভাষা অনর্গল বলতে পারতো মেয়েগুলো। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবীর সামনে তা গোপন রাখে তারা। রবিন ছিলো এ মিশনের প্রধান। নাজির সঙ্গে সাক্ষাত করার পরিকল্পনা ছিলো তার। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের সতর্ক কৌশলের সাথে পেরে উঠলো না তারা।

'তোমরা কি সালাহুদ্দীন আইউবীকে ফাঁদে ফেলতে পারো না?' জিজ্ঞেস করে রবিন।

'এখানে সবেমাত্র প্রথম রাত। আমাদের ব্যাপারে তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যদি তা সত্যমনে দিয়ে থাকেন, তাহলে তার অর্থ হলো, তিনি মানুষ নন–পাষাণ। আমাদের কারো প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকতো, তাহলে তিনি রাতে কাউকে

না কাউকে নিজের তাঁবুতে অবশ্যই ডেকে পাঠাতেন। লোকটাকে হত্যা করাও অতটা সহজ নয়। একবার-ই তিনি উপকূলে এসেছিলেন। তীর ছোঁড়া হলো। ব্যর্থ গেলো তীর। সব সময় তিনি সালার ও রক্ষীদের প্রহরা বেষ্টনীতে থাকেন। এদিকে একজন মাত্র প্রহরী আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে আর তার তাঁবুটি ঘিরে রেখে আছে গোটা রক্ষী ইউনিট।'

'ওরা পাঁচজন কোথায়?' জিজ্ঞেস করে রবিন।

'এই তো সামান্য দূরে। আপাতত ওরা সেখানেই থাকবে।' জবাব দেয় মুবী।

শোনো মুবী! এই পরাজয়টা আমাকে পাগল করে তুলেছে। এ ব্যর্থতার সব দায়-দায়িত্ব যেন চাপছে এসে আমার ঘাড়ে। ক্রুশের উপর হাত রেখে শপথ তো আমরা সকলেই নিয়েছি। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের শপথ আর আমার মতো একজন দায়িত্বশীলের শপথে পার্থক্য অনেক। তুমি আমার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করো। আমার কর্তব্যসমূহকে সামনে রেখে বিবেচনা করো। যুদ্ধের অন্তত অর্ধেকটা আমাদের মটির নীচ থেকে আর পিঠের পিছন থেকে আক্রমণ করে জয়লাভ করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আমি, তোমরা সাতজন এবং ওরা পাঁচজন নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। এই ক্রুশ আমার থেকে জবাব চাইছে।'

গলায় ঝুলন্ত ক্রুশটা হাতে নিয়ে রবিন বললো— 'এটিকে আমি আমার বুক থেকে আলাদা করতে পারি না।'

রবিন মুবীর বুকে হাত বুলিয়ে তার ক্রুশটাও হাতে নিয়ে বললো, 'তুমি তোমার পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিতে পারো, কিন্তু এই ক্রুশের মর্যাদা রক্ষায় উদাসীন হতে পারো না। তোমার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তা তোমাকে পালন করতে-ই হবে। খোদা তোমাকে যে রূপ দিয়েছেন, তা-ই তোমাকে পাথর চিড়ে পথ করে দেবে। আমি তোমাকে আবারো বলছি, আমাদের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মিলন প্রমাণ করে, সফল আমরা হব-ই। আমাদের বাহিনী রোম উপসাগরের ওপারে সংগঠিত হচ্ছে। যারা মারা গেছে, তারা তো মারা গেছে। যারা জীবিত আছে, তারা জানে, এটি কোন পরাজয় নয়– ছিল এক প্রতারণা। তুমি তোমার তাঁবুতে ফিরে যাও; সঙ্গী মেয়েদের বলো, তারা যেন তাঁবুতে-ই পড়ে না থাকে। বারংবার যেন সালাহুদ্দীন আইউবী ও তার সালারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মন জয় করার চেষ্টা করে এবং মুসলমান হওয়ার ভান ধরে। তারপর কী করতে হবে, তা তাদের জানা আছে।'

'সর্বাগ্রে আমাদের জানা দরকার, ঘটনাটা ঘটল কী? সুদানীরা কি আমাদেরকে ধোঁকা দিলো?' বললো মুবী।

'তা আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারছি না। হামলার অনেক আগে আমি মিসরে কর্তব্যরত আমার গুপ্তচরদের মাধ্যমে তথ্য পেয়েছিলাম, সুদানী সৈন্যদের উপর সালাহুদ্দীন আইউবীর আস্থা নেই। অথচ তারা মিসরে মুসলমানদের নিজস্ব বাহিনী। আইউবী এসে যখন মিসরী বাহিনী গঠন করলেন, তখন তারা এই বাহিনীতে শামিল হতে অসম্মতি জানায়। তাদের কমাণ্ডার নাজি আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করলো। আমি নিজে তার পত্র দেখেছি এবং সত্যায়ন করেছি যে, হ্যাঁ, এটি নাজির-ই পত্র এবং এতে কোন প্রতারণা নেই। এখন আমার জানতে হবে, এমনটি কেন ঘটলো এবং কে ঘটালো। তথ্য সন্ধান নিয়ে নিশ্চিত না হয়ে আমি ফিরছি না। আমাকে লক্ষ্য করে শাহ আগাস্টাস বড় গর্ব করে বলেছিলেন, আমি মুসলমানদের ঘর থেকে একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে তাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে পারবো। এখন চিন্তা করো মুবী! এ ঘটনায় শাহ অগাস্টাস কত মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন! তিনি কি আমাকে মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা লঘু শাস্তি দিয়ে রক্ষা করবেন? উপরন্তু ক্রুশের অভিশাপ তো আছে-ই।' বললো রবিন।

'আমি সবই জানি রবিন। আবেগ ছেড়ে কাজের কথা বলো। এখন আমার করণীয় কী তা-ই বলো।' বললো মুবী।

শোচনীয় পরাজয়ের কথা স্মরণ করে অবচেতন মনে কথা বলছে রবিন। মুবীর মতো চিত্তাকর্ষক এক রূপসী তরুণী যে তার বুকের সঙ্গে জড়ানো, একটি তন্বী-তরুণীর রেশম-কোমল এলো কেশগুচ্ছে যে তার মুখমণ্ডলের অর্ধেকটা আচ্ছন্ন, সে খবর-ই নেই তার। হঠাৎ মেয়েটার কোমল চুলের পরশ অনুভব করে রবিন বলে ওঠে, মুবী! তোমার এই চুল এমন-ই শক্ত শিকল যে, সালাহুদ্দীন আইউবীকে এ শিকলে একবার বাঁধতে পারলে-ই দেখবে, ব্যাটা তোমার গোলামে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাকে যে কাজটি করতে হবে, তাহলো, ক্রিস্টোফর ও তার সঙ্গীদের বলবে, তারা যেন বণিকের বেশ ধরে নাজির নিকট যায় এবং তথ্য সংগ্রহ করে, তার বাহিনী কেন বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং আমাদের গোপন তথ্য কিভাবে ফাঁস হয়ে গেলো যে, সালাহুদ্দীন গুটিকতক সৈন্য দিয়ে কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে আমাদের তিন তিনটি সেনাবহর ধ্বংস করে দিলো। তাদেরকে এ বিষয়টিও জেনে নিতে বলবে, নাজি তলে তলে সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে মিলে গেলো কিনা। আমাদের এভাবে ধ্বংস করার জন্য-ই প্রতারণামূলক পত্র লিখলো কিনা। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে আমাদের যুদ্ধ-পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে। আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি, ইসলামপন্থীরা সংখ্যায় যত নগণ্য-ই হোক, সম্মুখসমরে সহজে আমরা

তাদেরকে পরাজিত করতে পারবো না। তাই তাদের শাসকমণ্ডলী ও সামরিক অধিনায়কদের ঈমানী চেতনা ধ্বংস করতে হবে আগে। এ লক্ষ্যে আমরা তোমার মতো বেশ কিছু মেয়েকে আরব শাসকদের হেরেমে ঢুকিয়ে রেখেছি।'

'আবারো তুমি কথা লম্বা করছো'- বাধা দিয়ে মুবী বললো- 'আমরা নিজ বাসভবনে এক শয্যায় শুয়ে নেই। আমরা এখন দুশমনের হাতে বন্দী। বাইরে প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাত কেটে যাচ্ছে। হাতে সময় বেশী নেই। মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী হবে, তা-ই বলো। আমরা সাতটি মেয়ে এবং পাঁচজন পুরুষ। বলো কী করবো। এক তো বুঝলাম, নাজির কাছে যেতে হবে, তার প্রতারণার সন্ধান নিতে হবে। তারপর তোমাকে সংবাদ জানাবো কী করে? তোমাকে পাবো কোথায়?

আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবো। তার আগে আমি এই ক্যাম্প, ক্যাম্পের লোকসংখ্যা এবং আইউবীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেবো। এই লোকটি সম্পর্কে আমাদের অনেক সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ক্রুশের জন্য একমাত্র বিপদ এই লোকটি। অন্যথায় ইসলামী খেলাফত আমাদের জালে আটকা পড়ে গেছে। শাহ এমার্ক বলতেন, মুসলমানরা এতো-ই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে যে, এখন চিরদিনের জন্য তাদেরকে আমাদের গোলামে পরিণত করতে প্রয়োজন একটিমাত্র ধাক্কা। কিন্তু তার এই প্রত্যয় আত্মপ্রবঞ্চনা বলে-ই প্রমাণিত হলো। এখানে অবস্থান করে আমাকে আইউবীর দুর্বল শিরাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তোমাদের পুরুষ পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে সুদানী বাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে, তাদের দিয়ে বিদ্রোহ করাতে হবে। তবে মনে রাখবে, সবচে' বেশী প্রয়োজন হলো, আইউবী যেন জীবিত থাকতে না পারে। থাকেও যদি থাকবে আমাদের জিন্দানখানার সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, যেখানে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কখনো সূর্য চোখে দেখবে না, নজরে আসবে না আকাশের একটি তারকাও। তুমি আগে তোমার তাঁবুতে যাও এবং সহকর্মী মেয়েদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও। তাদের বিশেষভাবে জানিয়ে দাও, একটি লোককে তোমাদের এই রেশম-কোমল চুল, মায়াবী চোখ আর হৃদয়কাড়া দেহ দিয়ে এমনভাবে অথর্ব করে দিতে হবে, যেন সে আইউবীর আর কোন কাজে-ই না আসে। সম্ভব হলে তার ও আইউবীর মাঝে এমন ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে, যেন তারা একজন অপরজনের শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। ভাল করে মনে রেখো, লোকটার নাম আলী বিন সুফিয়ান।

দু'জন পুরুষের মধ্যে কিভাবে দুশমনি সৃষ্টি করতে হয়, তা তোমরা ভালো করেই জানো। যাও, সহকর্মী মেয়েদের ভালোভাবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ক্রিস্টোফরের নিকট পৌঁছে যাও। তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, 'তোমার তীর বুঝি আইউবীর উপর এসে-ই ব্যর্থ হলো? এবার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত্ব দাও আর তোমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করো।'

মুবীর চুলে চুমু খেয়ে রবিন বললো— 'ক্রুশের জন্য প্রয়োজনে তোমাদের সম্ভ্রমও বিলিয়ে দিতে হবে। তারপরও যীশুখৃষ্টের দৃষ্টিতে তোমরা মা মরিয়মের মত কুমারী-ই থাকবে। ইসলামকে মূল থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা জেরুজালেম দখল করেছি, এবার মিসর জয় করার পালা।'

রবিনের শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুবী। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে উঁকি দেয় বাইরে। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়লো না তার। মুবী বাইরে বেরিয়ে আসে। তাঁবুর আড়াল থেকে ইতিউতি দৃষ্টিপাত করে দেখে নেয় প্রহরী কোথায়। দূরে কারুর গোঙ্গানীর শব্দ শুনতে পায় সে। হতে পারে সে-ই প্রহরী। মুবী দ্রুত হাঁটা দেয় একদিকে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত হেঁটে পিছনের দিকে সতর্ক কান রেখে পৌঁছে যায় টিলার নিকটে। হাঁটা দেয় নিজের তাঁবুর দিকে।

আধা পথ অতিক্রম করার পর দু'জন মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসে মেয়েটির। মনে হলো, তাঁর-ই তাঁবুর নিকটে কথা বলছে দু'জন মানুষ। মুবীর মনে আশঙ্কা জাগে, প্রহরী হয়ত জেনে ফেলেছে, তাঁবুর একটি মেয়ে উধাও হয়ে গেছে। হয়তো সে কারণেই সে অন্য কোন প্রহরী বা কমাণ্ডারকে ডেকে এনেছে। ভাবনায় পড়ে যায় মুবী। মুহূর্ত মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের তাঁবুতে যাওয়া এ মুহূর্তে নিরাপদ নয়। তার চে' অন্য পাঁচ পুরুষ সঙ্গীর কাছেই চলে যাই।

মুবীর বণিকবেশী পাঁচ মারাকেশী পুরুষ সঙ্গী এখান থেকে দেড় মাইল দূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছে। তাদের কাছেই যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় মেয়েটি। কিন্তু আবার ভাবে, তার পালানোর ফলে অন্য মেয়েদের উপর বিপদ নেমে আসবে। খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। কিন্তু পরক্ষণেই হাঁটা দেয় সামনের দিকে। নিজের তাঁবু অভিমুখে লোক দু'টো কী বলছে শোনার চেষ্টা

করে। মুবী আরবী বুঝে। সালাহুদ্দীন আইউবীর কাছে সে মিথ্যা বলেছিলো, সিসিলি ছাড়া অন্য কোন ভাষা সে বুঝে না।

চুপ মেরে যায় লোক দু'টো। এখন আর কোন কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে না তাদের। পা টিপে টিপে আরো সামনে এগিয়ে যায় মুবী। এবার ডান দিক থেকে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পায়। চকিত নয়নে ফিরে তাকায়। ঘন বৃক্ষরাজির মধ্যে কালো একটি ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে তার। গতি পরিবর্তন করে টিলার দিকে হাঁটা দেয় মেয়েটি।

কোন বিপদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে না মুবী। নিরাপদে টিলার উপরে উঠতে শুরু করে সে। টিলাটি তেমন উঁচু নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে-ই মুবী টিলার উপরে উঠে যায়।

বড় বিচক্ষণ মেয়ে মুবী। কিন্তু যত চতুর-ই হোক মানুষ প্রতি পদে পূর্ণ সাবধানতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। অন্যের চোখ ফাঁকি দিয়ে সবসময় শতভাগ নিরাপদ থাকা অতি বিচক্ষণের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে।

টিলার চূড়ায় উঠে গেলেও বিচক্ষণ মেয়ে মুবী লোকটার চোখে পড়ে যায়। মুবী নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা খোলা চুলগুলো পিঠের উপর সরিয়ে দেয় সে। কিন্তু ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে মেয়েটির উন্নত বক্ষ আর দীর্ঘ কালো ওড়না ধাওয়াকারী লোকটিকে জানিয়ে দেয়, এটি একটি মেয়ে।

লোকটি আইউবীর প্রহরীদের কমাণ্ডার। রাতের বেলা ক্যাম্পে টহল দিতে বেরিয়েছে। মুহূর্তটা প্রহরীদের ইউনিট পরিবর্তনের সময়। সুলতান আইউবী তিনজন অধিনায়কসহ ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। আর সে জন্যে-ই কমাণ্ডার অধিক সতর্কতার সাথে টহল দিয়ে ফিরছে। সুলতান আইউবীর ব্যবস্থাপনা বড় কঠোর। প্রতি মুহূর্তে যে কোন দায়িত্বশীল আশঙ্কাবোধ করে, হয়ত এ মুহূর্তে সুলতান তদারকি করতে বেরিয়ে আসবেন।

কমাণ্ডার বুঝে ফেলে, টিলার উপর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ সন্ধ্যায়-ই উপর থেকে কমাণ্ডারদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, খৃষ্টানরা চরবৃত্তি এবং নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য মেয়েদের ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তাদের নিয়োজিত মেয়েরা হতে পারে মরু যাযাবরের বেশে। ভিক্ষুক বেশে ক্যাম্পে আসতে পারে ভিক্ষা করতে। কেউ আবার নিজেকে বিপন্ন নির্যাতিত বলে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। কমাণ্ডারদের বলা হয়েছে, আজ-ই সাতটি মেয়ে সুলতান আইউবীর আশ্রয়ে এসেছে। মহামান্য সুলতান বাহ্যত তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে– প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে সন্দেহভাজন আখ্যা দিয়ে আশ্রয়ে নিয়ে

নিয়েছেন। এ-সব নির্দেশনা শুনে এই কমাণ্ডার তার এক সঙ্গীকে বলেছিলো, 'আল্লাহ করুন, যেন এমন কোন মেয়ে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বসে!' বলেই দু'জন খিল্‌খিল করে হাসিতে ফেটে পড়েছিলো।

মধ্য রাতে যখন সমগ্র ক্যাম্প গভীর নিদ্রায় অচেতন, ঠিক তখনি টিলার উপর কমাণ্ডারের চোখে পড়লো এক নারীমূর্তি। প্রথমে তার ধারণা হয়, এটি কোন জিন-ভূত হবে হয়তো। কমাণ্ডার নতুন প্রহরীকে তাঁবুর সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলো, ভিতরে সাতটি মেয়ে আছে। পর্দা তুলে তাকালে ঠিক-ই সাতটি শয্যা দেখতে পায় প্রহরী। প্রতিটি মেয়ের মুখমণ্ডল কম্বল দিয়ে মুড়ি দেয়া। প্রচণ্ড শীত পড়ছিলো। সপ্তম কম্বলের তলে আসলে-ই মানুষ আছে কিনা তা আর যাচাই করে দেখেনি কমাণ্ডার। সপ্তম শয্যার মেয়েটি-ই যে টিলার উপর তার সামনে দণ্ডায়মান, তা তার অজানা।

কমাণ্ডার কিছু সময় চিন্তা করে। নিজেই মেয়েটির কাছে যাবে, নাকি তাকে নীচে নেমে আসার জন্য আদেশ করবে, কিংবা জিন-ভূত হলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করবে, ভেবে নেয় সে।

ভাবনার মধ্যে কেটে যায় কিছু সময়। কিন্তু এতক্ষণেও অদৃশ্য হয়নি মেয়েটি। বরং দু'-তিন পা এগিয়ে গেছে আরো সামনে। আবার ফিরে আসে পিছনে। থেমে যায় এবার। কমাণ্ডার– যার নাম ফখরুল মিসরী– ধীরে ধীরে পৌঁছে যায় টিলার নিকটে। উপর দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে— 'কে তুমি? নীচে নেমে আসো।'

আহত হরিণীর মত লাফিয়ে ওঠে মেয়েটি। দৌড়ে চলে যায় টিলার অপর প্রান্তে। ফখরুল মিসরী এবার নিশ্চিত হয় এটি মানুষ-ই বটে।

কমাণ্ডার সুঠামদেহী এক সুপুরুষ। টিলাও তেমন উঁচু নয়। দীর্ঘ কয়েকটি পদক্ষেপে-ই উপরে উঠে যায় সে। চারদিক অন্ধকার। রাতের আঁধারে মেয়েটির পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় লোকটি। পিছু নেয় মেয়েটির।

টিলার অপর প্রান্ত দিয়ে নীচে নেমে তীব্রগতিতে দৌড়াতে শুরু করে মেয়েটি। কমাণ্ডারও নীচে নেমে ধাওয়া করতে শুরু করে তাকে। দু' জনের মাঝে ব্যবধান অনেক। কিন্তু ফখরুল মিসরী পুরুষ, তদুপরি সৈনিক। সিংহের মত দৌড়াচ্ছে সে। টিলার পিছনে উচু-নীচু, শুষ্ক ঝোপঝাড় এবং মাঝে-মধ্যে দু' চারটি বৃক্ষ। দীর্ঘক্ষণ দৌড়িয়ে এবার ফখরুল অনুভব করলো, সামনে কেউ নেই। দাঁড়িয়ে যায় সে। অনিমেষ চোখে তাকায় ডানে-বাঁয়ে ও সামনে-পিছনে। খানিক পর পিছনে বেশ বাঁয়ে মেয়েটির পায়ের আওয়াজ ভেসে আসে তার কানে।

প্রশিক্ষিত মেয়ে। রূপ-যৌবন ব্যবহারের পাশাপাশি সামরিক ট্রেনিংও পেয়েছে সে। খঞ্জর চালনার কৌশলও তার রপ্ত। দৌড়ে পালিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো সে। ফখরুল মিসরী তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেছে। এবার অন্য দিকে মোড় নিয়েছে মেয়েটি।

কানামাছি খেলছে যেন দু'জন। কমাণ্ডারের যত সমস্যা অন্ধকারের কারণে। মেয়েটির পায়ের আওয়াজ-ই তার ধাওয়া করার একমাত্র অবলম্বন। চোখে দেখছে না কিছু-ই। মুবীর পা থেমে গেলে থেমে যায় ফখরুল মিসরীও। চলতে শুরু করলে সক্রিয় হয়ে উঠে ফখরুল মিসরী।

ফখরুল মিসরীর বুঝতে বাকী নেই, মেয়েটি তাগড়া যুবতী। বয়সী হলে এত দ্রুত এবং এত বেশী দৌড়াতে পারতো না।

মুবীর পুরুষ সঙ্গীদের ছাউনি সামান্য সামনে। ফখরুল মিসরীকে ফাঁকি দিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে দৌড়ে ছাউনিতে পৌঁছে যায় মেয়েটি। হাঁক দেয় সঙ্গীদের। নারী কণ্ঠের আর্ত-চীৎকার শুনে সন্ত্রস্থ হয়ে জেগে উঠে তারা। বেরিয়ে আসে তাঁবুর বাইরে। আলো জ্বালায়। তরবারী কোষমুক্ত করে নেয় ফখরুল মিসরী। হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে যায় তাদের সম্মুখে। কমাণ্ডার দেখতে পায়, পাঁচজন মানুষ। পোশাকে প্রবাসী বণিক বলে মনে হলো তাদের। সম্ভবত মুসলমান। মেয়েটি তাদের একজনের দু'পা দু'বাহু দ্বারা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মশালের কম্পমান আলোতে তার মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বুকটা উঠানামা করছে তার। প্রচণ্ড শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটি।

'এই মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দাও।' নির্দেশের সুরে বললো ফখরুল মিসরী।

'একটি কেন, আমরা সাত সাতটি মেয়ে আপনার সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছি। মন চাইলে আপনি একে নিয়ে যেতে পারেন।' বিনয়ের সুরে জবাব দেয় একজন।

'না, না, আমি এর সঙ্গে যাবো না! এরা খৃষ্টানদের চেয়েও জংলী। এদের সুলতান মানুষ নয়– আস্ত একটা ষাড়, হিংস্র পশু। বেটা আমার হাড়-গোড় সব ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি তার কবল থেকে পালিয়ে এসেছি।' লোকটার পদযুগল আরো শক্ত করে ধরে কান্নাজড়িত ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো মুবী।

'কোন্ সুলতান?' বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করে ফখরুল মিসরী।

'আর কে? তোমরা যাকে সালাহুদ্দীন আইউবী বলো, সেই সুলতান। জবাব দেয় মুবী। মুবী এবার কথা বলছে আরবীতে।

'মেয়েটি মিথ্যে বলছে।' বলেই ফখরুল জানতে চায়, এ কে? তোমাদের আত্মীয় কি?

'ভিতরে আসো দোস্ত! বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে। তরবারী কোষবদ্ধ করে নাও। আমরা ব্যবসায়ী। ভয়ের কোন কারণ নেই। মেয়েটির কাহিনী শোন।' ফখরুল মিসরীকে উদ্দেশ করে বললো একজন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটি বললো, 'তোমার সুলতানকে আমি মর্দে মুমিন মনে করতাম। কিন্তু একটি রূপসী মেয়েকে হাতে পেয়ে তিনি ঈমানের কথা ভুলে গেলেন! অবশিষ্ট ছয়টি মেয়েরও তিনি একই দশা ঘটিয়ে থাকবেন অবশ্যই।'

'অন্য মেয়েদের এই দশা ঘটিয়েছে সালাররা। সন্ধ্যায় তাদেরকে ওরা নিজ তাঁবুতে ডেকে নিয়ে যায় এবং হায়েনার মত উপভোগ করে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তাঁবুতে এখন তারা অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে।' বললো মুবী।

ভাবান্তর ঘটে যায় ফখরুল মিসরীর। ধীরে ধীরে তরবারীটা কোষবদ্ধ করে তাদের সঙ্গে তাঁবুতে ঢুকে পড়ে সে। বসে পড়ে পাতানো শয্যার এক কোণে। চুলোয় আগুন ধরিয়ে হাড়িতে করে পানি চড়ায় একজন। কফি তৈরি করার নামে কি যেন ঢালে পানিতে। ফখরুল মিসরীর পদমর্যাদা কি জানতে চায় আরেকজন। ফখরুল মিসরী জানায়, আমি পদস্থ একজন কর্মকর্তা- কমাণ্ডার। নানা রকম কথা বলে বণিকরাও আন্দাজ করে নেয়, লোকটি সাধারণ নয়- আসলেই পদস্থ কেউ হবেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দুঃসাহসীও বটে।

বণিকদের একজন- যার নাম ক্রিস্টোফর- কমাণ্ডারকে মেয়েগুলো সম্পর্কে হুবহু সেই কাহিনী শোনায়, যা শুনিয়েছিলো সুলতান আইউবীকে।

মেয়েগুলো সুলতানকে প্রস্তাব করেছিলো, আমরা যেহেতু বাবা-মার নিকটও ফিরে যেতে পারবো না, খৃষ্টানদের কাছেও নয়, তাই আমরা মুসলমান হয়ে যাই। পদস্থ সাতজন সৈনিকের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন। ক্রিস্টোফর বললো, আমরা শুনেছিলাম, নৈতিকতার প্রশ্নে সুলতান আইউবী আপোষহীন, চরিত্র তাঁর পাথরের মতো অটল। ব্যবসার ধান্ধায় আমরা সব সময়-ই সফরে সফরে থাকি। বিপন্ন নিরাশ্রয় এই মেয়েগুলোকে কিভাবে আমরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি। তাই নিরাপত্তার জন্য মেয়েগুলোকে সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সুলতান মেয়েগুলোর সঙ্গে কী আচরণ করলেন, তা তো এই মেয়েটির জবানীতে নিজ কানেই শুনলেন!

মেয়েটির প্রতি তাকায় ফখরুল মিসরী। সুযোগ বুঝে মেয়েটি বলে, খোদা আমাদেরকে একজন ফেরেশতার আশ্রয়ে তুলে দিয়েছেন ভেবে আমরা মনে মনে বেশ খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু সূর্যাস্তের পর সুলতানের এক রক্ষী এসে আমাকে বললো, সুলতান তোমায় ডাকছেন। অন্য ছয় মেয়ের তুলনায় আমি একটু বেশী সুন্দরী। আমি কল্পনাও করিনি, তোমাদের আইউবী আমায় অসৎ উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি সরল মনে চলে গেলাম। সুলতান মদের পিপার মুখ খুললেন। ঢেলে এক গ্লাস রাখলেন নিজের সামনে আর এক গ্লাস ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। আমি খৃষ্টান, মদ পান করেছি শতবার। জাহাজে খৃষ্টান কমাণ্ডাররা আমার দেহটাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছিলো। সালাহুদ্দীন আইউবীও একই মতলব আঁটলেন। মদ ও পুরুষ আমার জন্য নতুন কিছু নয়। কিন্তু সুলতান আইউবীকে আমি ফেরেশতা মনে করতাম। তার পবিত্র দেহটাকে আমি আমার নাপাক শরীর থেকে দূরে রাখতে চাইছিলাম। কিন্তু খৃষ্টান নরপশু কমাণ্ডারদের চেয়ে তিনি অধিক ঘৃণ্য বলে প্রমাণিত হলেন। তোমাদের সুলতান আমার শরীরের হাড়-গোড় সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন।

সমুদ্রের মহাবিপদ থেকে খোদা আমাদেরকে উদ্ধার করলেন এবং ছুঁড়ে মারলেন এমন এক ব্যক্তির আশ্রয়ে, যে ফেরেশতারূপী সাক্ষাৎ হায়েনা। সুলতান-ই আমাকে বলেছিলেন, আমার সঙ্গের অন্য মেয়েরা তার সালারদের তাঁবুতে রয়েছে। আমি সুলতানের পা ধরে মিনতি করেছিলাম, আপনি আমায় বিয়ে করে নিন। তিনি বললেন, তোমার যদি আমাকে পছন্দ-ই হয়ে থাকে, তো বিয়ে ছাড়া-ই আমি তোমায় আমার হেরেমে স্থান দেবো। তিনি আমার সঙ্গে হায়েনার মত আচরণ করেছেন। ছিলেন মদে মাতাল। এক পর্যায়ে দু' বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে আমাকে তিনি তার পার্শ্বে শুইয়ে দেন ........। এক সময়ে যখন তার দু' চোখের পাতা এক হলো, আমি উঠে সেখানে থেকে পালিয়ে এলাম। আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হলে তার রক্ষীদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

এই ফাঁকে ফখরুল মিসরীকে কফি পান করায় একজন। খানিক পর মেজাজে পরিবর্তন আসতে শুরু করে তার। ঘৃণাভরা কণ্ঠে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং বলে— 'আমাদেরকে আদেশ দেন মদ-নারী থেকে দূরে থাকো আর নিজে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে নারী নিয়ে রাত কাটান, না?'

ফখরুল মিসরী অনুভব-ই করতে পারেনি, মেয়েটি তাকে যে কাহিনী শুনিয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নিরেট মিথ্যা। মেজাজ তার কেন পাল্টে গেলো, তাও বুঝতে পারেনি সে।

কফি নয়– ফখরুল মিসরীকে খাওয়ানো হয়েছে হাশীশ। হাশীশের নেশায় পড়ে এমন আবোল-তাবোল বকছে সে। কিন্তু এ-যে নেশা, তাও বুঝে আসেনি তার। নিজের কল্পনায় এখন সে রাজা। মশালের কম্পমান আলো নাচছে মেয়েটির মুখে। চিক্ চিক্ করছে তার বিক্ষিপ্ত কালোপনা ভ্রুর পশমগুলো। পূর্বাপেক্ষা অধিক রূপসী বলে মনে হলো তাকে ফখরুল মিসরীর কাছে। মেয়েটিকে পাওয়ার নেশায় ব্যাকুল হয়ে উঠে তার হৃদয়। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠে— 'তুমি চাইলে আমি তোমাকে আমার আশ্রয়ে নিয়ে নিতে পারি।'

'না, তুমিও আমার সঙ্গে সুলতানের ন্যায় একই আচরণ করবে। আমাকে তুমি তোমার তাঁবুতে নিয়ে যাবে আর আমি পুনরায় তোমাদের সুলতানের কব্জায় চলে যাবো।' হঠাৎ ভয় পাওয়া মানুষের ন্যায় আঁৎকে উঠে দু' পা পিছনে সরে গিয়ে বললো মেয়েটি।

'আমরা এখন অপর ছয়টি মেয়েকে কিভাবে উদ্ধার করে আনা যায় ভাবছি। আমরা তাদের ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু ভুল করে ফেললাম।' বললো ব্যবসায়ীদের একজন।

ফখরুল মিসরীর দৃষ্টি মেয়েটির উপর নিবদ্ধ। এতো সুন্দরী মেয়ে জীবনে আর দেখেনি সে কখনো। কারো মুখে রা নেই। অখণ্ড এক নীরবতা বিরাজ করছে তাঁবুতে। সেই নীরবতা ভাঙ্গে ক্রিস্টোফর। বললো— 'তুমি কি আরব থেকে এসেছো, নাকি মিসরী?'

'আমি মিসরী। দু' দু'টো যুদ্ধে লড়েছি। দক্ষতার বলে এ পদ পেয়েছি।' বললো ফখরুল মিসরী।

'নাজি যে সুদানী যে বাহিনীটির সালার, এখন সেটি কোথায়?' জিজ্ঞেস করে ক্রিস্টোফর।

'সেই বাহিনীর একজন সৈনিকও আমাদের সঙ্গে নেই।' জবাব দেয় মিসরী।

'বলতে পারো, এমনটি কেন হয়েছে? সুদানীরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর নেতৃত্ব ও কমাণ্ড মেনে নেয়নি। বাহিনীটি নিজেকে স্বাধীন মনে করতো। নাজি সুলতানকে বলে দিয়েছিলো, সে মিসর ছেড়ে চলে যাবে। কারণ, সে বিদেশী মানুষ। এ কারণে আইউবী মিসরীদের একটি বাহিনী গঠন করেন এবং যুদ্ধ করাবার জন্য এখানে নিয়ে আসেন। তোমাদের সুলতান তোমাদেরকে আত্মমর্যাদা ও সৎকর্মের উপদেশ দেয় আর নিজে আয়েশ করে চলে। তা যুদ্ধ করে গনীমত কিছু পেয়েছো কি?.....। দু' এক চাকা সোনা-রূপা পেয়েছো হয়তো! খৃষ্টানদের জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা-চাঁদী সুলতানের হাতে এসেছে। রাতের আঁধারে হাজার হাজার উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে সেসব

পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কায়রো। সেখান থেকে পাচার হবে দামেস্ক ও বাগদাদ। সুদানী বাহিনীটিকে নিরস্ত্র করে সুলতান তাদের গোলামে পরিণত করতে চায়। তারপর ফৌজ আসবে আরব থেকে। তখন তোমরা মিসরীরাও গোলাম হয়ে যাবে তাদের।' বললো ক্রিস্টোফর।

ক্রিস্টোফরের প্রতিটি কথা হৃদয়ে বসে যাচ্ছে ফখরুল মিসরীর। ক্রিয়াটা মূলত কথার নয়- ক্রিয়া মুবীর রূপ আর হাশীশের। ক্রিস্টোফর এই কৌশল রপ্ত করেছে হাসান ইবনে সাব্বাহ'র হাশীশীদের নিকট থেকে। মুবী কল্পনাও করেনি, একজন মিসরী কমাণ্ডার তাকে ধাওয়া করে অবশেষে তারই মুঠোয় এসে ধরা দেবে। মেয়েটি জেনে ফেলেছে, মিসরী কমাণ্ডার আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না।

এবার মুবী আরো তথ্য দিতে শুরু করে সঙ্গীদের। বলে, রবিন জখমের ভান করে সুলতান আইউবীর জখমীদের তাঁবুতে পড়ে আছেন। তিনি বলেছেন, নাজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে হবে, তিনি বিদ্রোহ কেন করলেন না কিংবা পিছন থেকে কেন তিনি সালাহুদ্দীন আইউবীর উপর আক্রমণ করলেন না। তাছাড়া নাজি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করলেন কিনা, রবিন তারও খোঁজ নিতে বলেছেন।

মুবীকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে দেখে ফখরুল মিসরী জিজ্ঞেস করে— 'ও কী বলছে?'

একজন জবাব দেয়— 'ও বলছে, যদি এ লোকটি, অর্থাৎ তুমি যদি সালাহুদ্দীন আইউবীর সৈনিক না হতে, তাহলে ও তোমাকে বিয়ে করে নিতো। প্রয়োজনে ও মুসলমান হয়ে যেতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু ও বলছে, এখন আর কোন মুসলমানের উপর তার আস্থা নেই।'

জবাব শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠে ফখরুল মিসরী। খপ্ করে মেয়েটির দু' বাহু ধরে ফেলে নিজের কাছে টেনে আনে। আপ্লুত কণ্ঠে বলে— 'খোদার কসম! আমি যদি রাজা হতাম, তবুও তোমার খাতিরে আমি সিংহাসন ত্যাগ করতাম। শর্ত যদি এ-ই হয় যে, আমি সালাহুদ্দীন আইউবীর তরবারী ফেলে দেবো, তাহলে এই নাও আইউবীর তরবারী।' নিজের কটিবন্ধ থেকে তরবারীটা বের করে কোষসহ মেয়েটির পায়ের উপর রেখে দেয় ফখরুল মিসরী। বলে— 'এ মুহূর্ত থেকে আমি আইউবীর সৈনিক নই, কমাণ্ডার নই।'

'আরো একটি শর্ত আছে। তোমার খাতিরে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করবো ঠিক; কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী থেকে প্রতিশোধ আমি নেবো-ই।' বললো মেয়েটি।

'তার মানে তুমি কি তাকে আমাকে দিয়ে হত্যা করাতে চাও?' জিজ্ঞেস করে ফখরুল।

মুবী তার সঙ্গীদের প্রতি তাকায়। পরস্পর চোখাচোখী করে সকলে। জবাবটা কী দেবে স্থির করে নেয় ক্রিস্টোফর। অবশেষে বলে— 'এক সালাহুদ্দীন বিদায় নিলে তাতে তেমন কি আর লাভ হবে। আসবে আরেক সুলতান। সেও হবে তার-ই মতো। গোলাম হয়ে-ই থাকতে হবে মিসরীদের। কাজেই ও-সবের প্রয়োজন নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো; সুদানীদের সালার নাজির কাছে যাও এবং এই মেয়েটিকে তার সামনে উপস্থিত রেখে তাকে জানাও, সালাহুদ্দীন আইউবী আসলে কেমন মানুষ আর লক্ষ্য-ই বা তার কী?

বণিকবেশী খৃষ্টান কুচক্রীদের জানা ছিলো, খৃষ্টানদের সঙ্গে নাজির যোগসাজশ আছে এবং মুবী অকপটে তার সঙ্গে মিশন নিয়ে কথা বলতে পারবে। কিন্তু সুলতান আইউবী যে বিশ্বাসঘাতক নাজি ও তার সালারদের কৌশলে সংগোপনে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছেন, তা তাদের অজানা। তথ্য নেয়ার জন্য নাজির কাছে যাওয়ার কথা ছিলো মেয়েটির। কিন্তু তার একা যাওয়া সম্ভব ছিলো না। ঘটনাক্রমে ফখরুল মিসরীকে পেয়ে গেছে সে। তাকেই কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়।

মুবীকে নিয়ে রওনা হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয় ফখরুল মিসরীকে। একটি উট দেয়া হয় তাকে। পানির মশক এবং খাবারভর্তি একটি থলে বেঁধে দেয়া হয় উটের সঙ্গে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কিছু জিনিস আছে, তাতে হাশীশ মেশানো। বিষয়টা জানা ছিলো মুবীর।

একটি লম্বা চোগা এবং ব্যবসায়ীর পোশাক পরিয়ে দেয়া হয় ফখরুল মিসরীকে। উটের পিঠে সম্মুখভাবে চড়ে বসে মেয়েটি। ফখরুল বসে পিছনে। চলতে শুরু করে উট।

আশ-পাশের কোন খবর নেই ফখরুল মিসরীর। এমনকি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সম্পূর্ণ উদাসীন সে। এ মুহূর্তে লোকটা জানে শুধু একটা-ই— পৃথিবীর একটি সেরা সুন্দরী যুবতী তার মুঠোয়, সুলতান আইউবীকে উপেক্ষা করে যে তাকে বরণ করে নিয়েছে! মুবীকে দু' বাহুতে জড়িয়ে ধরে পিঠটা তার নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বসেছে ফখরুল মিসরী।

মুবী বললো— 'তুমিও আবার খৃষ্টান কমাণ্ডার আর তোমার সুলতানের মতো হায়েনার পরিচয় দেবে না তো? আমি এখন তোমার মালিকানাধীন, তোমার

হাতের মুঠোয়। যা মন চায় করার সুযোগ তোমার আছে। তবুও আমি তোমায় ঘৃণার চোখে দেখবো।'

'তুমি যদি বলো, আমি এখনি উটের পিঠ থেকে নেমে যাবো। আমাকে তুমি শুধু এতটুকু বলো, তুমি মনে-প্রাণে আমাকে কামনা করছো, না-কি নিছক বিপদে পড়ে আমার আশ্রয়ে এসেছো?' বাহুবন্ধন থেকে মুবীকে ছেড়ে দিয়ে বললো ফখরুল মিসরী।

'না, তা নয়। আশ্রয় তো আমি ঐ ব্যবসায়ীদেরও নিতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে আমার মনে ধরেছে বলে-ই নিজের ধর্মটা পর্যন্ত ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' জবাব দেয় মুবী। আবেগময় কথা বলে মুবী ফখরুল মিসরীকে মাতিয়ে রাখে এবং কথায় কথায় রাত কাটিয়ে দেয়।

সফরটা ছিলো অন্তত পাঁচ দিনের। কিন্তু ফখরুল মিসরী পথ চলছে সাধারণ রাস্তা ছেড়ে অন্য পথে। কারণ, লোকটা দলছুট সৈনিক। ঘুম চাপতে শুরু করে মুবীর। তাই পিছনে হেলান দিয়ে মাথাটা ফখরুল মিসরীর বুকে এলিয়ে দিয়ে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায় সে। চলতে থাকে উট। জেগে আছে ফখরুল মিসরী।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সবেমাত্র ফজর নামায সমাপ্ত করেছেন। জায়নামাজ ছেড়ে এখনো ওঠেননি। কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান সংবাদ জানায়, আলী বিন সুফিয়ান এসেছেন। সুলতান দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সুলতানকে সালাম দেন আলী বিন সুফিয়ান। কিন্তু সালামের জবাব দেয়ার আগেই সুলতানের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে— 'ওদিকের খবর কী?'

'এখনো ভালো। তবে সুদানী সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাদের মধ্যে আমি যে গুপ্তচর রেখে এসেছিলাম, তার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাদের কোন একজন কমাণ্ডারও যদি নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়, তাহলে বিদ্রোহ ঘটে যাবে।' জবাব দেন আলী বিন সুফিয়ান।

আলী বিন সুফিয়ানকে নিয়ে তাঁবুর ভিতরে চলে যান সালাহুদ্দীন আইউবী। আলী বললেন— 'নাজি ও তার অনুগত সালারদের আমরা খতম করেছি ঠিক; কিন্তু তারা সুদানীদের মধ্যে মিসরী ফৌজের বিরুদ্ধে ঘৃণার যে বিষ ছড়িয়ে গেছে, তার ক্রিয়া এতটুকুও কমেনি। তাদের অস্থিরতার আরেক কারণ তাদের অধিনায়কদের গুম হওয়া। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আমি এ সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছি যে, তাদের অধিনায়করা রোম উপসাগরের রণাঙ্গনে গেছে। কিন্তু আমীরে মোহতারাম! আমার ধারণা, সুদানীদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ ঢুকে পড়েছে। তাদের বিশ্বাস, তাদের সালারদের বন্দী করে খুন করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, বিদ্রোহের ঘটনা যদি ঘটেই যায়, তাহলে মিসরে আমাদের যে সৈন্য আছে, তারা কী তা দমন করতে পারবে? তারা অভিজ্ঞ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারবে কি? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে.......!' জিজ্ঞেস করেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আমার মনে হয়, আমাদের এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য তাদের মোকাবেলা করতে পারবে না। তবে আয়োজন একটা আমি করে এসেছি। আমি মহামান্য নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট দ্রুতগামী দু'জন দূত প্রেরণ করেছি। তাঁর সমীপে পয়গাম পাঠিয়েছি, মিসরে বিদ্রোহের ডামাডোল শুরু হতে চলেছে। আমরা এ যাবত যে বাহিনী প্রস্তুত করেছি, প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া তাদের অর্ধেক-ই অবস্থান করছে রণাঙ্গনে। সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমন করার জন্য আপনি শীঘ্র বাহিনী প্রেরণ করুন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'ওদিক থেকে সহযোগিতার আশা খুব কম। গত পরশু এক দূত সংবাদ নিয়ে এসেছিলো, নূরুদ্দীন জঙ্গী রাজা ফ্রাংকের উপর আক্রমণ করেছেন। এ আক্রমণ তিনি আমাদের সহযোগিতার জন্য করেছেন। সে সময়ে ফ্রাংকের কর্মকর্তা ও অধিনায়কগণ ছিলো রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর নৌ-বহরে। ফ্রাংকের কিছুসংখ্যক সৈন্য মিসরে প্রবেশ করে হামলা করতে চেয়েছিলো এবং আমাদের সুদানী বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য মিসরের সীমান্তে এসে উপনীত হয়েছিলো। সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী সেই বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের সব পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন এবং রাজা ফ্রাংকের বিস্তর এলাকায় নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করেছেন। ক্রুসেডারদের থেকে জরিমানা বাবদ কিছু অর্থও আদায় করেছেন।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

তাঁবুর ভিতরে পায়চারী করতে শুরু করেন সুলতান আইউবী। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন— 'সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী থেকে আমি ওখানকার এমন পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেছি, যা আমাকে অস্থির করে রেখেছে।'

'খৃষ্টানরা কি ওখানে পাল্টা আক্রমণ করবে বলে মনে করেন?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার খৃষ্টানদের আক্রমণের পরোয়া বিন্দুমাত্র নেই। অস্থিরতা আমার এই জন্য যে, কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব যাদের, তারা মদের মটকায় ডুবে আছে। ইসলামের দুর্গের প্রহরীরা বন্দী হয়ে আছে হেরেমে। নারীর চুল বেঁধে ফেলেছে তাদের পা। চাচা আসাদুদ্দীন শেরেকোহ'কে ইসলামের ইতিহাস

কখনো ভুলতে পারবে না। হায়! এ সময়ে যদি তিনি জিন্দা থাকতেন! যুদ্ধের ময়দানে তিনি-ই আমাকে টেনে এনেছিলেন। আমি বড় কঠিন কঠিন মুহূর্ত দেখেছি। চাচা শেরেকোহ'র বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটের আমি কমাণ্ড করেছি। তার সঙ্গে খৃষ্টানদের অবরোধে আমি তিন মাস কাটিয়েছি। চাচা সব সময় আমাকে সবক দিতেন, বেটা! কখনো ভীত হয়ো না, ভয়-ভীতি থেকে নিজেকে সদা মুক্ত রাখবে। মহান আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা রাখবে। ইসলামের পতাকা উচ্চে ধরে রাখবে সব সময়। আমি শেরেকোহ'র কমাণ্ডে মিসরী এবং খৃষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। ইস্কান্দারিয়ায় অবরোধে কাটিয়েছি দীর্ঘদিন। আমার মাথার উপর পরাজয় এসে গিয়েছিলো। আমার মুষ্টিমেয় সৈন্যের মনোবল ভেঙ্গে যেতে শুরু করেছিলো। কিন্তু তারপরও বিজয় আমার পদচুম্বন করেছে। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিলো, কী করে আমি আমার সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা রেখেছিলাম, আল্লাহ-ই তা ভালো জানেন। চাচা শেরেকোহ আক্রমণ করে সেই অবরোধ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। সেই কাহিনী তো তুমি ভালো করেই জান আলী! ঈমান-বিক্রেতারা কাফিরদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ ঝড় সৃষ্টি করেছিলো, তা-ও তোমার অজানা নয়। কিন্তু এমন কঠিন মুহূর্তেও আমি সাহস হারাইনি, ভয় পাইনি।'

'আমার সবকিছু মনে আছে সুলতান! এত যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হত্যা-লুণ্ঠনের পর আশা করেছিলাম, এবার মিসরীরা সোজা পথে ফিরে আসবে। কিন্তু এক গাদ্দার মরে তো আরেক গাদ্দার এসে তার স্থান দখল করে। আমি বিশেষভাবে যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছি, তা হলো, মিসরে এ যাবত যে ক'জন গাদ্দার আত্মপ্রকাশ করেছে, তারা সবাই দুর্বল খেলাফতের সৃষ্টি। ফাতেমী খেলাফত যদি হেরেমে ঢুকে না পড়তো, সুন্দরী নারীর আঁচলে বাঁধা না পড়তো, তাহলে আপনি আজ খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করতেন ইউরোপে, তাদেরই ভূখণ্ডে। কিন্তু আমাদের গাদ্দার বন্ধুরা এই ক্রুশ বনাম চাঁদ-তারার লড়াইকে মিসরের সীমানা অতিক্রম করতে দিচ্ছে না। রাজা যখন ভোগ-বিলাসে ডুবে যান, তখন প্রজাদের মধ্যে কিছু লোক রাজত্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। শক্তি ও সাহায্য লাভ করে তারা কাফিরদের থেকে। ঈমান বেচা-কেনায় এত অন্ধ হয়ে পড়ে যে, তারা কাফিরদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং আপন কন্যাদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করে না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি সব সময় এদেরকে-ই ভয় পাই। আল্লাহ না করুন, ইসলামের নাম যদি কখনো ডুবে যায়, ডুববে মুসলমানদের-ই হাতে। আমাদের ইতিহাস গাদ্দারদের ইতিহাসে পরিণত হতে যাচ্ছে। আমার মন বলছে, একদিন

মুসলমানরা নিজেদের ভিটেমাটি কাফিরদের হাতে-তুলে দেবে। মুসলমান যদি কোথাও বেঁচে থাকে, সেখানে মসজিদ থাকবে কম, গান-বাজনা ও বেশ্যালয় থাকবে বেশী। আমাদের মুসলিম পুরুষরা বুকে ক্রুশ ঝুলিয়ে গর্ববোধ করবে আর মেয়েরা আধুনিকতা-স্বাধীনতার নামে বেহায়ার মত রাস্তায় চলাচল করবে। আমি মুসলিম মিল্লাতের পতনের ঘনঘটা শুনতে পাচ্ছি আলী! তবে হাল ছাড়া যাবে না। তুমি তোমার বিভাগকে আরো সুসংহত, শক্তিশালী করো। দুশমনের এলাকায় গিয়ে কমাণ্ডো আক্রমণ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য শক্ত-সামর্থ ও বিচক্ষণ যুবকদের খুঁজে বের করো। খৃষ্টানরা দিন দিন শক্তিশালী ও সক্রিয় হচ্ছে। তোমাকে এক্ষুণি যে কাজটি করতে হবে, তা হলো, সমুদ্র থেকে যেসব খৃষ্টান সেনা জীবনে রক্ষা পেয়েছে, তাদের অধিকাংশ আহত। যারা আহত নয়, তারাও দিনের পর দিন সমুদ্রে সাঁতার কাটার ফলে আহতদের অপেক্ষাও বেশী বিপর্যস্ত। তাদের সকলের চিকিৎসা চলছে। আমি তাদের সকলকে দেখেছি। তুমি তাদের এক নজর দেখে নাও এবং জরুরী তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

দারোয়ানকে ডেকে নাস্তা আনতে বললেন সুলতান আইউবী। তারপর আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলতে শুরু করলেন— 'গতকাল কয়েকজন আহত পুরুষ ও কয়েকটি মেয়েকে আমার সামনে হাজির করা হয়েছিলো। ছয়জন সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাওয়া কয়েদী। তাদের একজনের প্রতি আমাদের সন্দেহ হয়, লোকটা সাধারণ সেপাই নয়। পদস্থ কোন অফিসার বোধ হয়। তুমি সর্বাগ্রে তার সাথে কথা বলো। আর পাঁচজন ব্যবসায়ী সাতটি খৃষ্টান মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো।'

ব্যবসায়ীরা সুলতান আইউবীকে যা বলেছিলো, তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে তা শোনান। তিনি বললেন, আমি মেয়েগুলোকে মূলত বন্দী করেছি, যদিও তাদেরকে আশ্রয় দেয়ার কথা বলেছি। এই যে মেয়েগুলো বললো, তারা গরীব পরিবারের সন্তান, জ্বলন্ত জাহাজ থেকে নামিয়ে একটি নৌকায় বসিয়ে তাদের ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং নৌকা তাদেরকে কূলে এনে ফেলেছে, এসব বক্তব্য আমাকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। আমি তাদেরকে একটি পৃথক তাঁবুতে রেখেছি এবং প্রহরার জন্য একজন সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে রেখেছি। নাস্তাটা খেয়ে-ই তুমি ঐ কয়েদি আর মেয়েগুলোর কাছে চলে যাও।'

অবশেষে সুলতান আইউবী মুখে মুচকি হাসি টেনে বললেন— 'গতকাল দিনের বেলা আমি উপকূলে টহল দিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার প্রতি কোন্ দিক থেকে

যেন একটা তীর ছুটে আসে। তীরটি আমার দু' পায়ের মাঝে বালিতে এসে বিদ্ধ হয়।'

সালাহুদ্দীন আইউবী তীরটি আলী বিন সুফিয়ানকে দেখিয়ে বললেন, এলাকাটা ছিলো পর্বতময়। রক্ষীরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোন তীরান্দাজের দেখা পায়নি। পাওয়া গেছে এই পাঁচজন ব্যবসায়ী। রক্ষীরা তাদেরকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। এই সাতটি মেয়েকে তারা আমার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে।'

'কী বললেন, তারা চলে গেছে! আপনি তাদের যেতে দিলেন!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'রক্ষীরা তাদের তল্লাশী নিয়েছিলো, তাদের কাছে সন্দেহজনক কিছু-ই পাওয়া যায়নি।' বললেন সুলতান আইউবী।

তীরটি হাতে নিয়ে নিরীক্ষা করে দেখেন আলী বিন সুফিয়ান। বললেন, 'সুলতান আর গুপ্তচরের দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য। সর্বাগ্রে আমি ঐ ব্যবসায়ীদের ধরার চেষ্টা করবো।'

আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসলে দারোয়ান বললো, এই কমাণ্ডার সংবাদ নিয়ে এসেছেন, কাল যে সাতটি মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছিলো, তাদের একজনের খোঁজ নেই। সুলতানকে সংবাদটা জানানোর প্রয়োজন আছে কি?

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন আলী বিন সুফিয়ান। সংবাদদাতা কমাণ্ডার আলীর নিকটে এসে বললো— 'একটি খৃষ্টান মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হলো, ফখরুল মিসরী নামক কমাণ্ডার রাত থেকে উধাও। রাতের সান্ত্রীরা জানিয়েছে, ফখরুল মিসরী মেয়েদের তাঁবুর নিকট গিয়েছিলো। সেখান থেকে গেছে জখমীদের তাঁবুর দিকে। তারপর আর তাকে দেখা যায়নি। রাতে সে টহল দিতে বেরিয়েছিলো।'

খানিকটা চিন্তা করে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, এ সংবাদ সুলতানকে এখনই দিও না। ফখরুল মিসরী রাতের যে সময়ে ডিউটিতে গিয়েছিলো, তখনকার সব সান্ত্রীকে সমবেত করো।' আলী সুলতান আইউবীর রক্ষী বাহিনীর কমাণ্ডারকে বললেন, গতকাল যে রক্ষী ইউনিটটি সুলতানের সঙ্গে উপকূল পর্যন্ত গিয়েছিলো, তাদেরও আসতে বলো।

রক্ষীরা সেখানেই উপস্থিত ছিলো। সামনে এগিয়ে আসে চারজন। আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'কাল যেখানে তোমরা ব্যবসায়ী ও মেয়েদের দেখেছিলে,

এক্ষুণি সেখানে চলে যাও। ব্যবসায়ীরা যদি এখনো সেখানে থাকে, তাহলে তাদের আটক করে ফেলো। আর যদি না পাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসো।'

রক্ষীরা রওনা হয়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের তাঁবুর নিকট চলে যান। ছয়টি মেয়ে তাঁবুর বাইরে বসে আছে। সান্ত্রী দাঁড়িয়ে। মেয়েদের এক সারিতে দাঁড় করান আলী বিন সুফিয়ান। আরবীতে জিজ্ঞেস করেন— 'সপ্তম মেয়েটি কোথায়?'

মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মাথা নাড়ে। আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'তোমরা কি আমার ভাষা বুঝছো?'

মেয়েরা বিস্ময়ের সাথে আলীর প্রতি তাকিয়ে থাকে। আলী তাদের চেহারা ও হাবভাব দেখে সন্দেহে পড়ে যান। তিনি মেয়েগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়ান। আরবীতে বলেন— 'পরনের পোশাক খুলে এদের উলঙ্গ করে ফেলো, চারজন হায়েনা চরিত্রের সেপাই ডেকে আনো।'

চমকে উঠে মেয়েরা মোড় ঘুরে পিছন দিকে তাকায়। সমস্বরে কথা বলতে শুরু করে দু' তিনজন। নিজেদের অলক্ষ্যে আরবীতেই বলছে তারা— 'আমাদের সঙ্গে তোমরা এরূপ আচরণ করতে পারো না।' একজন বললো— 'আমরা তো আর তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছি না।'

মুখ থেকে হাসি বেরিয়ে আসে আলী বিন সুফিয়ানের। বললেন— 'আমি তোমাদের সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করবো। এক ধমকে-ই আরবী বুঝাতে ও বলতে শুরু করেছো। বড় ভালো মেয়ে তোমরা। এবার ধমক ছাড়াই বলে দাও, সপ্তম মেয়েটি কোথায়।'

সকলেই অজ্ঞতা প্রকাশ করে। আলী বললেন— 'এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব আমি তোমাদের থেকে নিয়ে-ই ছাড়বো। সুলতানকে বলেছিলে, তোমরা আরবী জানো না। আর এখন কিনা আমাদের মতোই আরবী বলছো। আমি কি তোমাদের এমনিতে-ই ছেড়ে দেবো?' আলী বিন সুফিয়ান সান্ত্রীকে বললেন— 'এদেরকে তাঁবুর ভেতরে বসিয়ে রাখো।'

রাতের প্রহরী এসে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীর ডিউটির সময়কার প্রহরীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মেয়েদের তাঁবুর প্রহরী জানায়, ফখরুল রাতে তাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে জখমীদের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলো। খানিক পর আমি তার কণ্ঠ শুনতে পাই— 'কে তুমি? নীচে নেমে আসো।' আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত করে অন্ধকারে কিছু-ই দেখলাম না। সম্মুখে

মাটির টিলার উপর ছায়ার মতো কী যেন দেখলাম। পরক্ষণেই ছায়াটি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তৎক্ষণাৎ আলী বিন সুফিয়ান ছুটে গেলেন সেখানে। টিলাটি উপকূলের সন্নিকটে। বালুকাময় মাটি। একস্থানে দু' মাপের দু'টি পায়ের ছাপ পাওয়া গেলো। একটি সামরিক বুট পরিহিত পুরুষের। অপরটি ছোট জুতার ছাপ– মেয়েলি বলে মনে হলো। মেয়েলি চিহ্নটি যেদিক থেকে এসেছে, আলী বিন সুফিয়ান ছুটে যান সেদিকে। এই চিহ্নটি তাকে নিয়ে যায় সেই তাঁবুর কাছে, যেখানে মুবী মিলিত হয়েছিলো রবিনের সঙ্গে। আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুর পর্দা তুলে ভেতরে ঢুকে যান।

এক এক করে জখমী কয়েদীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন আলী বিন সুফিয়ান। সকলের চেহারা পরিমাপ করেন তিনি। রবিন বসে আছে। আলী বিন সুফিয়ানকে দেখামাত্র কোঁকাতে শুরু করে সে। হঠাৎ ব্যথা উঠেছে তার। আলী বিন সুফিয়ান কাঁধে ধরে দাঁড় করিয়ে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যান তাকে। জিজ্ঞেস করেন— 'রাতে তোমার তাঁবুতে একটি কয়েদী মেয়ে এসেছিলো। কেন এসেছিলো?' রবিন কোন জবাব না দিয়ে আলীর প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, যেন সে কিছু-ই বুঝছে না। আলী বিন সুফিয়ান ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন— 'তুমি কি আমার ভাষা বুঝ দোস্ত! আমি কিন্তু তোমার ভাষা বুঝি এবং বলতেও পারি। তোমাকেও আমার ভাষায়-ই জবাব দিতে হবে।' কিন্তু রবিন অপলক চোখে তাকিয়ে-ই আছে আলীর প্রতি। আলী বিন সুফিয়ান সান্ত্রীকে বললেন— 'একে তাঁবুর বাইরে রাখো।'

আলী বিন সুফিয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করেন। অন্যান্য কয়েদীদের তাদের ভাষায় জিজ্ঞেস করেন— 'রাতে মেয়েটি এ তাঁবুতে কতক্ষণ ছিলো? সত্য কথা বলো, অযথা নিজেদের কষ্টে ফেলো না।'

কথা বলছে না কেউ। ধমকি দেন আলী বিন সুফিয়ান। এবার এক জখমী বললো, একটি মেয়ে রাতে তাঁবুতে এসেছিলো এবং রবিনের শয্যায় বসে বা শুয়ে ছিলো।

এ লোকটি জ্বলন্ত জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাপ দিয়েছিলো। আগুন এবং পানি দু'য়ের-ই লীলা দেখে এসেছে লোকটি। যত ভীত ততটা আহত নয়। তবে তৃতীয় আর কোন বিপদে পড়তে প্রস্তুত নয় সে। সে জানায়, রবিন ও আগত মেয়েটির মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, তা তার জানা নেই। মেয়েটি কে, তা-ও সে বলতে পারে না। রবিনের পদ কি, তাও তার অজানা। সে জানায়, ক্যাম্পে আসার পূর্ব

পর্যন্ত লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো। এখানে আসার পর-ই সে এভাবে কোঁকাতে শুরু করেছে।

এক প্রহরীর দিক-নির্দেশনায় আলী বিন সুফিয়ান সেই পাঁচ ব্যক্তিকে দেখার জন্য চলে যান, যারা বণিক বেশে কিছু দূরে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছে। আলীর রক্ষীরা আলাদাভাবে এক স্থানে বসিয়ে রেখেছে তাদের। রক্ষীরা আলী বিন সুফিয়ানকে তথ্য প্রদান করে, কাল এদের নিকট দু'টি উট ছিলো; আজ আছে একটি। বিচক্ষণ গোয়েন্দা প্রধান আলীর জন্য এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। অপর উটটি কোথায় গেলো, বণিকদের কাছে তার সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া গেলো না। অনুসন্ধানে নেমে পড়েন আলী বিন সুফিয়ান। উধাও হওয়া উটের পদচিহ্ন পেয়ে গেলেন তিনি। বণিকদের বললেন— 'তোমরা সাধারণ কোন অপরাধে অপরাধী নও। অন্যায় তোমাদের গুরুতর। তোমরা গোটা একটি সাম্রাজ্য এবং তার সকল নাগরিকের জন্য বিপজ্জনক। তাই তোমাদের প্রতি আমি এতটুকু সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারি না। বলো তো, তোমরা কি ব্যবসায়ী?'

'হ্যা, আমরা ব্যবসায়ী জনাব! আমরা নিরপরাধ।' মাথা লেড়ে জবাব দেয় সকলে।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'তোমাদের সকলের হাতের উল্টা দিকটা একটু দেখাও দেখি।' সকলে নিজ নিজ হাত উল্টো করে আলী বিন সুফিয়ানের সামনে এগিয়ে ধরে। আলী সকলের বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝখানটা দেখেন এবং একজনের বাহু ধরে সামনে নিয়ে আসেন। বললেন— 'ধনুক-তূনীর কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ বল্!'

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে লোকটি। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর এক রক্ষীকে নিজের কাছে ডেকে এনে তার বাঁ হাতের উল্টো দিকটা লোকটাকে দেখান। আঙ্গুলের গোড়ায় উল্টো পিঠে একটি দাগ আছে। তেমনি একটি দাগ বণিক লোকটির আঙ্গুলের পিঠেও বিদ্যমান। আলী বিন সুফিয়ান তাকে রক্ষী সম্পর্কে বলেন— 'এ লোকটি সুলতান আইউবীর সেরা তীরান্দাজ। তার তীরান্দাজ হওয়ার প্রমাণ এই চিহ্ন।'

বণিক লোকটির আঙ্গুলের উল্টো পিঠে অস্পষ্ট ধরনের একটি চিহ্ন, যেন এ স্থানে বারবার কোন একটি বস্তুর ঘর্ষণ লেগেছে। এটি তীর ঘর্ষণের দাগ। তীর ধরা হয় ডান হাতে। ধনুক থাকে বাঁ হাতে। তীরের অগ্রভাগ থাকে আঙ্গুলের উপর। আর তীর ধনুক থেকে বের হওয়ার সময় আঙ্গুলে ঘর্ষণ লাগে। এমনি দাগ থাকে প্রত্যেক তীরান্দাজের হাতে। আলী বিন সুফিয়ান লোকটিকে বললেন, এই পাঁচজনের মধ্যে তুই-ই শুধু তীরান্দাজ। বল্, ধনুক-তূনীর কোথায় রেখেছিস্?'

পাঁচজন-ই নীরব। আলী বিন সুফিয়ান পাঁচজনের একজনকে ধরে রক্ষীদের বললেন— 'একে ঐ গাছটার সাথে বেঁধে রাখো।'

লোকটিকে একটি খেজুর গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখা হলো। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর তীরান্দাজের কানে কানে কী যেন বললেন। তীরান্দাজ কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তীর সংযোজন করে এবং গাছের সঙ্গে বাঁধা লোকটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে। তীর গিয়ে বিদ্ধ হয় লোকটির ডান চোখে। ছট্‌ফট্ করতে শুরু করে লোকটি। আলী বিন সুফিয়ান অপর চারজনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আর যে ক্রুশের সন্তুষ্টি অর্জনে এভাবে ছট্‌ফট্ করে করে জীবন দিতে প্রস্তুত আছো, ওর দিকে তাকাও।' লোকটির প্রতি চোখ তুলে তাকায় তারা। লোকটি ছট্‌ফট্ করছে আর চীৎকার করছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে তার তীরবিদ্ধ চোখ থেকে।

'আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তোমাদেরকে সসম্মানে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছিয়ে দেবো। বলো, অপর উটটিতে করে কে গেছে, কোথায় গেছে?' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'তোমাদের একজন কমাণ্ডার আমাদের একটি উট ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।' জবাব দেয় একজন।

'আর একটি মেয়েও।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

অল্পক্ষণের মধ্যে-ই আলী বিন সুফিয়ানের কৌশল লোকগুলো থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেয় যে, তারা কারা। কিন্তু তারা একটি মিথ্যা কথা বলে যে, মেয়েটি রাতে তাঁবু থেকে পালিয়ে এসে বলেছিলো, সুলতান আইউবী রাতে তাকে তাঁর তাঁবুতে রেখেছিলেন এবং তিনি নিজেও মদপান করেন, মেয়েটিকেও পান করান। মেয়েটি পালিয়ে ভীত-সন্ত্রস্থ অবস্থায় এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। তাকে ধাওয়া করার জন্য ফখরুল মিসরী নামক এক কমাণ্ডার আসে এবং মেয়েটির বক্তব্য শুনে উটের পিঠে বসিয়ে তাকে জোরপূর্বক নিয়ে যায়। মেয়েটি সুলতান আইউবীর নামে যে অপবাদ আরোপ করেছিলো, আলী বিন সুফিয়ানকে তারা সব শোনায়।

আলী বিন সুফিয়ান মুচকি হেসে বললেন— 'তোমরা পাঁচজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক ও তীরান্দাজ। আর একটি মানুষ কিনা তোমাদের একটি মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং একটি উটও। নিতান্ত নির্বোধ না হলে একথা বিশ্বাস করবে কেউ?'

লোকগুলোর নির্দেশনা মোতাবেক আলী বিন সুফিয়ান মাটিতে পুঁতে রাখা ধনুক ও তূনীর উদ্ধার করেন। তাঁবুতে পাঠিয়ে দেন চারজনকে। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মরে গেছে পঞ্চমজন।

উটের পদচিহ্ন চোখে পড়ছে স্পষ্ট। দশজন আরোহী ডেকে পাঠান আলী বিন সুফিয়ান। মুহূর্ত মধ্যে এসে পৌঁছে দশ আরোহী। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে উটের পায়ের দাগ অনুসরণ করে রওনা হন তিনি।

কিন্তু উটের রওনা হওয়া আর আলী বিন সুফিয়ানের এই পশ্চাদ্ধাবনের মাঝে চৌদ্দ-পনের ঘন্টার ব্যবধান। তদুপরি উটটি অতি দ্রুতগামীও বটে। দানা-পানি ছাড়া উট সবল ও তরতাজা থাকতে পারে অন্তত ছয়-সাত দিন। তাই পথে বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই। তার বিপরীতে পথে ঘোড়াগুলোর দানা-পানি ও বিশ্রামের প্রয়োজন পড়বে একাধিকবার। ফলে চৌদ্দ-পনের ঘন্টার ব্যবধান কাটিয়ে ফখরুল মিসরীকে ধরা সম্ভব হলো না আলীর। ধাওয়া খাওয়ার আশঙ্কায় পথে তেমন থামেনি ফখরুল।

পথে একটি বস্তু চোখে পড়ে আলী বিন সুফিয়ানের। একটি থলে। ঘোড়া থামিয়ে নেমে থলেটি তুলে নেন তিনি। খুলে দেখেন। খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেলো তাতে। থলেটির মধ্যে ছোট্ট আরেকটি পুটুলি। তার মধ্যেও কিছু আহার্য বস্তু। খাবারগুলো নাকের কাছে ধরে-ই আলী বিন সুফিয়ান বুঝে পেলেন, এতে হাশীশ মেশানো। পথে দু' জায়গায় তিনি এমন কিছু আলামত পান, যাতে বুঝা গেলো, এখানে উট থেমেছিলো এবং আরোহী উপবেশন করেছিলো। খেজুরের বীচি, ফলের দানা ও ছিলকা ছড়িয়ে আছে এদিক-সেদিক। থলেটি সন্দেহে ফেলে দেয় আলী বিন সুফিয়ানকে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, হাশীশের নেশায় ফেলে মেয়েটি ফখরুল মিসরীকে তার রক্ষী বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তথাপি তিনি থলেটি নিজের কাছে রেখে দেন। কিন্তু থলের অনুসন্ধান ও অবস্থান বেশ সময় নষ্ট করে দিয়েছে তাঁর।

ফখরুল মিসরী ও মুবী গন্তব্যে পৌঁছুতে না পারলেও এবং পথে ধরা পড়ে গেলেও তেমন কোন অসুবিধা ছিলো না। কারণ, ইতিমধ্যে নাজি, ঈদরৌস ও তার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মী সুলতান আইউবীর বিষের ক্রিয়ায় দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। নাজি ফাতেমী খেলাফতের একজন সেনাপতি হলেও প্রকৃতপক্ষে সে-ই মূল রাষ্ট্রনায়ক হয়ে বসেছিলো। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে একজন ব্যর্থ ও অথর্ব গভর্নর প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিলো। মুসলিম শাসকবর্গ নিজ নিজ হেরেমে বন্দী হয়ে পড়েছে সেই রূপসী

মেয়েদের হাতে, যাদের কেউ খৃষ্টান, কেউ ইহুদী। নাম তাদের ইসলামী। এদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে ভোগ-বিলাসিতা আর যৌনসম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মুসলিম শাসকগণ। ইসলামে নিবেদিত ও দেশপ্রেমিক সুলতান আইউবী এখন তাদের চোখের কাঁটা। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী যদি না থাকতেন, তাহলে ইতিহাসে সালাহুদ্দীন আইউবী নামক কোন ব্যক্তির নাম-চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো না। পৃথিবীর মানচিত্রে থাকতো না এতগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

সামান্য ইঙ্গিত পেলে-ই নুরুদ্দীন জঙ্গী সৈন্য প্রেরণ করতেন সুলতান আইউবীর সাহায্যে। সুদানী সৈন্যদের আহ্বানে খৃষ্টানরা যখন মিসর আক্রমণের জন্য রোম উপসাগরে ছড়িয়ে পড়লো, তখন সংবাদ পাওয়ামাত্র নুরুদ্দীন জঙ্গী এমন এক খৃষ্টান দেশের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে বসেন, যারা মিসর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো। নুরুদ্দীন জঙ্গী নিজের সমস্যা অপেক্ষা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সমস্যাকে অধিক প্রাধান্য দিতেন।

কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুসলিম সেনানায়ক ও অসামরিক ব্যক্তি অনুভব করলো, মিসরে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে অস্থিরতা ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে। সেই বিদ্রোহের আগুনে হাওয়া দিতে শুরু করলো তারা। তারা নেপথ্যে থেকে সুদানী সৈন্যদের উত্তেজিত করতে শুরু করলো। তারা গুপ্তচর মারফত জানতে পারলো, সুদানী সৈনদের সালারদের গোপনে হত্যা করে গুম করে ফেলা হয়েছে। সুদানী বাহিনীর নিম্নপদস্থ কমাণ্ডাররা সালারের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবীর মিসরে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের উপর হামলা করার পরিকল্পনা আঁটছেন। সুলতান আইউবীর আধা ফৌজ এবং রাজধানীতে সুলতানের অনুপস্থিতি থেকে ফায়েদা হাসিল করতে চাচ্ছে তারা। সেই পরিকল্পনার আওতায় কালো মেঘের ন্যায় ইসলামের চন্দ্রকে ঢেকে ফেলতে চাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার সুদানী ফৌজ।

কায়রো পৌঁছে গেছেন আলী বিন সুফিয়ান। যাকে ধাওয়া করতে গেলেন, তার কোন সন্ধান পেলেন না। সুদানী হেডকোয়ার্টারে অবস্থানরত গোয়েন্দাদের তলব করলেন। তাদের একজন জানালো, গতরাতে একটি উট এসেছিলো। তার আরোহী ছিলো দু'জন। একজন পুরুষ একজন নারী। এখন তারা কোন্ ভবনে অবস্থান করছে, তাও অবহিত করে গোয়েন্দা। আলী বিন সুফিয়ান ইচ্ছে করলে এক্ষুণি হানা দিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন, বিষয়টি জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি হতে পারে। সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। শুধু মুবী আর ফখরুল মিসরীকে গ্রেফতার করা-ই আলী বিন সুফিয়ানের একমাত্র লক্ষ্য

নয়। তার প্রধান লক্ষ্য, সুদানী বাহিনীর প্রত্যয় ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা, যাতে এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা সহজ হয়।

গোয়েন্দাদের প্রতি নতুন নির্দেশনা জারী করেন আলী বিন সুফিয়ান। বেশ কিছু মেয়েও আছে তাঁর গোয়েন্দাদের মধ্যে। তারা খৃষ্টান বা ইহুদী নয়–মুসলিম। বিভিন্ন পতিতালয় থেকে তুলে আনা হয়েছে তাদের। কিন্তু তাদের প্রতি আলী বিন সুফিয়ানের আস্থা আছে ষোলআনা। তাদেরকে বলে দিলেন মুবীকে খুঁজে বের করতে।

চারদিন হলো, আলী বিন সুফিয়ান রাজধানীর বাইরে ঘুরে ফিরছেন। সুদানী ফৌজী নেতৃত্বের চারপার্শ্বে ঘুরপাক খাচ্ছে তার কর্মতৎপরতা।

আজ পঞ্চম রাত। বাইরে খোলা আকাশের নীচে বসে দু'জন গোয়েন্দার নিকট থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন তিনি। আলী বিন সুফিয়ান কখন কোথায় থাকেন, তা জানা থাকে তার লোকদের। দলের এক ব্যক্তি আরেকজনকে সঙ্গে করে তাঁর নিকট আসে এবং বলে— 'এ লোকটাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনেছি। ঢুলুঢুলু শরীরে লোকটা একবার পড়ছে আবার উঠে দু' কদম সম্মুখে এগিয়ে পুনরায় পড়ে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। পরিচয় জানতে চাইলে বললো, আমাকে আমার বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। নাম নাকি ফখরুল মিসরী। লোকটি ভাল করে কথা বলতে পারছে না।' এমনি সময়ে ধপাস্ করে মাটিতে বসে পড়ে সে।

'তুমি-ই কি সেই কমাণ্ডার, যে একটি মেয়ের সঙ্গে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমি সুলতান আইউবীর পলাতক সৈনিক। মৃত্যুদণ্ডের অপরাধে অপরাধী। তবে আগে আমার পুরো ঘটনা শুনুন, অন্যথায় আপনাদেরও সকলের মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হবে।' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো লোকটি।

কথা বলার ভাব-ভঙ্গিতে আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, লোকটি নেশাগ্রস্থ। তাই তাকে নিজের দফতরে নিয়ে যান এবং রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা থলেটি তাকে দেখান। জিজ্ঞেস করেন— 'এই থলেটি কি তোমার? এর খাদ্য-দ্রব্য খেয়ে-ই কি তোমার এই দশা?'

'হ্যাঁ, ও আমাকে এর থেকে-ই খাওয়াতো।' জবাব দেয় ফখরুল মিসরী।

থলের ভিতরে পাওয়া পুটুলিটি আলীর সামনে রাখা। ফখরুল মিসরী ঝট্ করে পুটুলিটি হাতে নিয়ে খুলে-ই মিষ্টির মত একটি টুকরা তুলে নেয়। আলী বিন সুফিয়ান খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলেন। ফখরুল মিসরী অস্থিরচিত্তে বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় এটি খেতে দাও। এর-ই মধ্যে আমার জীবন। অন্যথায় আমি বাঁচবো না।'

আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীর হাত থেকে টুকরাটি ছিনিয়ে নেন এবং বলেন— 'তোমার পূর্ণ কাহিনী শোনাও, তারপর না হয় এসব খেয়ে জীবন বাঁচাবে।'

আলী বিন সুফিয়ানকে নিজের পূর্ণ কাহিনী শোনায় ফখরুল মিসরী। ক্যাম্প থেকে মেয়েটিকে ধাওয়া করা থেকে শুরু করে সর্বশেষ ঘটনা পর্যন্ত সবিস্তার বিবরণ দেয় আলী বিন সুফিয়ানের কাছে। সে জানায়, বণিকরা আমাকে কফি পান করায়, যার ক্রিয়ায় আমি ভিন্ন এক জগতে গিয়ে উপনীত হই। বণিকরা তাকে যা যা বলেছে, তাও শোনায় সে আলী বিন সুফিয়ানকে। মেয়েটির ফাঁদে আটকা পড়া সম্পর্কে ফখরুল জানায়, বণিকদের দেয়া কফি পান করে আমি নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। মেয়েটির বিবৃত কাহিনী শুনে আমার মনে সুলতান আইউবীর প্রতি অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। আমি তাদের ফাঁদে আটকা পড়ি। উটের পিঠে বসিয়ে মুবী আমাকে কোথায় যেন নিয়ে রওনা হয়। তার প্রেমে পড়ে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

আমরা একটানা চলতে থাকি। মাঝে-মধ্যে সামান্য বিরতি দিয়ে মেয়েটি ছোট্ট পুটুলি থেকে আমাকে কি যেন খাওয়ায়। আমি নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করি। মেয়েটি আমাকে ভালবাসার নিশ্চয়তা দিয়েছিলো, ওয়াদা দিয়েছিলো আমাকে বিয়ে করবে। শর্ত দিয়েছিলো, আমি তাকে সুদানী কমাণ্ডারদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবো।

আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। বিয়ে ছাড়া-ই মেয়েটিকে স্ত্রীর মত ব্যবহার করার চেষ্টা করি। মেয়েটি তার বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নিয়ে প্রেম দিয়ে আমাকে পাগল করে তোলে।

তৃতীয়বার পানাহারের জন্য অবতরণ করে দেখি, থলে নেই। খাদ্যভর্তি থলেটি পথে কোথায় পড়ে গেছে যেন। পিছনে ফিরে গিয়ে থলেটি খুঁজে আনার জন্য বলে মুবী। আমি বললাম, আমি পলাতক সৈনিক। আশঙ্কা আছে, দলের লোকেরা আমাকে ধাওয়া করবে। কিন্তু জিদ্ ধরে বসে মেয়েটি। বলে, না, যে করে-ই হোক থলেটি খুঁজে আনতে-ই হবে। আমি তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি যে, আমাদের ক্ষুধায় মরে যাওয়ার ভয় নেই। একান্ত প্রয়োজন হলে পথে কোন বাড়িতে গিয়ে কিছু চেয়ে খাবো। কিন্তু লোকালয়ের কাছে ঘেঁষতে রাজি নয় মেয়েটি। আমি তাকে জোরপূর্বক উটের পিঠে বসিয়ে নিই এবং তার পিছনে বসে উট হাঁকাই।

সেদিন ছিলো সফরের তৃতীয় দিন। সন্ধ্যার সময় মেয়েটি শহরের বাইরে সুদানীদের এক কমাণ্ডারের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। আমি আমার মাথায় এমন

অস্থিরতা অনুভব করলাম, যেন মাথায় কতগুলো পোকা কিলবিল করছে। ধীরে ধীরে আমি বাস্তব জগতে ফিরে আসি।

ফখরুল মিসরী বুঝতে পারেনি, তার এ অস্থিরতা হাশীশ না পাওয়ার ক্রিয়া। তার কাল্পনিক রাজত্ব আর স্বপ্নের জান্নাত থলের মধ্যে কোথায় মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। মেয়েটি তার সামনে কমাণ্ডারকে খৃষ্টানদের পয়গাম শোনায় এবং বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করে। ফখরুল মিসরী পাশে বসে সব শুনতে থাকে। তার মাথার পোকাগুলো বড় হয়ে ছুটোছুটি করতে শুরু করে। নেশার ঘোর কেটে গেছে অনেকটা। আস্তে আস্তে তার মনে পড়তে শুরু করে, সে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু মুবীর ধারণা, ফখরুল মিসরী এখনো নেশাগ্রস্থ। তাই সে নির্দ্বিধায় ফখরুল মিসরীর সামনেই কমাণ্ডারদের বলে, সুলতান আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানের মধ্যে এমন ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতে হবে, যেন উভয়-ই উভয়কে নারীলোলুপ ও মদ্যপ ভাবতে শুরু করে।

তাদের এই দীর্ঘ আলাপচারিতায় বিদ্রোহ নিয়েও কথা হয়। এতক্ষণে ফখরুল মিসরী সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাথার অস্থিরতা দারুণ পেরেশান করে রেখেছে তাকে। মেয়েটি কমাণ্ডারকে বলে, বিদ্রোহ যদি করতে হয়, তাহলে সময় নষ্ট করা যাবে না। সুলতান আইউবী এখন রণাঙ্গনে আছেন এবং মহা ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

মেয়েটি তাদেরকে একটি মিথ্যে কথা বলে যে, তিন-চারদিন পর খৃষ্টানরা দ্বিতীয়বারের মত আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এখানকার এই গুটিকতক সৈন্যকেও রণাঙ্গনে তলব করতে বাধ্য হবেন আইউবী। কমাণ্ডারও মুবীকে জানায়, ছয়-সাতদিনের মধ্যে সুদানী বাহিনী এখানকার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

এইসব কথোপকথন শুনতে থাকে ফখরুল মিসরী। মধ্য রাতের পর পৃথক একটি কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। তার শোয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে। মুবী ও কমাণ্ডারগণ অবস্থান করে অন্য কক্ষে। দুই কক্ষের মধ্যখানে একটি দরজা। বন্ধ করে দেয়া হয় দরজাটি। কৌতূহলী হয়ে উঠে ফখরুল মিসরী। কান খাড়া করে বসে দরজা ঘেঁষে। অপর কক্ষ থেকে হাসির শব্দ শুনতে পায় সে। তারপর মেয়েটির কথা বলার আওয়াজ– 'লোকটাকে হাশীশের জোরে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। প্রেম নিবেদন করে রূপের মোহজালে তাকে আবদ্ধ করে রেখেছি। আমার একজন রক্ষীর প্রয়োজন ছিলো। হাশীশের থলেটি পথে কোথায় যেন পড়ে গেছে। ভোরে উঠে যদি খাবার না পায়, বেটা বড় পেরেশান করবে।'

তারপর থেকে ফখরুল মিসরীর কানে যেসব শব্দ ভেসে আসে, তাতে পরিষ্কার বুঝা গেলো, তারা মদপান করছে, চলছে বেহায়াপনা। দীর্ঘ সময় পর

কমাণ্ডারের কণ্ঠ শুনতে পায় ফখরুল মিসরী— 'এ লোকটি এখন আমাদের জন্য সম্পূর্ণ বেকার। হয় তাকে বন্দীশালায় ফেলে রাখো, নতুবা শেষ করে দাও।'

প্রস্তাবে সায় দেয় মুবী।

পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে ফখরুল মিসরী। রাতের তখন প্রথম প্রহর। ফখরুল মিসরী কক্ষ থেকে বের হয়। পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। ভোর নাগাদ নিরাপদ দূরত্বে চলে যায় সে। মনে তার দ্বিমুখী সংশয়। পশ্চাদ্ধাবনের ভয়। উভয় দিকে-ই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে সে। নিজের বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও অপরাধী, সুদানীদের হাতে ধরা পড়লে তো মৃত্যু নিশ্চিত।

দিনভর একস্থানে লুকিয়ে থাকে ফখরুল মিসরী। নেশার টান, ভয় আর ক্ষোভ লোকটার দেহ ও দেমাগকে বেকার করে তুলছে। রাত নাগাদ চলনশক্তিও লোপ পেতে শুরু করে তার। অবশেষে তার এই অনুভূতিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায় যে, এখন দিন না রাত। নিজে এখন কোথায় আছে, তাও বলতে পারছে না সে। একবার ইচ্ছে হয়, ঐ খৃষ্টান মেয়েটাকে গিয়ে খুন করে আসে। আবার ভাবে, একটা উট বা ঘোড়া পেলে রণাঙ্গনে গিয়ে সুলতান আইউবীর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। কিন্তু যা-ই সে ভাবছে, মুহূর্ত মধ্যে অন্ধকার এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে তার সামনের সবকিছু।

এমনি অবস্থায় এই লোকটিকে পেয়ে যায় সে। লোকটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তাই প্রশিক্ষণ অনুযায়ী ফখরুল মিসরীর সঙ্গে সে বন্ধুত্ব ও সমবেদনামূলক কথা বলে এবং তুলে আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে আসে।

সুদানী বাহিনী যে আক্রমণ ও বিদ্রোহ করবে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জানা গেলো, এ বিদ্রোহ সংঘটিত হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। আলী বিন সুফিয়ান একবার ভাবলেন, তিনি সুদানী কমাণ্ডারদের বিদ্রোহের ব্যাপারে সতর্ক করবেন এবং সুলতান আইউবীকে সংবাদ দেবেন। কিন্তু হাতে তার সময় নেই। ইত্যবসরে আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পান, সুলতান তাঁকে ডাকছেন। আলী বিন সুফিয়ান শশব্যস্তে উঠে রওনা দেন। মনে তার আশঙ্কা, সুলতানকে ময়দানে রেখে এসেছি; এখন তিনি এখানে, কোন অঘটন ঘটেনি তো!

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন— 'আমি সংবাদ পেয়েছি, উপকূলে খৃষ্টানদের একটি গ্যাং অবস্থান করছে। তাদের কেউ কেউ এদিকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। ময়দানে এখন আর আমার কাজ নেই। নায়েবদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। এদিকে কোন সমস্যা হলো কিনা ভেবে মনটা আমার বেজায় ছট্‌ফট্ করছিলো। তাই চলে আসলাম। এদিকের খবর কী?

আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীকে সব খবর শোনান এবং বলেন, আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি মুখের অস্ত্র ব্যবহার করে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করি কিংবা সুলতান জঙ্গীর সাহায্য আসা পর্যন্ত বিদ্রোহ মুলতবী

রাখার ব্যবস্থা করি। এ কাজে আমি আমার গোয়েন্দাদের-ই কাজে লাগাতে পারি। আমাদের সৈন্য কম। আক্রমণ হয়ে গেলে আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা কঠিন হবে।'

মাথা নত করে কক্ষে পায়চারী করতে শুরু করেন সুলতান আইউবী। গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান তিনি। আলী বিন সুফিয়ান তাকিয়ে আছেন সুলতানের প্রতি। হঠাৎ থেমে গেলেন সুলতান। বললেন–

'হ্যাঁ, আলী! তুমি তোমার ভাষা ও গুপ্তচরদের ব্যবহার করো। তবে আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নয়– আক্রমণের পক্ষে। আমাদের উপর সুদানীদের হামলা করাই উচিত এবং তা হওয়া দরকার যখন আমাদের বাহিনী ব্যারাকে ঘুমিয়ে থাকে ঠিক তখন।'

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সুলতানের প্রতি তাকিয়ে থাকেন আলী বিন সুফিয়ান। সুলতান বললেন— 'এখানকার সব ক'জন কমাণ্ডারকে ডেকে পাঠাও এবং তুমিও এসে পড়ো।' সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে কঠোরভাবে বলে দেন, যেন তিনি কমাণ্ডারদের জানিয়ে দেন, তিনি যে ময়দান থেকে এখানে এসেছেন, তা যেন ঘুণাক্ষরেও অন্য কেউ না জানে। তিনি বলেন, এখানে আমার উপস্থিতি গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরী। আমি অতি সাবধানে সন্তর্পণে চলে এসেছি।

❖ ❖ ❖

তিন রাত পর।

আঁধার রাতের কোলে গভীর নিদ্রায় শুয়ে আছে কায়রো। একদিন আগে নগরবাসীরা দেখেছিলো, তাদের নবগঠিত মিসরী বাহিনীটি শহর ত্যাগ করে কোথাও যাচ্ছে। প্রচার হয়েছিলো, বাহিনী সামরিক মহড়ার জন্য শহরের বাইরে গেছে। নীলনদের কূলে বালুকাময় পার্বত্য এলাকায় উপনীত হয়ে তাঁবু গেড়েছে সৈন্যরা। বাহিনীর কেউ পদাতিক, কেউ অশ্বারোহী।

রাতের প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্ত। কায়রোর ঘুমন্ত বাসিন্দারা দূরে কোথাও প্রলয় সংঘটিত হওয়ার শব্দ শুনতে পায়। ঘোড়ার দ্রুত দৌড়াদৌড়ির আওয়াজও কানে আসে তাদের। জেগে উঠে ঘুমন্ত মানুষগুলো। তারা প্রথম প্রথম মনে করেছিলো, সৈন্যদের মহড়া চলছে। কিন্তু শোরগোল ধীরে ধীরে নিকটে চলে আসছে এবং স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠছে। ঘরের ছাদে উঠে দেখতে শুরু করে জনতা। লাল বর্ণ ধারণ করছে আকাশ। কারো কারো চোখে পড়ছে, নীল নদ থেকে আগুনের শিখা উঠে এসে আঁধার রাতের বুক চিরে ডাঙ্গায় এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তারপর-ই শহরে হাজার হাজার ঘোড়ার ছুটোছুটি– দৌড়াদৌড়ির শব্দ-শোরগোল শুরু হয়ে যায়। শহরবাসীরা এখনো জানেনা, এটি মহড়া নয়– রীতিমত যুদ্ধ। আর যে আগুন দেখা যাচ্ছে, তাতে সুদানী বাহিনীর সিংহভাগ পুড়ে ছাই-এ পরিণত হচ্ছে।

সুলতান আইউবীর এ এক অনুপম রণকৌশল। তিনি রাজধানীতে অবস্থানরত স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে নীল নদ ও বালুকাময় টিলার পর্বতশ্রেণীর মাঝে বিস্তীর্ণ মাঠে পাঠিয়ে দেন। তারা তাঁবু স্থাপন করে সেখানে অবস্থান নেয়। নিজের কৌশল ও দক্ষতা কাজে লাগান আলী বিন সুফিয়ান। সুদানী বাহিনীর মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে তিনি বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে এবং কমাণ্ডার থেকে এই সিদ্ধান্ত আদায় করে নেন যে, রাতে যখন সুলতান আইউবীর সৈন্যরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকবে, ঠিক তখন সুদানী বাহিনী তাদের উপর হামলা চালাবে। ভোর নাগাদ এক একজন করে সৈন্য শেষ করে নির্বিঘ্নে রাজধানী দখল করে নেয়া হবে। আর সুদানী বাহিনীর অপর অংশকে রোম উপসাগরের কূলে অবস্থানরত আইউবী বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মোতাবেক সুদানী বাহিনীর একটি অংশকে নিতান্ত গোপনে রাতে রোম উপসাগরের রণাঙ্গন অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। অপর অংশ নীল নদের কূলে অবস্থানরত সৈন্য বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ বাহিনীটি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় এক মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৈরী করা আইউবী বাহিনীর তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুহূর্ত মধ্যে অতি দ্রুত সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ তাঁবুগুলোর উপর আগুনের তীর ও তেলভেজা কাপড়ে প্রজ্বলমান গোলা বর্ষিত হতে শুরু করে। অগ্নিবর্ষণ করতে আরম্ভ করে নীলনদও। তাঁবুগুলোতে আগুন ধরে যায়। আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিশিখা। সুদানী বাহিনী তাঁবুতে না পেলো সুলতান আইউবীর বাহিনীর কোন সৈন্য, না পেলো কোন একটি ঘোড়া ও একজন আরোহী। সম্পূর্ণ শূন্য সবগুলো তাঁবু। এগিয়ে আসলো না কেউ মোকাবেলার জন্য। আর হঠাৎ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁবু এলাকার সর্বত্র। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সমগ্র এলাকা।

সুদানী বাহিনীর জানা ছিলো না, সুলতান আইউবী রাতের প্রথম প্রহরে ছাউনীগুলো থেকে তাঁর বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে বালুকাময় টিলাসমূহের পিছনে লুকিয়ে রেখেছেন এবং তাঁবুগুলোতে শুকনো ঘাসের স্তূপ ভরে রেখেছেন। তাঁবুর উপরে এবং ভিতরে তেল ছিটিয়ে রেখেছেন। সুলতান আইউবী কিশতীগুলোতে ছোট ছোট মিনজানীক রেখে সন্ধ্যার পর যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুদানী বাহিনী যেই মাত্র ছাউনী এলাকায় প্রবেশ করে, অমনি সুলতান আইউবীর লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা অগ্নিতীর এবং কিশতীতে রাখা মিনজানীক দ্বারা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করে দেয়। তাঁবুগুলোতে আগুন ধরে গেলে শুক্‌নো ঘাস আর তেল এলাকাটাকে জাহান্নামে পরিণত করে। সুদানীদের ঘোড়াগুলো তাদের পদাতিক সৈন্যদের পিষতে শুরু করে। আগুনের বেষ্টনী থেকে

বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাদের। হাজার হাজার সৈন্যের আর্তচীৎকার আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তোলে। অন্ধকার রাতটাকে দিনে পরিণত করে প্রজ্বলিত আগুন। সুলতান আইউবীর মুষ্টিমেয় সৈন্য আগুনে প্রজ্বলমান সুদানীদের ঘিরে ফেলে। আগুন থেকে বেরিয়ে যে-ই পালাবার চেষ্টা করছে, তীর বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ছে সে।

ওদিকে সুদানীদের যে বাহিনীটি রণাঙ্গন অভিমুখে সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের ব্যাপারেও উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুলতান আইউবী। সুলতানের কয়েকটি ক্ষুদ্র বাহিনী বিভিন্ন স্থানে ওঁৎ পেতে বসে আছে পূর্ব থেকে। অগ্রসরমান সুদানী বাহিনীর পিছন ভাগে আক্রমণ চালিয়ে হুলস্থুল সৃষ্টি করে দেয় গোটা বাহিনীতে। এক আক্রমণে যতটুকু ক্ষতিসাধন করা সম্ভব ছিলো, তা করে তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিপর্যস্ত সুদানী বাহিনী নিজেদের সামলে নিতে না নিতে-ই বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের উপর আক্রমণ আসে আবারো। আক্রমণ চালিয়েই বিদুদ্গতিতে অন্ধকারে হাওয়া হয়ে যায় তারাও।

ভোর পর্যন্ত সুদানীদের এই বাহিনীটির উপর হামলা হয় তিনবার। মনোবল হারিয়ে ফেলে সুদানী বাহিনী। মোকাবেলা করার সুযোগ-ই পাচ্ছে না তারা। দিনের বেলা কমাণ্ডাররা বুঝিয়ে-শুনিয়ে মন ঠিক করে সৈন্যদের। কিন্তু রাতে ফেরার পথে গতরাতের ন্যায় একই দশা ঘটে তাদের। এবার অন্ধকারে তীরও বর্ষিত হয় তাদের উপর। অন্ধকারে ঘোড়ার ছুটোছুটির শব্দ শুনতে পায় তারা। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছু-ই। এই ঘোড়াগুলোই তাদের করুণ দশা ঘটিয়ে যাচ্ছে নেপথ্যে থেকে।

তিন-চারজন ঐতিহাসিক– যাদের মধ্যে নীল পল ও উইলিয়াম অন্যতম– লিখেছেন, রাতের বেলা বিপুলসংখ্যক শত্রুসেনার উপর গুটিকতক সৈন্যের কমাণ্ডো আক্রমণ ও চোখের পলকে উধাও হয়ে যাওয়া ছিলো সুলতান আইউবীর এমনি এক রণকৌশল, যা খৃষ্টানদের বিপুল ক্ষতিসাধন করেছে। এভাবেই দুশমনের অগ্রযাত্রাকে দারুণভাবে ব্যাহত করতেন সুলতান আইউবী। কৌশলের মার-প্যাচে ফেলে তিনি শত্রু সেনাদের তাঁর-ই নির্বাচিত স্থানে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতেন। এ ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবীর এই জানবাজ সৈন্যদের বীরত্ব ও বিদুদ্গতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ যুগের সমর বিশ্লেষকগণ স্বীকার করে থাকেন যে, বর্তমানকার গেরিলা ও কমাণ্ডো অভিযানের আবিষ্কর্তা হলেন বীর মুসলিম যোদ্ধা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। এ পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে-ই তিনি শত্রুপক্ষের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতেন।

এ কৌশল অবলম্বন করে-ই তিনি মাত্র দু' রাতে বার কয়েক কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে সুদানী সৈন্যদের যুদ্ধ করার মনোবল শেষ করে দিয়েছেন। সুদানীদের নেতৃত্বে বিচক্ষণ কোন মেধা ছিলো না। বিধ্বস্ত এই সৈন্যদের সামাল দিতে পারলো না কমাণ্ডাররা। সুদানী সৈনিকের বেশে আলী বিন সুফিয়ানের কিছু লোকও ছিলো এ বাহিনীতে। তারা সংবাদ ছড়িয়ে দেয়, আরব থেকে এমন একটি বাহিনী আসছে, যারা সুদানীদের ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করে দেবে। সুদানী সৈন্যদের মধ্যে ভীরুতা ও পলায়নপ্রবণতা সৃষ্টি করার কাজে সফল হয় আলীর লোকেরা। শৃংখলা হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তারা। নীল নদের কূলে এই বাহিনীটির যে পরিণতি ঘটে, তা নিতান্ত-ই করুণ।

আরব থেকে বাহিনী আগমনের সংবাদ গুজব ছিলো না। সত্যি সত্যি-ই একদিন এসে পৌঁছে নুরুদ্দীন জঙ্গীর একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী। সংখ্যায় তারা বেশী নয়। ঐতিহাসিকদের কারো মতে দু' হাজার অশ্বারোহী ও দু' হাজার পদাতিক। মোট চার হাজার। কারো কারো মতে আরো কিছু বেশী। সে যাই হোক, এই বাহিনী সুলতান আইউবীর অনেক উপকারে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীটির নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন সুলতান।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী এই আরব বাহিনী এবং নিজের বাহিনীর যৌথ অভিযান চালিয়ে সুদানীদের একজন একজন করে খুন করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি কৌশল অবলম্বন করেন। সুদানী কমাণ্ডারদের গ্রেফতার করেন এবং তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, এখন আর তাদের চূড়ান্ত পতন ছাড়া কোন পথ নেই। তবে আমি তোমাদের সমূলে বিনাশ করবো না। সুলতানের শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলো কমাণ্ডাররা। সুলতান আইউবী তাদের ক্ষমা করে দেন এবং শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে সুদানীদের বেঁচে যাওয়া সৈনিকদের কৃষি-কর্মে পুনর্বাসিত করেন। তাদেরকে জমি দান করেন এবং চাষাবাদের জন্য সরকারী সহযোগিতা প্রদান করেন। তারপর তাদের অনুমতি প্রদান করেন, তোমাদের কেউ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে চাইলে হতে পারো।

এমনি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে সুদানীদের দমন করে সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনী এবং নিজের বাহিনীকে একত্রিত করে ওফাদার সুদানীদেরও তাদের সঙ্গে যুক্ত করে একটি সুশৃংখল শক্তিশালী বাহিনীর রূপ প্রদান করেন এবং খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে শুরু করেন। আলী বিন সুফিয়ানকেও তার বিভাগকে পুনর্বিন্যস্ত করার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড আরো জোরদার করে চলেছে খৃষ্টানরা।

# সাইফুল্লাহ্

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যুগের ঐতিহাসিকদের রচনাবলীতে সাইফুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, 'কেউ যদি সুলতান আইউবীর উপাসনা করে থাকে, তাহলে সে ছিলো সাইফুল্লাহ্'। সুলতান আইউবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ডান হাত বলে খ্যাত বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ডাইরীতে– যা আজো আরবী ভাষায় সংরক্ষিত আছে– সাইফুল্লাহ'র বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কোন ইতিহাস গ্রন্থে এ লোকটির আলোচনা পাওয়া যায় না।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ডাইরীর ভাষ্যমতে সাইফুল্লাহ নামের এ লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ওফাতের পর সতের বছর জীবিত ছিলো। জীবনের এই শেষ সতেরটি বছর অতিবাহিত করেছিলো সে সুলতান আইউবীর কবরের পার্শ্বে। লোকটি অসিয়ত করেছিলো, মৃত্যুর পর যেন তাকে সুলতান আইউবীর পার্শ্বে দাফন করা হয়। কিন্তু সাইফুল্লাহ ছিলো একজন সাধারণ মানুষ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন বিশেষত্ব ছিলো না। তাই মৃত্যুর পর তাকে সাধারণ গোরস্তানেই দাফন করা হয়। অল্প ক'দিন পর-ই তার সমাধি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; মানুষ তার কবরের উপর ঘর তুলে বসবাস শুরু করে।

রোম উপসাগরের ওপার থেকে সালাহুদ্দীন আঁইউবীকে হত্যা করতে এসেছিলো সাইফুল্লাহ। তখন তার নাম ছিলো মিগনানা মারিউঁস। ইসলামের নামটাই শুধু শুনেছিলো সে। তার জানা ছিলো না ইসলামের আসল পরিচয়। ক্রুসেডারদের প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত মিগনানা মারিউসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, ইসলাম একটি ঘৃণ্য ধর্ম, মুসলমানরা নারীলোলুপ ও নরখাদক এক হিংস্র জাতি। তাই 'মুসলমান' শব্দটি কানে আসা মাত্র ঘৃণায় থু থু ফেলতো মিগনানা মারিউস। কিন্তু পরম সাহসিকতা প্রদর্শন করে সালাহুদ্দীন আইউবী পর্যন্ত পৌছার পর মৃত্যু হয়ে গেলো মিগনানা মারিউসের। তার নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিলো সাইফুল্লাহ্।

ইতিহাসের পাতায় এমন রাষ্ট্রনায়কদের সংখ্যা কম নয়, যারা শত্রুর হাতে যারা জীবন দিয়েছিলেন কিংবা আত্মঘাতী আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ইতিহাসের সেই গুটিকতক ব্যক্তিত্বের একজন, যাদেরকে বারবার হত্যা করার চেষ্টা যেমন করেছে শত্রুরা, তেমন করেছে মিত্ররাও। সুলতান আইউবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শত্রুদের তুলনায় বেশী করেছে মিত্ররা। তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতে গেলে একজন ঈমানদীপ্ত জানবাজ মুমিনের পাশাপাশি একদল বে-ঈমান গাদ্দারের নিদারুণ কাহিনীও উল্লেখ করতে হয় সমান তালে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। তাই সালাহুদ্দীন আইউবী বলতেন— 'অদূর ভবিষ্যতে ইতিহাস এমন একটি সময় প্রত্যক্ষ করবে, যখন পৃথিবীর বুকে মুসলমান থাকবে ঠিক; কিন্তু ঈমান তাদের বিক্রি হয়ে থাকবে কাফিরদের হাতে, তাদের উপর শাসন করবে খৃষ্টানরা।'

আমরা এখন ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকাল প্রত্যক্ষ করছি।

সালাহুদ্দীন আইউবী যখন ক্রুসেডারদের সম্মিলিত নৌ-বহরকে রোম উপসাগরে আগুনে পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সাইফুল্লাহ'র কাহিনী শুরু হয় তখন থেকে। আইউবীর আক্রমণ থেকে ক্রুসেডারদের কয়েকটি জাহাজ রক্ষা পেয়েছিলো। সাগরতীরে নিজ বাহিনীর সঙ্গে উপস্থিত থেকে সালাহুদ্দীন আইউবী সেই জীবন্ত রক্ষা পাওয়া ক্রুসেডারদের গ্রেফতার করতে থাকেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলো সাতটি মেয়ে, যাদের বিস্তারিত কাহিনী ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

মিসরে বিদ্রোহ করেছিলো সুদানী বাহিনী। সেই বিদ্রোহ দমন করে ফেলেন সুলতান। অপরদিকে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীও এসে পৌঁছে তাঁর নিকট। এবার ক্রুসেডারদের প্রতিরোধ-পরিকল্পনা তৈরিতে মগ্ন হয়ে পড়েন তিনি।

রোম উপসাগরের ওপারে শহরের উপকণ্ঠে এক নিভৃত অঞ্চলে বৈঠক বসেছে খৃষ্টান কর্মকর্তাদের। শাহ অগাস্টাস, শাহ রেমান্ড, শাহেনশাহ সপ্তম লুই-এর ভাই রবার্টও সভায় উপস্থিত। পরাজয়ের গ্লানিতে বিমর্ষ সকলের মুখমণ্ডল। আলোচনা চলছে। এ সময়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করে এক ব্যক্তি। নাম এম্লার্ক। ক্ষোভে-দুঃখে আগুনের ফুল্‌কি বেরুচ্ছে যেন তার দু' চোখ থেকে। খৃষ্টানদের যে সম্মিলিত নৌ-বহরকে মিসর আক্রমণে প্রেরণ করা হয়েছিলো, এম্লার্ক ছিলো তার কমাণ্ডার। কিন্তু আকস্মিক ঝড়ের ন্যায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন সালাহুদ্দীন আইউবী। বহরের একজন সৈনিককেও সমুদ্র থেকে কূলে পা

রাখতে দিলেন না তিনি। মিসরের মাটিতে পা রাখতে সক্ষম হয়েছিলো যেসব খৃষ্টসেনা, আইউবীর হাতে যুদ্ধ-বন্দীতে পরিণত হয় তারা।

সভাকক্ষে বসে আছে এম্লার্ক। ক্ষোভে থর্ থর্ করে কাঁপছে তার ওষ্ঠাধর। তার বহর ডুবে মরেছে আজ পনের দিন হলো। ভাসতে ভাসতে আজ-ই ইটালীর কূলে এসে পৌঁছেছে সে। সালাহুদ্দীন আইউবীর অগ্নিতীর নিক্ষেপকারী বাহিনী পাল-মাস্তুল জ্বালিয়ে দিয়েছে তার জাহাজের। ভাগ্যক্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে প্রথমবারের মত জাহাজটিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় তার নাবিক-সৈনিকেরা। পালবিহীন জাহাজ হেলে-দুলে ভাসতে থাকে মাঝ দরিয়ায়।

এক সময়ে দিক-চক্রবাল আচ্ছন্ন করে আকাশে জেগে উঠে ঘোর কালো মেঘ। শুরু হয় প্রবল ঝড়। ঝড়ের কবলে পড়ে অসংখ্য শিশু-কিশোর-নারীসহ পানির নীচে তলিয়ে যায় এম্লার্কের জাহাজটি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় এম্লার্ক। প্রাণ নিয়ে পৌঁছে যায় ইটালীর তীরে।

বৈঠক চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, খৃষ্টান বাহিনীকে এত বড় ধোঁকা কে দিলো? কার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে এত শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হলো তাদের? সংশয় ব্যক্ত করা হয় সুদানী সালার নাজির উপর। তার-ই পত্রের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিলো এ নৌ-অভিযান। নাজির সঙ্গে খৃষ্টানদের পত্র-যোগাযোগ চলছিলো পূর্ব থেকেই। এ যাবৎ বেশ ক'টি পত্র দিয়েছে সে খৃষ্টানদের। খৃষ্টানরা নাজির সর্বশেষ যে পত্রটির উপর ভিত্তি করে এ অভিযানে নেমেছিলো, পূর্বের পত্রগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলো সেটি। কিছুটা অমিল পাওয়া গেলো। নাজির প্রতি সন্দেহ আরো গাঢ় হলো। কায়রোতে গুপ্তচরও ঢুকিয়ে রেখেছিলো তারা। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকেও কোন সংবাদ পায়নি খৃষ্টানরা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে বিশ্বাসঘাতক নাজি ও কুচক্রী সালারদের গোপনে হত্যা করে রাতের আঁধারে মাটিচাপা দিয়ে রেখেছেন, সে সংবাদ খৃষ্টানদের কানে পৌঁছানোর ছিলো না কেউ। খৃষ্টানদের সম্রাট-কর্মকর্তাগণ কল্পনাও করতে পারেননি, যে পত্রের উপর ভিত্তি করে তারা মিসর অভিমুখে নৌ-বহর প্রেরণ করেছিলেন, সে পত্রখানা নাজিরই ছিলো বটে; কিন্তু তার আক্রমণের তারিখ পরিবর্তন করে অন্য তারিখ লিখে দিয়েছিলেন সুলতান আইউবী। এসব তথ্য সংগ্রহ করা ছিলো খৃষ্টান গোয়েন্দাদের সাধ্যের বাইরে।

দীর্ঘ আলাপ-পর্যালোচনার পরেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলো না এ বৈঠক। কথা সরছে না এম্লার্কের মুখ থেকে। পরাজয়ের গ্লানিতে লোকটি যেমন ক্ষুব্ধ, তেমনি ক্লান্ত। পরদিনের জন্য মুলতবী করে দেয়া হয় বৈঠক।

রাতের বেলা। মদের আসর জমে উঠেছে খৃষ্টান কর্মকর্তাদের। নেশায় বুঁদ হয়ে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চাইছে তারা। হঠাৎ সে আসরে আগমন ঘটে এক ব্যক্তির। রেমন্ড ছাড়া কেউ চেনে না তাকে।

লোকটি রেমন্ডের নির্ভরযোগ্য গুপ্তচর। হামলার দিন সন্ধ্যায় মিসরের তীরে এসে নেমেছিলো সে। তার-ই খানিক পর এসে পৌঁছে ক্রুসেডারদের নৌ-বহর। বহরটি সালাহুদ্দীন আইউবীর ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়েছিলো তার-ই চোখের সামনে।

বেশ কিছু তথ্য নিয়ে এসেছে লোকটি। রেমন্ড সকলের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয় তাকে। রিপোর্ট জানবার জন্য তাকে ঘিরে ধরে সবাই। খৃষ্টান কর্মকর্তাগণ সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার জন্য রবিন নামক এক সুশিক্ষিত অভিজ্ঞ গুপ্তচরকে সমুদ্রোপকূলে প্রেরণ করেছিলো এবং তার সঙ্গে পাঁচজন পুরুষ ও সাতটি রূপসী যুবতীকে প্রেরণ করেছিলো, এ গুপ্তচর তাদের সম্পর্কে অবহিত।

আগন্তুক জানায়— 'রবিন জখমের বাহানা দেখিয়ে আহতদের সঙ্গে সালাহুদ্দীন আইউবীর ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিলো। তার পাঁচ পুরুষ সঙ্গী ছিলো বণিকের বেশে। তাদের একজন– ক্রিস্টোফর যার নাম– নেপথ্য থেকে তীর ছুঁড়ে আইউবীর গায়ে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তার তীর। ধরা পড়ে যায় পাঁচজনের সকলে। মেয়ে সাতটিকেও ধরে ফেলেন আইউবী। বেশ চমৎকার কাহিনী গড়ে নিয়েছিলো মেয়েরা। আইউবীকে শোনায় সে কাহিনী। মেয়েগুলোকে আশ্রয়ে রেখে পুরুষ পাঁচজনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আইউবী। কিন্তু তাঁর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান হঠাৎ এসে পড়ে গ্রেফতার করে ফেলেন তাদেরকে। পাঁচজনের একজনকে সকলের সামনে হত্যা করে অন্যদের থেকে কথা আদায় করেন তিনি।'

গোয়েন্দা আরো জানায়, ধরা পড়ি আমিও। আইউবীর নিকট আমি নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেই। তাই তিনি আমার উপর আহতদের ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই সুযোগে আমি জানতে পারলাম, সুদানীরা বিদ্রোহ করেছিলো বটে; কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী সে বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে ফেলেন। তিনি বিদ্রোহী অফিসার ও নেতাদের গ্রেফতার করেন।

রবিন, তার সহযোগী চার পুরুষ ও মেয়ে ছয়টি এখন আইউবীর হাতে বন্দী। তবে সপ্তম মেয়েটির– যে ছিলো সবচেয়ে বেশী বিচক্ষণ– তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিখোঁজ মেয়েটির নাম মুবিনা এরতেলাস, সংক্ষেপে মুবী।

গোয়েন্দা জানায়, বন্দী রবিন ও তার সহকর্মীরা এখনো উপকূলীয় শিবিরেই রয়েছে। আইউবী ক্যাম্পে নেই। তাঁর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ানও অনুপস্থিত। আমি বড় কষ্টে ওখান থেকে বের হয়ে এসেছি। ঘাটে এসে একটি নৌকা পেয়ে গেলাম। দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে দ্রুত নদী পার হয়ে চলে আসি। রবিন ও তার সহকর্মী পুরুষ ও মেয়েরা মৃত্যুমুখে পতিত। পুরুষদের চিন্তা না হয় না-ই করলাম; কিন্তু মেয়েগুলোকে উদ্ধার করা তো একান্ত আবশ্যক। ওরা সকলেই যুবতী এবং আমাদের বাছা বাছা রূপসী মেয়ে। উদ্ধার করতে না পারলে মুসলমানরা ওদের কী দশা ঘটাবে, তাতো আপনারা বুঝতে-ই পারছেন।'

'এ ত্যাগ আমাদের দিতে-ই হবে।' বললেন অগাস্টাস।

'আপনি যদি আমাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, সালাহুদ্দীন আইউবী আমাদের মেয়েদেরকে প্রাণে শেষ করে-ই ক্ষান্ত হবে; অন্য কোন নির্যাতনের শিকার তাদের হতে হবে না, তাহলে এ ত্যাগ স্বীকার করতে আমিও প্রস্তুত। কিন্তু এমনটি আশা করা বৃথা; মুসলমানরা ওদের সঙ্গে পশুর মত আচরণ করবে আর তাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মেয়েগুলো আমাদেরকে অভিসম্পাত করবে। আমি তাদেরকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করবো।' বললেন রেমন্ড।

'এমনও হতে পারে, মুসলমানরা মেয়েগুলোর সঙ্গে ভাল আচরণ দেখিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহার করবে। তখন আমাদের মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণে ওদেরকে মুক্ত করে আনা একান্ত আবশ্যক। এর জন্য আমি আমার ভাণ্ডারের অর্ধেক সম্পদও উজাড় করতে প্রস্তুত আছি।' বললেন রবার্ট।

'আমাদের এ মেয়েগুলো শুধু এ কারণে-ই মূল্যবান নয় যে, এরা নারী। এরা প্রশিক্ষিত গুপ্তচর। এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এদের মত মেয়ে আর পাবো কোথায়? এমন মেয়ে আমরা কোথায় পাবো, যারা জাতি ও ধর্মের স্বার্থে– ক্রুশের স্বার্থে নিজেকে দুশমনের হাতে তুলে দেবে, দুশমনের ভোগ-বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হবে এবং গুপ্তচরবৃত্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকবে? এ মিশনে তাদের সর্বপ্রথম বিলাতে হয় সম্ভ্রম। তদুপরি গুপ্তচর হিসেবে ধরা পড়ে গেলে কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন হারাবার ভয় থাকে পদে পদে। এ মেয়েগুলোকে আমাদের বিপুল অর্থের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছে। তারপর প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় কষ্টে মিসর ও আরবের ভাষা শেখানো হয়েছে। আমি মনে করি, এভাবে একত্রে সাতটি মেয়ে হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।' বললো আগন্তুক গোয়েন্দা।

'আচ্ছা, তুমি কি নিশ্চয়তা দিতে পারো, মেয়েগুলোকে আইউবীর ক্যাম্প থেকে বের করে আনা যাবে?' জিজ্ঞেস করেন অগাস্টাস।

'যাবে। এর জন্য প্রয়োজন বেশ ক'জন দুঃসাহসী সৈন্য। তবে হয়ত দু'-একদিনের মধ্যে রবিন এবং তার সহকর্মী পুরুষ ও মেয়েদেরকে কায়রো নিয়ে যাওয়া হবে। তা-ই যদি হয়, তবে সেখান থেকে তাদেরকে বের করে আনা কঠিন হবে। সময় নষ্ট না করে উপকূলীয় ক্যাম্প থেকে-ই তাদেরকে মুক্ত করে আনা দরকার। আপনি বিশজন লোক দিন; আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু তারা হতে হবে এমন লোক, যারা জীবন নিয়ে খেলতে জানে।' বললো গোয়েন্দা।

'যে কোন মূল্যে মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে আনা দরকার।' গর্জে উঠে বললো এম্লার্ক।

খৃষ্টান বাহিনী রোম উপসাগরে যে শোচনীয় পরাজয় ও মর্মান্তিক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিলো, তার প্রতিশোধ-স্পৃহায় পাগলের মতো হয়ে গেছে এম্লার্ক। লোকটি ক্রুসেডারদের সম্মিলিত নৌ-বহর এবং তার আরোহী সৈন্যদের সুপ্রীম কমাণ্ডার হয়ে এ আশা বুকে নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিলো যে, মিসর দখলের পর জয়-মাল্য তার-ই গলায় ঝুলবে। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী মিসরের তীরে-ই ঘেঁষতে দিলেন না তাকে। বেচারা জ্বলন্ত জাহাজে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েও পড়ে গেলো ঝড়ের কবলে। সেখান থেকে বেঁচে এসেছে মরতে মরতে। এখন কথা বলতে ঠোঁট কাঁপছে তার। কথায় কথায় টেবিল চাপড়িয়ে, নিজের উরুতে হাত মেরে মনের জ্বালা প্রশমিত করছে লোকটি। অবশেষে বললো–

'আমি মেয়েগুলোকেও মুক্ত করে আনবো, আইউবীকেও হত্যা করাবো। উদ্ধার করে এনে এ মেয়েগুলোকে মুসলমানদের সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটনে ব্যবহার করবো।'

'আমি মনে-প্রাণে তোমাকে সমর্থন করি এম্লার্ক! এমন সুশিক্ষিত মেয়েদেরকে আমিও এত সহজে নষ্ট হতে দিতে চাই না। আপনাদের সকলের-ই জানা আছে, সিরিয়ার হেরেমগুলোতে আমরা কি পরিমাণ মেয়ে ঢুকিয়ে রেখেছি। বেশ ক'জন মুসলমান গভর্নর ও আমীর তাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। বাগদাদে আমাদের মেয়েরা আমীরদের হাতে এমন বেশ ক'জন লোককে হত্যা করিয়েছে, যারা ক্রুসেডের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলেছিলো। নারী আর মদ দিয়ে মুসলমানদের

খেলাফতকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছি, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছি। খেলাফত এখন ত্রিধাবিভক্ত। আমোদ-বিলাসিতায় ডুবে যেতে শুরু করেছেন খলীফারা। অবশিষ্ট আছে শুধু দু'টি লোক। যদি তারা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে, তাহলে তারা আমাদের জন্য স্বতন্ত্র এক বিপদ হয়ে থাকবে। একজন সালাহুদ্দীন আইউবী, অপরজন নুরুদ্দীন জঙ্গী। এদের একজনও যদি বেঁচে থাকে, তাহলে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী যদি সুদানীদের বিদ্রোহ দমন করে-ই থাকে, তাহলে তার অর্থ হলো, লোকটি আমাদের ধারণা অপেক্ষাও বেশী ভয়ঙ্কর। তার বিরুদ্ধে ময়দানে মোকাবেলা করার পাশাপাশি নাশকতামূলক কার্যক্রমও আমাদের চালু করতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ-দলাদলি এবং অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মেয়েগুলোকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন।' বললেন রেমন্ড।

'আমাদের সকল অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। আমরা আরবে মুসলমানদের দুর্বলতা থেকে স্বার্থ উদ্ধার করেছি। মুসলমান নারী, মদ আর ঐশ্বর্য পেলে অন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের নিঃশেষ করার উত্তম পন্থা হলো, এক মুসলমান দিয়ে আরেক মুসলমানকে হত্যা করানো। হাতে ক'টি টাকা গুজে দাও, দেখবে, অর্থের লোভে তারা তাদের সাধের দ্বীন ও ঈমান ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। চেষ্টা করলে তোমরা অতি অনায়াসে মুসলমানের ঈমান ক্রয় করতে পারো।' বললেন রবার্ট।

মুসলমানদের দুর্বলতা নিয়ে আলাপ চলে দীর্ঘক্ষণ। তারপর বন্দী মেয়েদের মুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে কথা ওঠে। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, বিশজন দুঃসাহসী সেনা প্রেরণ করা হবে এ কাজে। আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত রওনা হয়ে যাবে তারা।

তৎক্ষণাৎ তলব করা হয় চারজন কমাণ্ডার। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তাদের বলা হলো, তোমাদের সহযোগিতার জন্য বিশজন সৈনিক বেছে নাও।

আলোচনায় বসে চার কমাণ্ডার। এ অভিযানে তারা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়। এক কমাণ্ডার বললো, 'আমাদের এমন একটি ফোর্স গঠন করতে হবে, যারা মুসলমানদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে কমাণ্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে এবং রাতে তাদের পেট্রোল বাহিনীর উপর হামলা করে তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। এ ফোর্সের জন্য দক্ষ ও বিচক্ষণ লোক বেছে নিতে হবে।'

'কিন্তু তারা হতে হবে শতভাগ বিশ্বস্ত। এ ফোর্স আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে অভিযান পরিচালনা করবে। এমনও হতে পারে, তারা কিছু-ই না করে ফিরে এসে শোনাবে আমরা অনেক কিছু করে এসেছি।' বললেন অগাস্টাস।

এক কমাণ্ডার বললো, আপনি শুনে অবাক হবেন, আমাদের বাহিনীতে এমন কিছু সৈনিক আছে, যাদেরকে আমরা বিভিন্ন কারাগার থেকে এনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেছি। তাদের কেউ ছিলো ডাকাত, কেউ সন্ত্রাসী, কেউবা ছিলো ছিনতাইকারী। তারা দীর্ঘ মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী ছিলো। ওরা কারাগারের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে-ই ধুঁকে ধুঁকে মরতো। আমাদের প্রস্তাব পেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। শুনলে হয়তো আপনি বিস্মিত হবেন, আমাদের ব্যর্থ নৌ-অভিযানে এই সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী সৈনিকরা বড় বীরত্বের সাথে আইউবীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে কয়েকটি জাহাজকে রক্ষা করেছে। বন্দী মেয়েদেরকে মুক্ত করার অভিযানে আমি এদের তিনজনকে প্রেরণ করবো।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন— 'মুসলমানদের মধ্যে বিলাস-প্রিয়তা বেড়ে যায় এবং তাদের ঐক্য নিঃশেষ হতে শুরু করে। মুসলমানের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য খৃষ্টানরা তাদের ঘরে ঘরে বিলাস-সামগ্রী ঢুকিয়ে দিতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তাদের মনে আশা জাগে, আর এক ধাক্কায়-ই তারা মুসলমানদের ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হবে। এবার খৃষ্টানরা বিশ্বময় ইসলাম ও মুসলিম-বিরোধী ঘৃণা ছড়াতে শুরু করে এবং সকলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। জবাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ খৃষ্টান বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করে। পাদ্রী থেকে আরম্ভ করে পেশাদার অপরাধীরা পর্যন্ত পঙ্কিল পথ ত্যাগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। যেসব সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী দীর্ঘমেয়াদী সাজা ভোগ করছিলো, বিভিন্ন কারাগার থেকে এনে তাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়। এ কয়েদীদের প্রতি খৃষ্টানদের বেশ আস্থা ছিলো। যার কারণে আইউবীর বন্দীদশা থেকে মেয়েদের মুক্ত করা এবং আইউবীকে হত্যা করার জন্য এক কমাণ্ডার কয়েদী সৈনিকদের নির্বাচন করেছিলো।'

সকাল পর্যন্ত অতীব দুঃসাহসী ও বিচক্ষণ বিশজন সৈনিক বেছে নেয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। মিগনানা মারিউসও ছিলো তাদের একজন, যাকে বের করে আনা হয়েছিলো রোমের একটি কারাগার থেকে। যে গোয়েন্দা লোকটি ডাক্তার বেশে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে ছিলো এবং তথ্য সংগ্রহ করে পালিয়ে এসেছিলো, অভিযানের কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো তাকে।

এ বাহিনীর প্রথম দায়িত্ব হলো, মেয়েগুলোকে মুসলমানদের বন্দীদশা থেকে বের করে আনা এবং সম্ভব হলে রবিন ও তার চার সহকর্মীকেও মুক্ত করা। সহজে সম্ভব না হলে রবিনদের জন্য ঝুঁকি নিতে নিষেধ করে দেয়া হয় তাদের। দ্বিতীয় দায়িত্ব, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করা।

এ বাহিনীটিকে নতুন করে প্রাকটিক্যাল কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি; শুধু মৌখিক জরুরী নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি দিয়ে একটি পালতোলা নৌকায় করে মৎস-শিকারীর বেশে রওয়ানা করান হয় সে দিন-ই।

যে সময়ে এ নৌকাটি ইতালীর সমুদ্রতীর থেকে পাল তুলে রওনা হয়, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ততক্ষণে সুদানীদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করে ফেলেছেন। অনেক সুদানী কমাণ্ডার তাঁর বাহিনীর হাতে মারা গেছে, আহত হয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে অনেকে। অনেকে আবার দাঁড়িয়ে আছে গভর্নর হাউজের সম্মুখের চত্বরে। অস্ত্র ত্যাগ করে সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নিয়েছে তারা। এখন তারা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

হাউজের ভেতরে বসে সালারদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সুলতান। আলী বিন সুফিয়ানও তাঁর সামনে উপবিষ্ট। হঠাৎ সুলতান আইউবীর একটি বিষয় মনে পড়ে যায়। আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে বললেন— 'আলী! গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দা মেয়েগুলো এবং তাদের সঙ্গীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা তো ভুলেই গেলাম! এখনো তো ওরা সমুদ্রোপকূলীয় কয়েদী ক্যাম্পে-ই রয়েছে। তুমি এক্ষুনি তাদেরকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো এবং পাতাল কক্ষে ফেলে রাখো।'

'ঠিক আছে, এক্ষুনি নির্দেশ পাঠিয়ে আমি তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি সুলতান! আর সপ্তম মেয়েটির কথা বোধ হয় আপনি ভুলে গেছেন। মেয়েটি বালিয়ান নামক এক সুদানী কমাণ্ডারের নিকট ছিলো। কিন্তু বালিয়ান হাউজের বাইরে দণ্ডায়মান আত্মসমর্পণকারী কমাণ্ডারদের মধ্যেও নেই। আহতদের মধ্যেও নেই, নেই নিহতদের মধ্যেও। আমার সন্দেহ হচ্ছে, গোয়েন্দা মেয়েদের সপ্তম মেয়েটি– যার নাম মুবী– বালিয়ানের সঙ্গে কোথাও আত্মগোপন করে আছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'ঠিক আছে, তোমার সন্দেহ দূর করুন আলী! আপাতত এখানে আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই। বালিয়ান যদি নিখোঁজ-ই হয়ে থাকে, তাহলে বেটা রোম

উপসাগরের দিকেই পালিয়ে থাকবে। খৃষ্টানদের ছাড়া তাকে আর আশ্রয় দেবে কে। এখানে নিয়ে এসে তুমি গোয়েন্দাদের পাতাল কক্ষে আটকে রাখো এবং এক্ষুনি সমুদ্রোপকূল অভিমুখে গুপ্তচর প্রেরণ করো।' বললেন সুলতান আইউবী।

'মহামান্য সুলতান! আমার তো মনে হয়, আমাদের গুপ্তচরদেরকে নিজেদের-ই দেশে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।' পরামর্শ দেন সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীর সালার। তিনি আরো বললেন–

'খৃষ্টানদের দিক থেকে আমাদের ততো আশঙ্কা নেই, যতো আশঙ্কা আমাদের-ই মুসলিম আমীরদের পক্ষ থেকে। আমাদের গুপ্তচরদেরকে তাদের হেরেমে ঢুকিয়ে দিন, দেখবেন, বহু অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে, ফাঁস হয়ে যাবে অনেক ষড়যন্ত্র।' এ বলে তিনি এই স্বঘোষিত শাসকরা কিভাবে খৃষ্টানদের হাতে ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন এবং বলেন, সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী অনেক সময় ভেবে অস্থির হয়ে যান— 'কোন্‌টা করবো? বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করবো, নাকি নিজ গৃহকে নিজের-ই প্রদীপের আগুন থেকে রক্ষা করবো!'

জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনীর এ সালারের বক্তব্য গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন আইউবী। বললেন— 'যদি তোমরা অর্থাৎ যাদের কাছে অস্ত্র আছে, যদি তারা দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান থাকতে পারো, একনিষ্ঠভাবে যদি তোমরা ইসলাম, দেশ ও জাতির জন্য কাজ করে যাও, তাহলে বাইরের আক্রমণ আর ভিতরের ষড়যন্ত্র কোনটি-ই জাতির এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা দৃষ্টিকে প্রসারিত করো, সীমান্ত ছাড়িয়ে দৃষ্টিকে নিয়ে যাও আরো অনেক দূরে– বহু দূরে। মনে রেখো, সালতানাতে ইসলামিয়ার কোন সীমান্ত নেই। যেদিন তোমরা নিজেদেরকে এবং আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামকে সীমান্তের বেড়ায় আটকে ফেলবে, সেদিন থেকে-ই তোমরা নিজেদের-ই কারাগারে বন্দী হয়ে যাবে। আর ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকবে তোমাদের তূনীরের সীমানা। রোম উপসাগর অতিক্রম করে তোমরা আরো দূরে দৃষ্টি ফেলো। সমুদ্র রোধ করতে পারবে না তোমাদের পথ। আর ঘরের আগুনকে ভয় করো না। আমাদের এক ফুৎকারে নিভে যাবে ষড়যন্ত্রের সব মশাল। তার স্থানে আমরা ঈমানের আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত করবো।'

'আমরা আশাবাদী যে, আমরা বে-ঈমানদের প্রতিহত করতে পারবো মুহতারাম সুলতান! আমরা নিরাশ নই।' বললেন সালার।

'মাত্র দু'টি অভিশাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো আমার প্রিয় বন্ধুগণ! এক. নৈরাশ্য। দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা। মানুষ প্রথমে নিরাশ হয়। তারপর বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতার আশ্রয়ে পালাবার পথ খুঁজে।' বললেন সুলতান আইউবী।

ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছেন আলী বিন সুফিয়ান। তৎক্ষণাৎ তিনি রোম উপসাগরের ক্যাম্প অভিমুখে এ পয়গাম দিয়ে দূতকে রওয়া করিয়ে দেন যে, রবিন, তার চার সহযোগী এবং মেয়েদেরকে ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে চড়িয়ে বিশজন রক্ষীর প্রহরায় রাজধানীতে পাঠিয়ে দাও।

দূতকে রওনা করিয়ে-ই আলী বিন সুফিয়ান ছয়-সাতজন সিপাহী নিয়ে কমান্ডার বালিয়ানের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তার আগে বাইরে দণ্ডায়মান সুদানী কমাণ্ডারদের নিকট বালিয়ান সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা জানিয়েছিলো, লড়াইয়ের সময় তাকে কোথাও দেখা যায়নি এবং সুলতানের বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য যে বাহিনীটিকে রোম উপসাগরের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিলো, বালিয়ান তাদের সঙ্গেও যায়নি।

বালিয়ানের ঘরে যান আলী বিন সুফিয়ান। দু'জন বৃদ্ধা চাকরানী ছাড়া আর কাউকে পেলেন না সেখানে। চাকরানীরা জানায়, বালিয়ানের ঘরে পাঁচটি মেয়ে ছিলো। তার নিয়ম ছিলো, যখন-ই কোন মেয়ের বয়স একটু বেড়ে যেতো, তাকে হাওয়া করে ফেলতো এবং তার স্থলে আসতো নতুন এক টগবগে যুবতী। তারা আরো জানায়, বিদ্রোহের আগে বালিয়ানের ঘরে একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে এসেছিলো। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি বিচক্ষণ। দু'দিন যেতে না যেতে বালিয়ান মেয়েটির গোলাম হয়ে গিয়েছিলো। বিদ্রোহের একদিন পরে যেদিন সুদানীরা অস্ত্রসমর্পণ করে, সেদিন রাতে বালিয়ান নিজে একটি ঘোড়ায় চড়ে এবং সেই ফিরিঙ্গী মেয়েটিকে অপর একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে অজানার উদ্দেশ্যে উধাও হয়ে যায়। সাতজন অশ্বারোহীও ছিলো তার সঙ্গে। হেরেমের মেয়েদের ব্যাপারে বৃদ্ধারা জানায়, যে যা হাতে পেয়েছে, তুলে নিয়ে সবাই চলে গেছে।

ফিরে আসেন আলী বিন সুফিয়ান। হঠাৎ একটি ঘোড়া দ্রুত ছুটে এসে থেমে যায় তাঁর সামনে। ফখরুল মিসরী তার আরোহী। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নীচে নামে সে। হাঁফাতে হাঁফাতে কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'আমিও আপনার-ই ন্যায় নরাধম বালিয়ান ও কাফির মেয়েটিকে খুঁজছি। আমি তার থেকে প্রতিশোধ নেবো। এদের দু'জনকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না। আমি জানি, সে কোন্ দিক গেছে। আমি তাকে ধাওয়াও করেছি। কিন্তু সঙ্গে তার

সাতজন সশস্ত্র রক্ষী। আমি ছিলাম একা। রোম উপসাগরের দিকে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু যাচ্ছে সে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে।'

আলী বিন সুফিয়ানের হাত চেপে ধরে ফখরুল মিসরী বললো, 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি আমায় চারজন সিপাহী দিন; ধাওয়া করে আমি ওকে শেষ করে আসি।'

আলী বিন সুফিয়ান তাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, চারজন নয়, আমি তোমাকে বিশজন সিপাহী দেবো। এখনো সে উপকূল অতিক্রম করতে পারেনি। তুমি আমার সঙ্গে চলো। বালিয়ান কোন্দিক গেলো সে ব্যাপারে নিশ্চিত হন আলী বিন সুফিয়ান।

মুবীকে নিয়ে বালিয়ান উপকূল অভিমুখে বহুদূর এগিয়ে গেছে। উপকূলগামী সাধারণ পথ ছেড়ে অন্য পথে এগুচ্ছে সে। এসব অঞ্চল-পথ-ঘাট বালিয়ানের চেনা। তাই নির্বিঘ্নে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে সে।

কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী যে আত্মসমর্পণকারী সুদানী সৈন্য ও কমাণ্ডারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, বালিয়ান তা জানে না। বালিয়ান পালাচ্ছে দু'টি কারণে। প্রথমত তার আশঙ্কা, ধরা পড়লে সুলতান আইউবী তাকে খুন করে ফেলবেন। দ্বিতীয়ত মুবীর ন্যায় রূপসী মেয়েকে হাতছাড়া করতে চাইছে না সে। যে কোন মূল্যে নিজেরও জীবন রক্ষা করতে হবে এবং মুবীকেও হাতে রাখতে হবে, এই তার প্রত্যয়। বালিয়ান মনে করতো, জগতের রূপসী মেয়েরা শুধু মিসর আর সুদানে-ই জন্মায়। কিন্তু ইতালীর এই ফিরিঙ্গী মেয়েটির চোখ-ধাঁধানো রূপ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো। মুবীর জন্য নিজের মান-সম্মান, দ্বীন-ধর্ম ও দেশ-জাতি সব বিসর্জন দিয়েছে বালিয়ান। কিন্তু এখন মুবী যে তার থেকে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা করছে, তা বালিয়ানের অজানা। যে উদ্দেশ্যে মুবীর এ দেশে আগমন, তা নস্যাৎ হয়ে গেছে সব। তবে মুবী তার কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেনি বিন্দুমাত্র। লক্ষ্য অর্জনে নিজের দেহ ও সম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছে মেয়েটি। এখনো নিজের দ্বিগুণ বয়সী এক পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে আছে সে।

বালিয়ান এই আত্মতৃপ্তিতে বিভোর যে, মুবী তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তার প্রতি মুবীর প্রচণ্ড ঘৃণা। একাকী পালাতে পারছে না বলে বাধ্য হয়ে এখনো বালিয়ানের সঙ্গ দিচ্ছে মুবী। মনে তার একটি-ই ভাবনা, কী করে রোম উপসাগর পার হওয়া যায় কিংবা কিভাবে রবিনের নিকটে পৌঁছে যাওয়া যায়।

মুবী জানে না, রবিন এবং তার বণিকবেশী সঙ্গীরা এখন সুলতান আইউবীর হাতে বন্দী। মুবী বারবার বালিয়ানকে বলছে, দ্রুত চলো, পথে অবস্থান কম করো, অন্যথায় ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু বে-ঈমান নারীলোলুপ বালিয়ান কোথাও ছায়াঘেরা একটু জায়গা পেলে-ই থেমে যায়, বিশ্রামের নামে বসে পড়ে। তারপর মেতে উঠে মদ আর মুবীকে নিয়ে।

এক রাতে একটি কৌশল আঁটে মুবী। অতিরিক্ত মদপান করিয়ে অচেতন করে শুইয়ে রাখে বালিয়ানকে। রক্ষীরা শুয়ে পড়ে খানিকটা দূরে একটি গাছের আড়ালে। রক্ষীদের একজন বেশ টগবগে, সুঠাম সুদেহী এক বলিষ্ঠ যুবক। অত্যন্ত বিচক্ষণও বটে। পা টিপে টিপে ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে মুবী। হাতের ইশারায় নিয়ে যায় খানিক দূরে অন্য একটি গাছের আড়ালে। বলে, তুমি ভালো করেই জান, আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, কেন এসেছি। আমি তোমাদের জন্য সাহায্য নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর মতো একজন ভিনদেশী শাসকের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারো। কিন্তু তোমাদের এই কমাণ্ডার বালিয়ান এত বিলাস-প্রিয় লোক যে, মদপান করে মাতাল হয়ে সর্বক্ষণ আমার দেহটা নিয়েই খেলা করতে ভালবাসে। আমার সহযোগিতায় বুদ্ধিমত্তার সাথে বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিজয় অর্জনের চেষ্টা করার পরিবর্তে লোকটি আমাকে হেরেমের দাসী বানিয়ে রেখেছিলো। তারপর নির্বোধের মতো বাহিনীটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এমন বে-পরোয়াভাবে আক্রমণ করালো যে, এক রাতে-ই তোমাদের এত বিশাল বাহিনীটি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেলো!

তোমরা হয়তো জানো না, তোমাদের পরাজয়ের জন্য এ লোকটি-ই দায়ী। এখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে শুধু-ই ফুর্তি করার জন্য। আমাকে সে বলছে, আমি যেন তাকে সমুদ্রের ওপারে নিয়ে গিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীতে মর্যাদাসম্পন্ন একটি পদ দিই আর আমি তাকে বিয়ে করি। কিন্তু ওসব হবে না; আমি ওকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। আমি স্থির করেছি, আমার যদি বিয়ে করতে-ই হয়, নিজের দেশে নিয়ে যদি কাউকে দেশের সেনাবাহিনীতে মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দিতে-ই হয়, তবে তার জন্য আমার মনোঃপূত একজন লোক বেছে নিতে হবে। আর সে হলে তুমি। তুমি যুবক, সাহসী ও বুদ্ধিমান। প্রথমবার যখন আমি তোমাকে দেখেছি, তখন থেকেই আমার হৃদয়ে তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে আছে। তুমি এ বৃদ্ধের কবল থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি এখন তোমার। সমুদ্রের ওপারে চলো,

মর্যাদা, ধনৈশ্বর্য আর আমি সব তোমার পদচুম্বন করবে। কিন্তু তার জন্য আগে এ লোকটিকে এখানে-ই শেষ করে যেতে হবে। লোকটি অচেতন ঘুমিয়ে আছে; তুমি যাও, ওকে খুন করে আসো। তারপর চলো, রওনা হই।

রক্ষীর ঘাড়ে হাত রাখে মুবী। মুবীর রূপের মোহ-জালে আটকা পড়ে যায় রক্ষী। দু'বাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরে মেয়েটিকে। প্রেমের যাদু দিয়ে পুরুষ বশ করায় অভিজ্ঞ মুবী। পূর্বের অবস্থান থেকে সরে একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েটি। রক্ষীও অগ্রসর হয়ে হাত বাড়ায় তার প্রতি।

এমন সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে একটি বর্শা ছুটে এসে বিদ্ধ হয় রক্ষীর পিঠে। আহ! বলে চীৎকার করে ওঠে লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। দূর থেকে ছুটে আসে একজন। রক্ষীর পিঠ থেকে বর্শাটি টেনে বের করতে করতে বলে— 'বেটা নিমকহারাম, তোর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

চীৎকার দেয় মুবী। বলে, লোকটিকে তুমি খুন . ....... । এর বেশী বলতে পারলো না সে। পিছন থেকে অপর একজন তার বাহু ধরে ঝটকা এক টান দিয়ে ছুড়ে মারে বালিয়ানের দিকে। বলে, আমরা তার পোষ্য বন্ধু। আমাদের জীবন তার উপর নির্ভরশীল। তোমরা আমাদের কাউকে তার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। বিভ্রান্ত যে হয়েছে, সে তার প্রায়শ্চিত্ত পেয়ে গেছে।'

মদের নেশায় অচেতন পড়ে আছে বালিয়ান।

'তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমরা কোথায় যাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করে মুবী।

'যাচ্ছি সমুদ্রে ডুবে মরতে। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বালিয়ান যেখানে নিয়ে যায়, আমরা সেখানেই- যাবো।' এই বলে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ে তারা।

পরদিন বেশ বেলা হলে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় বালিয়ান। রক্ষীরা রাতের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে তাকে। মুবী বলে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো। বালিয়ান শাবাশ দেয় তার রক্ষীদের। কোন্ ঘটনায় নিজের একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক খুন হলো, তার জন্য কোন ভাবনা-ই জাগলো না তার মনে। মুবীর রূপ আর মদে বুঁদ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত হয়ে গেছে বালিয়ান। মুবী তাকে বলে, ওঠ, দ্রুত রওনা হও। কিন্তু বালিয়ানের কোন ভাবনা নেই। নিজেকে হারিয়ে-ই ফেলেছে যেন সে। মুবী ভাবে, এরা কতো নির্দয়, কতো নির্বোধ জাতি; সামান্য কারণে, হীন স্বার্থে আপন লোকদেরও হত্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়না!

আলী বিন সুফিয়ান কেন যেন বালিয়ানের পশ্চাদ্ধাবন না করে ফিরে গেলেন। বিদ্রোহের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনিও।

❖❖❖

সমুদ্রোপকূলের ক্যাম্প থেকে রবিন, তার চার সঙ্গী এবং ছয়টি মেয়েকে পনেরজন রক্ষীর প্রহরায় কায়রো অভিমুখে রওনা করা হয়েছে। দূত রওনা হয়ে গেছে তাদেরও আগে। বন্দীরা সকলে উটের পিঠে আর রক্ষীরা ঘোড়ায়। তারা স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলছে এবং পথে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্রাম নিচ্ছে। তাড়া নেই, শঙ্কা নেই। পথে বিপদের কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় পথ চলছে তারা। কয়েদীরা নিরস্ত্র, তদুপরি তাদের ছয়জন-ই নারী। কারোর পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

কিন্তু রক্ষীরা ভুলে গেছে, তাদের কয়েদীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। তীর-তরবারী ব্যবহারে সকলে-ই অভিজ্ঞ। তাদের দলের যাদেরকে বণিকবেশে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা রীতিমত যোদ্ধা। আর মেয়েগুলোও সেই মেয়ে নয়, যাদেরকে মানুষ অবলা নারী মনে করে থাকে। তাদের দেহ ও রূপের আকর্ষণ, মধুভরা যৌবন আর চপলতা এমন এক অস্ত্র, যা প্রবল প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহদেরও কুপোকাত করে ফেলতে, বড় বড় বীর যোদ্ধাকেও মুহূর্তে নিরস্ত্র করতে সক্ষম।

রক্ষীদের কমাণ্ডার মিসরী। তার নজরে পড়ে, মেয়ে ছয়টির একজন বার বার তার প্রতি চোখ তুলে তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হয়ে গেলে মিষ্টি-মধুর হাসি ভেসে ওঠে মেয়েটির ঠোঁটে। মেয়েটি যাদুর মত আকর্ষণ করছে কমাণ্ডারকে। তার রাঙ্গা ঠোঁটের মুচকি হাসি মোমের মত গলিয়ে ফেলছে তাকে।

সন্ধ্যার সময় এই প্রথমবার একস্থানে যাত্রা বিরতি দেয় কাফেলা। খাবার দেয়া হয় সকলকে। কিন্তু খাবারে হাত দিল না মেয়েটি। কমাণ্ডারকে জানান হলো। কমাণ্ডার কথা বললো মেয়েটির সঙ্গে। খাবার না খাওয়ার কারণ জানতে চায় সে। জবাবে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করে তার দু'চোখ থেকে। কিছুক্ষণ নতমুখে দাঁড়িয়ে থেকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে— 'আপনার সঙ্গে আমি নিভৃতে কথা বলতে চাই।'

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত আসে। ঘুমিয়ে পড়ে কাফেলার সকলে। শুয়ে পড়ে কমাণ্ডারও। কিছুক্ষণ পর সে বিছানা থেকে উঠে মেয়েটিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে

তোলে। নিয়ে যায় আড়ালে। বলে, কি যেন বলবে বলেছিলে, এবার বলো। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে মেয়েটি বললো, আমি একটি মজলুম মেয়ে। আমাকে খৃষ্টান সৈন্যরা অপহরণ করে একটি জাহাজে তুলে নিয়ে এসেছে । আমি এক অফিসারের রক্ষিতা হয়ে থাকতে বাধ্য হই।

অন্য মেয়েদের সম্পর্কে সে জানায়, তাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় জাহাজে। তাদেরকেও আনা হয়েছে অপহরণ করে। অগ্নিগোলার শিকার হয়ে জাহাজগুলো আগুনে পুড়তে শুরু করলে একটি নৌকায় তুলে আমাদেরকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ভাসতে ভাসতে আমরা কূলে এসে পৌঁছি। তারপর গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী হই আপনাদের হাতে।

বণিকবেশী গোয়েন্দারাও মেয়েগুলোর ব্যাপারে সুলতান আইউবীকে এ কাহিনী-ই শুনিয়েছিলো। মিসরী রক্ষী কমাণ্ডারের জানা ছিলো না এ কাহিনী, এ-ই প্রথমবার শুনছে সে। তার প্রতি নির্দেশ, এরা ভয়ঙ্কর গুপ্তচর; কঠোর নিরাপত্তার সাথে এদেরকে কায়রো নিয়ে সুলতান আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তুলে দিতে হবে। কাজেই মেয়েদের, বিশেষ করে এই মেয়েটির কোন সাহায্য করার সাধ্য তার নেই। তাই সে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে দেয় মেয়েটিকে। তার জানা নেই, মেয়েটির তূনীরে আরো অনেক তীর অবশিষ্ট আছে। এক এক করে সেই তীর ছুঁড়তে-ই থাকবে সে।

এবার মেয়েটি বললো, আমি তোমার নিকট কোন সাহায্য চাই না। তুমি কোন সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এলেও আমি তা গ্রহণ করবো না। কারণ, তোমাকে আমার এত-ই ভালো লাগছে যে, আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। তোমাকে ভালোবাসি বলে-ই আমি মনের বেদনার কথাগুলো তোমার কাছে ব্যক্ত করেছি।

এমন একটি রূপসী মেয়ের মুখে এ জাতীয় কথা শুনে আত্ম-সংবরণ করতে পারে কোন্ পুরুষ! তাছাড়া কমাণ্ডারের হাতে মেয়েটি নিতান্ত অসহায়ও বটে। তদুপরি নিঝুম রাতের নির্জন পরিবেশ। ধীরে ধীরে বরফের মত গলতে শুরু করে মিসরী কমাণ্ডারের পৌরুষ। বন্ধুসুলভ প্রেমালাপ জুড়ে দেয় সে মেয়েটির সঙ্গে। এবার মেয়েটি নিক্ষেপ করে তূনীরের আরেকটি তীর। সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পূত-পবিত্র চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করতে শুরু করে। বলে— 'আমি তোমার গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবীকে আমার নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়েছিলাম। আশা ছিলো, তার মত একজন মহৎ ব্যক্তি আমার প্রতি দয়াপরবশ

হবেন। কিন্তু আশ্রয়ের নামে তিনি আমায় নিজের তাঁবুতে নিয়ে রাখলেন এবং মদপান করে হায়েনার মত রাতভর আমার সম্ভ্রম লুট করলেন। পশুটা আমার হাড়গোড় সব ভেঙ্গে দিয়েছে। মদপান করে তিনি এমনই অমানুষ হয়ে যান যে, তখন তার মধ্যে মানবতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা।

মাথায় খুন চেপে যায় মিসরীর। দাঁত কড়মড় করে বলে ওঠে, 'এ্যা, আমাদের শোনান হয়, সালাহুদ্দীন একজন পাক্কা ঈমানদার, এক্কেবারে ফেরেশতা। মদ-নারীর প্রতি নাকি তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। আর তলে তলে করে বেড়াচ্ছেন এসব, না?'

'এখন তোমরা আমাকে তার-ই কাছে নিয়ে যাচ্ছো। আমি যা বললাম, যদি তোমার বিশ্বাস না হয়ে থাকে, তাহলে রাতে দেখো, আমাকে কোথায় থাকতে হয়। তোমাদের সুলতান আমাকে কয়েদখানায় না রেখে রাখবেন তাঁর হেরেমে, সে কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। লোকটার কথা মনে পড়লে আমার গা শিউরে ওঠে।' বললো মেয়েটি।

এ জাতীয় আরো অনেক কথা বলে মিসরী কমাণ্ডারের মনে সুলতান আইউবীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি করে মেয়েটি। মিসরী এখন সম্পূর্ণরূপে মেয়েটির হাতের মুঠোয়। সে তার মাথা কব্জা করে নিয়েছে। কিন্তু কমাণ্ডার জানেনা, এসব হলো গোয়েন্দা মেয়েদের অস্ত্র। সব শেষে মেয়েটি বললো— 'তুমি যদি আমাকে এ লাঞ্ছনার জীবন থেকে উদ্ধার করতে পারো, তাহলে আমি আজীবনের জন্য তোমার হয়ে যাবো এবং আমার পিতা বিপুল স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।'

তার পন্থাও জানিয়ে দেয় মেয়েটি। বলে, তুমি আমার সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে পালিয়ে যাবে। নৌকার অভাব হবে না। আমার পিতা বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমি তোমাকে বিয়ে করে নেবো আর আমার পিতা তোমাকে উন্নত একটি বাড়ি ও বিপুল ধন-সম্পদ প্রদান করবেন। নির্বিঘ্নে ব্যবসা করে আমাকে নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারবে।'

মিসরীর মনে পড়ে যায়, সে মুসলমান। বললো, কিন্তু আমি তো আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারবো না। মেয়েটি কিছুক্ষণ মৌন থেকে ভেবে বললো— 'ঠিক আছে, তোমার জন্য আমিই আমার ধর্ম বিসর্জন দেবো।'

পলায়ন ও বিয়ের পরিকল্পনা তৈরী করে দু'জনে। মেয়েটি বললো, 'তোমার উপর আমি কোন চাপ দিতে চাই না। ভালভাবে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত

নাও। আমি শুধু জানতে চাই, আমার মনে তোমার প্রতি যতটুকু ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, ততটুকু হৃদ্যতা আমার প্রতিও তোমার অন্তরে জেগেছে কি না। আমাকে বরণ করতে যদি তুমি প্রস্তুত হয়ে-ই থাকো, তাহলে চেষ্টা করো, যেন কায়রো পৌঁছুতে আমাদের সফর দীর্ঘ হয়। ওখানে পৌঁছে গেলে তুমি আমার গন্ধও পাবে না।

মেয়েটির উদ্দেশ্য, সফর দীর্ঘ হোক এবং তিন দিনের স্থলে ছয়দিন পথেই কেটে যাক। তার কারণ, রবিন ও তার সঙ্গীরা পালাবার চেষ্টা করছে। রাতে ঘুমন্ত রক্ষীদেরকে তাদের-ই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে তাদের-ই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে সুযোগের সন্ধান করছে তারা। এতো মাত্র প্রথম মন্‌যিল, প্রথম অবস্থান। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সফর, যাতে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে কাজ করা যায়।

এ উদ্দেশ্য সাধনে-ই মেয়েটিকে ব্যবহার করছে তারা। মিসরী কমাণ্ডারকে হাত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে তার উপর। মেয়েটি প্রথম সাক্ষাতে-ই ধরাশয়ী করে ফেলে মিসরী কমাণ্ডারকে।

মিসরী কমাণ্ডার তেমন ব্যক্তিত্ববান লোক নয়; একজন প্লাটুন কমাণ্ডার মাত্র। এমন সুন্দরী নারী স্বপ্নেও দেখেনি সে কখনো। অথচ এখন কিনা অনুপম এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী তার হাতের মুঠোয়। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তার হাতে নিজেকে তুলে দিয়ে বসেছে মেয়েটি। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কমাণ্ডার। ভুলে গেছে নিজের ধর্ম ও কর্তব্যের কথা। এখন সে ক্ষণিকের জন্যও মেয়েটি থেকে আলাদা হতে চাইছে না।

এ উন্মাদনার মধ্যে পরদিন ভোরবেলা কমাণ্ডার প্রথম আদেশ জারী করে, উট-ঘোড়াগুলো বেশ ক্লান্ত; কাজেই আজ আর সফর হবে না। রক্ষী ও উষ্ট্রচালকগণ এ ঘোষণায় বেশ আনন্দিত হয়। কারণ, রণক্ষেত্রে সীমাহীন পরিশ্রমে তাদেরও দেহ অবসন্ন। কায়রো পৌঁছবার কোন তাড়াও নেই তাদের।

বিশ্রাম ও গল্প-গুজবে কেটে যায় দিন। কমাণ্ডারও মেয়েটিকে নিয়ে উন্মাতাল। দিন গিয়ে রাত এলো। ঘুমিয়ে পড়লো সকলে। কমাণ্ডার মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল খানিকটা দূরে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে মেয়েটি রঙ্গিন স্বপ্নের নীলাভ আকাশে পৌঁছিয়ে দিলো তাকে।

পরদিন তাঁবু তুলে যাত্রা করে কাফেলা। কিন্তু কমাণ্ডার সোজা রাস্তা ছেড়ে ধরে অন্য পথ। সঙ্গীদের বললো, এ পথে সামনে ছাউনি ফেলার জন্য বেশ

মনোরম জায়গা আছে। একটি বসতিও আছে কাছে। ডিম-মুরগী পাওয়া যাবে। শুনে সঙ্গীদের আনন্দ আরো বেড়ে যায় যে, কমাণ্ডার আমাদের আয়েশের চিন্তা করছেন।

কিন্তু প্লাটুনের দু'জন সৈনিক কমাণ্ডারের এসব আচরণের আপত্তি তোলে। তারা বলে, আমাদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর কয়েদী। লোকগুলো শত্রুবাহিনীর গুপ্তচর। যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়া প্রয়োজন। অযথা সফর দীর্ঘ করা ঠিক হচ্ছে না। কমাণ্ডার তাদের এই বলে থামিয়ে দিলো যে, সে দায়িত্ব আমার। গন্তব্যে দ্রুত পৌঁছবো না বিলম্বে, সে তোমাদের ভাবতে হবে না। জবাবদিহি করতে হলে আমাকে-ই করতে হবে; তোমাদের এত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তারা কমাণ্ডারের জবাবে চুপসে যায়।

এগিয়ে চলছে কাফেলা। দুপুরের পর কাফেলা যেখানে পৌঁছে, সেখানে আশপাশে অসংখ্য শকুন উড়তে ও মাটিতে নামতে-উঠতে দেখে তারা। বুঝা গেলো, মৃত মানুষের লাশ আছে এখানে। চারদিকে মাটি ও বালির টিলা, বড় বড় বৃক্ষও আছে। টিলার ভেতরে ঢুকে পড়ে কাফেলা। ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে গেছে পথ। একটি উঁচু স্থান থেকে বিশাল এক ময়দান চোখে পড়ে তাদের। তার এক স্থানে বৃত্তাকারে উঠানামা করছে অনেকগুলো শকুন। শোরগোল করে কিসে যেন মেতে আছে শকুনগুলো। কিছুদূর অগ্রসর হলে চোখে পড়ে, সেখানে কতগুলো লাশ। পঁচা লাশের দুর্গন্ধে বিষিয়ে উঠেছে এলাকার পরিবেশ।

এগুলো সেই সুদানীদের লাশ, যারা রোম উপসাগরের তীরে অবস্থানরত সুলতান আইউবীর বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে রওনা হয়েছিলো। সুলতান আইউবীর জানবাজ সৈনিকরা রাতের বেলা পেছন থেকে হামলা চালিয়ে এখানে-ই থামিয়ে দিয়েছে তাদের অগ্রযাত্রা, ব্যর্থ করে দিয়েছে তাদের অশুভ তৎপরতা। আরো সামনে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে সুদানীদের অসংখ্য লাশ। আইউবী বাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর নিহতদের লাশগুলো পর্যন্ত তুলে নেয়ার সুযোগ পায়নি তারা।

এগিয়ে চলছে কাফেলা।

নিহত সুদানীদের লাশের আশেপাশে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে তাদের অস্ত্র। তীর-কামান, বর্শা-ঢাল ইত্যাদি। কাফেলার কয়েদীদের চোখে পড়ে সেগুলো। তারা পরস্পর কানাঘুষা করে। যে মেয়েটি রক্ষী কমাণ্ডারকে কজা করে

রেখেছিলো, তার সঙ্গেও চোখের ইঙ্গিতে কথা বলে রবিন। লাশ ও অস্ত্র ছড়িয়ে আছে অনেক দূর পর্যন্ত।

ডান দিকে নিকটে-ই সবুজ-শ্যামল মনোরম একটি জায়গা। পানিও নজরে আসছে। এই সবুজের সমারোহ টিলাগুলোর চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মেয়েটি চোখ টিপে ইঙ্গিত করলো কমাণ্ডারকে। কমাণ্ডার চলে আসে মেয়েটির নিকটে। মেয়েটি বললো— 'জায়গাটি বেশ মনোরম, এখানেই তাঁবু ফেলো। রাতে বেশ মজা হবে।'

কাফেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় কমাণ্ডার। সবুজ-শ্যামল টিলার নিকটে পানির ঝরনার কাছে গিয়ে থেমে যায় সে। ঘোষণা দেয়, এখানে-ই রাত কাটবে। উট-ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে সকলে। পানির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পশুগুলো। রাত যাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করে কমাণ্ডার। দু'টি টিলার মাঝে প্রশস্থ একটি জায়গা, সবুজে ঘেরা। ছাউনি ফেলার নির্দেশ হয় এখানে।

গভীর রাত। চারদিক অন্ধকার। ঘুমিয়ে আছে সকলে। জেগে আছে শুধু দু'জন। কমাণ্ডার আর মেয়েটি। কমাণ্ডারের ভাবনা এক, মেয়েটির মতলব আরেক। কমাণ্ডারের ইচ্ছা মেয়েটিকে ভোগ করে চলা আর মেয়েটির পরিকল্পনা কমাণ্ডারকে খুন করা।

নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে সবাই। কোন প্রহরা নেই। নিরাপত্তার কথা ভাববার-ই সময় নেই কমাণ্ডারের। শয়ন থেকে উঠে মেয়েটি। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় কমাণ্ডারের নিকট। মেয়েটিকে নিয়ে সকলের থেকে অনেক ব্যবধানে দূরে শুয়ে আছে কমাণ্ডার। মেয়েটি তাকে একটি টিলার আড়ালে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ কাটায় সেখানে। সে আরো একটু দূরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। মিসরী কমাণ্ডার তার ইচ্ছার গোলাম। এ যে এক ষড়যন্ত্র, কল্পনায়ও আসছে না তার। মনে তার বেশ আনন্দ। সে মেয়েটির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। আরো তিনটি টিলা পেরিয়ে মেয়েটি একস্থানে নিয়ে যায় তাকে। এবার সে থামে। কমাণ্ডারকে দু' বাহুতে জড়িয়ে ধরে মন উজাড় করে প্রেম-নিবেদন করে। নিজেকে প্রেম-সাগরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে কমাণ্ডার।

রবিন দেখলো, কমাণ্ডার নেই। অন্য রক্ষীরাও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শুয়ে শুয়ে-ই সে পাশের সঙ্গীকে জাগায়। পাশের জন জাগায় তার পরের জনকে। এভাবে জেগে উঠে তারা চারজন।

রক্ষীরা ঘুমিয়ে আছে তাদের থেকে একটু দূরে। কোন পাহারাদার নেই। বুকে ভর দিয়ে ক্রোলিং করে সামনে এগিয়ে যায় রবিন। রক্ষীদের অতিক্রম করে

চলে যায় অনেক দূর। পিছনে পিছনে এগিয়ে যায় তার তিন সঙ্গী। তারা টিলার আড়ালে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। চলে যায় মাঠের লাশগুলোর কাছে। কুড়িয়ে নেয় অস্ত্র। তিনটি ধনুক, তূনীর ও একটি করে বর্শা হাতে তুলে নেয়। এবার অস্ত্র নিয়ে একত্রে ফিরে আসে তিনজন।

সঙ্গীদের নিয়ে ঘুমন্ত রক্ষীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রবিন। হাতের বর্শাটা শক্ত করে ধরে। তুলে ধরে চীৎ হয়ে শুয়ে থাকা এক রক্ষীর বুক বরাবর। অপর চারজনও এক একজন রক্ষীর নিকট দাঁড়িয়ে যায় পজিশন নিয়ে। মুহূর্ত মধ্যে জীবনের অবসান ঘটতে যাচ্ছে সুলতান আইউবীর চার রক্ষীর। এ চারজনকে খুন করে কেউ টের পাওয়ার আগে অপর এগারজনকেও শেষ করে ফেলা ব্যাপার নয়। চাল তাদের সফল। তারপর থাকে তিন উষ্ট্রচালক আর কমাণ্ডার। পনের রক্ষীর হত্যার পর তারা হবে সহজ শিকার।

রক্ষীর বুকে বিদ্ধ করার জন্য বর্শাটা আরো একটু উপরে তোলে রবিন। সে রক্ষীর বুকটা শেষবারের মত দেখে নেয়। আঘাতের জন্য হাতটা তার নীচে নেমে এলো বলে, হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসে রবিনের কানে। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ দিক থেকে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় রবিনের বুকে। ছুটে আসে আরেকটি তীর। বিদ্ধ হয় রবিনের এক সঙ্গীর বুকে। একই সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দু'জন। অপর তিনজন দেখার চেষ্টা করছে, ঘটনাটা কী ঘটলো। ইত্যবসরে ধেয়ে আসে আরো দু'টি তীর। আঘাত খেয়ে পড়ে যায় আরো দু'জন। এখনো দাঁড়িয়ে আছে একজন। পালাবার জন্য পিছন দিকে মোড় ঘুরায় সে। অমনি একটি তীর এসে গেঁথে যায় তার এক পাজরে। তার দু' চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে; পড়ে যায় মাটিতে।

ঘটনাটা ঘটে গেলো নিতান্ত চুপচাপ। একে একে পাঁচটি প্রাণী ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে; কিন্তু টের পেলো না কেউ। এখনো সবাই ঘুমুচ্ছে নাক ডেকে। যম এসে দাঁড়িয়েছিলো যাদের সামনে, টের পেলো না তারাও।

ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসে তীরান্দাজরা। আলো জ্বালায় তারা। তারা সেই দুই রক্ষী, যারা কমাণ্ডারের আচরণে আপত্তি তুলে বলেছিলো, গড়িমসি না করে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছা দরকার। শুয়েছিলো তারা। চার কয়েদী যখন পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তখন চোখ খুলে যায় একজনের। সে সঙ্গীকে জাগিয়ে কয়েদীদের অনুসরণ করে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, কয়েদীরা যদি পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের তীর ছুঁড়ে খতম করে দেবে। তাই তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে

তারা অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে কয়েদীদের ফিরে আসতে দেখে একটি টিলার আড়ালে বসে পড়ে চুপচাপ। এবার যেইমাত্র কয়েদীরা রক্ষীদের বুক লক্ষ্য করে বর্শা তাক করে, অমনি রক্ষীরা তাদের প্রতি তীর ছুঁড়ে দেয়। খতম করে দেয় চার কয়েদীর প্রত্যেককে।

এবার কমাণ্ডারকে আওয়াজ দেয় রক্ষীরা। কিন্তু কোন শব্দ-সাড়া নেই তার। তাদের ডাকাডাকিতে জেগে ওঠে মেয়েরা। জেগে ওঠে অপর রক্ষীরাও। চারটি লাশ দেখতে পায় মেয়েরা। লাশগুলো তাদের-ই চার সঙ্গীর। তারা আঁৎকে উঠে। দেহে একটি একটি করে তীর নিয়ে শুয়ে আছে লাশগুলো। অপলক নেত্রে নিঃশব্দে লাশগুলোর প্রতি তাকিয়ে থাকে মেয়েরা। কী করতে এসে সঙ্গীরা লাশ হলো, তা বুঝতে বাকী রইলো না তাদের। আজ রাতের পরিকল্পনা সম্পর্কে তারাও অবহিত।

মিসরী কমাণ্ডার ছাউনীতে নেই। নেই একটি মেয়েও।

কয়েদী গোয়েন্দাদের বুকে যখন তীর বিদ্ধ হলো, ঠিক তখন রক্ষীদের মিসরী কমাণ্ডারের পিঠেও বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো একটি খঞ্জর। দু'টি টিলার পরে তৃতীয় একটি টিলার নীচে পড়ে আছে তার লাশ। সে সংবাদ জানে না রক্ষীরা।

তাঁবু থেকে তুলে মেয়েটি বেশ দূরে তার পছন্দমত একটি স্থানে নিয়ে গিয়েছিলো কমাণ্ডারকে। রাতের আঁধারে মেয়েটিকে নিয়ে আমোদে মেতে উঠে কমাণ্ডার। একটি টিলার আড়ালে বসে আছে দু'জন। সে টিলার-ই খানিক দূরে তাঁবু ফেলেছিলো বালিয়ান। মুবীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বালিয়ানও এগিয়ে আসে টিলার দিকে। হাতে তার মদের বোতল। নীচে বিছানোর জন্য মুবী হাতে করে নিয়ে আসে একটি শতরঞ্জি। একস্থানে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে পড়ে মুবী। পাশে বসে মুবীকে জড়িয়ে ধরে বালিয়ান।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কারো কথা বলার শব্দ ভেসে আসে তাদের কানে। কান খাড়া করে শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে, আন্দাজ করার চেষ্টা করে বালিয়ান। কী বলছে, তাও বুঝবার চেষ্টা করে সে। বুঝা গেলো কণ্ঠটি একটি মেয়ের। বালিয়ান ও মুবী উঠে দাঁড়ায়। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় সেদিকে। কাছে গিয়ে টিলার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে তাকায় দু'জনে। দু'টি ছায়ামূর্তি বসে আছে দেখতে পায় তারা। আরো গভীর দৃষ্টিতে তাকায়। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারে, ছায়ামূর্তি দু'টির একটি নারী অপরটি পুরুষ। আরো নিকটে চলে যায় মুবী। সে গভীর মনে তাদের আলাপ বুঝতে চেষ্টা করে। মিসরী

কমাণ্ডারের সঙ্গে মেয়েটি এমন স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছিলো যে, মুবী নিশ্চিত হয়ে যায়, মেয়েটি তার-ই এক সহকর্মী। তারা আরো বুঝে ফেলে, কায়রো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মেয়েটিকে।

মিসরী কমাণ্ডারের আচরণ ও কথোপকথনে মুবী নিশ্চিত বুঝে ফেলে, লোকটি এ মেয়েটিকে তার অসহায়ত্বের সুযোগে ভোগের উপকরণে পরিণত করে রেখেছে। মনে মনে ফন্দি আঁটে মুবী। পিছনে সরে গিয়ে বালিয়ানকে কানে কানে বলে— 'লোকটি মিসরী। সঙ্গের মেয়েটি আমার-ই সহকর্মী। বেটা জোরপূর্বক ফুর্তি করছে মেয়েটিকে নিয়ে। তুমি তাকে রক্ষা করো। এই মিসরী লোকটি তোমার দুশমন আর মেয়েটি আমার আপন।' বালিয়ানকে উত্তেজিত করার জন্য মুবী আরো বলে— 'মেয়েটি বেশ সুন্দরী। মিসরীর কবল থেকে ওকে উদ্ধার করে আনো, এই সফরে ওকে নিয়ে বেশ আমোদ করতে পারবে।'

একটু আগে-ই মদপান করেছিলো বালিয়ান। মাথাটা এখনো তার ঢুলুঢুলু করছে। এবার খুনের নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। সে মুবীর দেখানো লোভ সামলাতে পারলো না। কোমরবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে হাতে নেয় বালিয়ান। বিলম্ব না করে দ্রুত এগিয়ে যায় মিসরীর প্রতি। খঞ্জরের আঘাত হানে তার পিঠে। পিঠ থেকে খঞ্জরটি টেনে বের করে মারে আরেক ঘা। লুটিয়ে পড়ে মিসরী।

মিসরীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি। দৌড়ে আসে মুবী। সাংকেতিক শব্দে ডাক পাড়ে মেয়েটিকে। মেয়েটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরে মুবীকে। অন্য মেয়েরা কোথায়, জিজ্ঞেস করে মুবী। সঙ্গী মেয়েরা কোথায় কিভাবে আছে, জানায় মেয়েটি। সে রবিন এবং তার সাথীদের কথাও জানায়।

পিছন দিকে দৌড়ে যায় বালিয়ান। ডেকে তুলে নিজের ছয় সঙ্গীকে। তাদের কাছে আছে ধনুক ও অন্যান্য হাতিয়ার।

ইত্যবসরে মুসলিম রক্ষীদের একজন কমাণ্ডারকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে এদিকে। তীর ছুঁড়ে বালিয়ানের এক সঙ্গী; খতম করে দেয় রক্ষীকে। মেয়েটি তাদের নিয়ে হাঁটা দেয় ছাউনির দিকে।

সর্বশেষ টিলাটির পিছনে আলো দেখতে পায় বালিয়ান। টিলার আড়ালে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকায় সে। বড় বড় দু'টি মশাল জ্বলছে। মশালের দণ্ডগুলো লম্বা হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

বালিয়ান ও তার সঙ্গীরা যেস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গাটা অন্ধকার। কিন্তু যে স্থানে মশাল জ্বলছে, সেখানে একধারে পাঁচটি মেয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে

দেখতে পায় সে। রক্ষীরাও দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যখানে পড়ে আছে পাঁচটি লাশ। লাশগুলোর গায়ে তীরবিদ্ধ। মুবী ও অপর মেয়েটির কান্না এসে যায়। মুবীর উস্কানীতে এবার বালিয়ান রক্ষীদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার সঙ্গীদের বলে, এরা তোমাদের শিকার, তীর ছুঁড়ে বেটাদের শেষ করে দাও। সংখ্যায় এখন তারা চৌদ্দ। দুর্ভাগ্যবশত মশালের আলোতে তাদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে শিকারীরা।

ধনুকে তীর সংযোজন করে বালিয়ানের সঙ্গীরা। একই সময়ে শোঁ করে ছুটে আসে ছয়টি তীর। এক সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ছয়জন রক্ষী। বাকীরা কোত্থেকে কী হলো বুঝে উঠতে না উঠতে ছুটে আসে আরো ছয়টি তীর। মাটিতে পড়ে যায় আরো ছয় রক্ষী। এখনো বেঁচে আছে দু'জন। অন্ধকারে গায়েব হয়ে যায় তাদের একজন। পালাবার চেষ্টা করে অপরজনও। কিন্তু একত্রে তিনটি তীর এসে বিদ্ধ হয় তার পিঠের তিন জায়গায়। শেষ হয়ে যায় সে-ও। রক্ষা পেয়ে গেছে তিন উষ্ট্রচালক। ঘটনার সময় এখানে ছিলো না তারা। পরে দূর থেকে টের পেয়ে তারা অন্ধকারে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

মশালের আলোতে এখন দেখা যাচ্ছে লাশ আর লাশ। প্রতিটি লাশ শুয়ে আছে একটি করে তীর নিয়ে। দৌড়ে এসে মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হয় মুবী। এ সময় একটি ঘোড়ার দ্রুত ধাবন শব্দ শুনতে পায় তারা। শঙ্কিত হয়ে ওঠে বালিয়ান। বলো, 'এখানে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। বেটাদের একজন জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে। লোকটা কায়রোর দিকে গেলো বলে মনে হলো। চল, জল্‌দি কেটে পড়ি।'

রক্ষীদের ঘোড়াগুলো নিয়ে নিজেদের ছাউনিতে চলে যায় তারা। গিয়ে দেখে, যিনসহ তাদের একটি ঘোড়া উধাও। বুঝতে বাকী রইলো না, রক্ষী-ই নিয়ে গেছে ঘোড়াটি। নিজেদের ঘোড়ার নিকট যেতে না পেরে লোকটা চলে আসে এদিকে। এখানে বাঁধা ছিলো আটটি ঘোড়া। যিনগুলো খুলে রাখা ছিলো পাশে-ই এক জায়গায়। একটি ঘোড়ায় যিন কষে পালিয়ে গেছে রক্ষী।

চৌদ্দটি ঘোড়ায় যিন বাঁধায় বালিয়ান। মাল-পত্র বোঝাই করে দু'টি ঘোড়ায়। অবশিষ্ট ঘোড়াগুলো সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যায় একদিকে।

সুলতান আইউবীর রক্ষীদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনা গোয়েন্দা মেয়েরা মুবীকে তাদের ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়। রক্ষীরা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো, তাও জানায় সে। রবিন ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে বলে, পরিকল্পনা অনুযায়ী

তারা মাঠ থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিলো। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, কিভাবে তারা মারা পড়লো।

মুবী বললো, আইউবীর ক্যাম্পে অকস্মাৎ আমার ও রবিনের সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিলো। সে বলেছিলো, আমি দেখতে পাচ্ছি, যীশুখৃষ্ট আমাদের সফলতা মঞ্জুর করেছেন। অন্যথায় এভাবে তোমার-আমার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটতো না। আজ আমার-তোমাদের সাক্ষাৎ তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই ঘটে গেলো ঠিক; কিন্তু যীশুখৃষ্ট আমাদের কামিয়াবী মঞ্জুর করেছেন, সে কথা আমি বলবো না। আমার কাছে বরং যীশুকে আমাদের প্রতি রুষ্ট বলে-ই মনে হয়। যে কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলো, রোম উপসাগরে আমাদের বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো। মিসরে আমাদের সহযোগী শক্তি সুদানীদের নির্মম পরাজয় হলো। এদিকে রবিন ও ক্রিস্টোফরের ন্যায় নির্ভরযোগ্য সাহসী ব্যক্তিদ্বয় এবং এতগুলো সঙ্গী মারা পড়লো! জানি না, আমাদের কপালে কী আছে!

বালিয়ান বললো, 'চিন্তা করো না, আমাদের জীবন থাকতে তোমাদের প্রতি কেউ হাত বাড়াতে পারবে না। আমার সঙ্গীদের কৃতিত্ব দেখলে-ই তো।'

কয়েদীদের এ কাফেলা টিলায় যখন লাশের পার্শ্বে দণ্ডায়মান, ঠিক তখন সমুদ্রোপকূলে সুলতান আইউবীর ক্যাম্পে প্রবেশ করে তিনজন আগন্তুক। তাদের পরনে ইতালীয় বেদুঈনদের সাদাসিধে পোশাক। কথা বলতে শুরু করে ইতালী ভাষায়। কিন্তু তাদের ভাষা বুঝছে না ক্যাম্পের কেউ।

আগন্তুকদের পাঠিয়ে দেয়া হয় বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের নিকট। সুলতান আইউবীর অবর্তমানে তিনি এখন ক্যাম্পের কমাণ্ডার। আগন্তুকদের পরিচয় জানতে চান শাদ্দাদ। তারা ইতালী ভাষায় জবাব দেয়। তিনিও তাদের ভাষা বুঝছেন না।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ইতালীয় এক যুদ্ধবন্দীকে ডেকে আনেন কয়েদখানা থেকে। মিসরী ভাষাও তার জানা। তিনি তার মাধ্যমে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনজনের একজন মধ্য বয়সী। দু'জন যুবক। তারা হুবহু একই কথা শোনায়। বলে, খৃষ্টানরা আমাদের তিনজনের তিনটি সুন্দরী বোনকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিলো। শুনেছি, ওরা নাকি খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আপনাদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে। আমরা বোনদের খুঁজে বের করতে এসেছি।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ জানান, এখানে সাতটি মেয়ে এসেছিলো। তারাও আমাদেরকে একই কাহিনী শুনিয়েছিলো। ছয়জন আমাদের হাতে বন্দী আছে; সপ্তমজন পালিয়ে গেছে। আমাদের জানা মতে ওরা গুপ্তচর। আগন্তুকরা জানায়, গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে আমাদের বোনদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা নির্যাতিত গরীব মানুষ। একজন থেকে একটি নৌকা চেয়ে নিয়ে বোনদের সন্ধানে এতদূর এসেছি। আমাদের মত গরীবদের বোনেরা গুপ্তচর বৃত্তির সাহস করবে কিভাবে। আপনি যে সাত মেয়ের কথা বললেন, ওরা তাহলে আমাদের বোন হবে না। জানিনা ওরা কারা।

'আমাদের নিকট আর কোন মেয়ে নেই। এই সাতজন-ই ছিলো, তাদেরও একজন লা-পাত্তা হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ছয়জনকে গত পরশু কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওদের মধ্যে তোমাদের বোনরা আছে কিনা, দেখতে চাইলে কায়রো চলে যাও। আমাদের সুলতান হৃদয়বান মানুষ, বললে তিনি মেয়েদেরকে দেখাতে পারেন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'না, আমাদের বোনরা গুপ্তচর নয়। ঐ সাতজন অন্য মেয়ে হবে। তারা হয়তো সমুদ্রে ডুবে মরেছে কিংবা খৃষ্টান সৈনিকরা তাদের কাছে আটকে রেখেছে।' বললো আগন্তুকদের একজন।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ একজন সরল-সহজ দয়ালু মানুষ। তিনি আগন্তুক বেদুঈনদের সাজানো কাহিনীতে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাদের বেশ খাতিরদারী করেন এবং স্বসম্মানে বিদায় করে দেন। আলী বিন সুফিয়ান হলে তাদেরকে এত সহজে ছেড়ে দিতেন না। চেহারা দেখেই তিনি বুঝে ফেলতেন, লোকগুলো গুপ্তচর, যা বলছে সব মিথ্যে।

বিদায় নিয়ে চলে যায় তিনজন। কোথায় গেলো তা দেখারও চেষ্টা করলো না কেউ। ক্যাম্প থেকে বের হয়ে সোজা হাঁটা দেয় একদিকে। একটানা চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারা ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে নিরাপদ এক পাহাড়ী অঞ্চলে ঢুকে পড়ে।

সেখানে বসে তাদের অপেক্ষা করছিলো তাদের-ই আঠারজন লোক। এ তিনজনের মধ্য বয়সী লোকটির নাম মিগনানা মারিউস। গ্রেফতার হওয়া মেয়েদের মুক্ত করা এবং সম্ভব হলে সুলতান আইউবীকে হত্যা করার জন্য যে কমাণ্ডো পাঠানো হয়েছে, মিগনানা মারিউস সে বাহিনীর কমাণ্ডার।

এরা তিনজন সুলতান আইউবীর ক্যাম্প সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে নিয়েছিলো। তারা জেনে যায়, সুলতান আইউবী এখন এখানে নেই, আছেন

কায়রোতে। শাদ্দাদের সঙ্গে কথা বলে তারা জানতে পারে, গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার করা মেয়েগুলোকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পাঁচজন পুরুষ বন্দীও আছে তাদের সঙ্গে।

বড় একটি নৌকায় করে এসেছে এ ঘাতক দলটি। সমুদ্রের পাড়ে এক স্থানে সরু একটি খাল। সেই খালে ঢুকিয়ে বেঁধে রেখে এসেছে তারা নৌকাটি। এখন তাদের কায়রো অভিমুখে রওনা হতে হবে। কিন্তু বাহন নেই।

যে তিনজন লোক ক্যাম্পে গিয়েছিলো, তারা ক্যাম্পের আস্তাবল ও উট বাঁধার স্থানটা দেখে এসেছে। তারা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছে, ক্যাম্প থেকে পশু চুরি করে আনা সহজ নয়। প্রয়োজন তাদের একুশটি ঘোড়া বা উট। ক্যাম্প থেকে এতগুলো পশু চুরি করে আনা অসম্ভব।

ভোরের আকাশে নতুন দিনের সূর্য উদিত হতে এখনো বেশ বাকি। পায়ে হেঁটে-ই রওনা হয় কাফেলা। বাহন পেয়ে গেলে তারা মেয়েদেরকে পথে-ই গিয়ে ধরার চেষ্টা করতো। কিন্তু কায়রো না গিয়ে উপায় নেই তাদের। তারা জানে, তাদের এ মিশনের সফলতা জীবন নিয়ে খেলা করার শামিল। কিন্তু সফল হতে পারলে খৃষ্টান সেনানায়ক ও সম্রাটগণ যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার পরিমাণও এত বেশী যে, অবশিষ্ট জীবন তাদের আর কাজ করে খেতে হবে না। গোষ্ঠীসুদ্ধ বেশ আরামে বসে বসে তারা খেয়ে যেতে পারবে। এ লোভ সামলানোও তো কষ্টকর। তাই তাদের এত ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে অবতরণ।

মিগনানা মারিউসকে বের করে আনা হয়েছিলো কারাগার থেকে। দস্যুবৃত্তির অপরাধে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিলো তাকে। তার সঙ্গে ছিলো আরো দু'জন কয়েদী, যাদের একজনের সাজা ছিলো চব্বিশ বছর, একজনের সাতাশ বছর। সে যুগের কারাগার মানে কসাইখানা। আসামী-কয়েদীদেরকে মানুষ মনে করা হতো না। কয়েদীদের রাতের বেলাও এতটুকু আরাম করার সুযোগ ছিলো না। তাদের নির্মমভাবে খাটান হতো। পশুর মতো অখাদ্য খাবার দেয়া হতো। তেমন কারাভোগ অপেক্ষা মৃত্যু-ই ছিলো শ্রেয়।

এ তিন কয়েদীকে মহামূল্যবান পুরস্কার ছাড়া সাজা-মওকুফের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে খৃষ্টানরা। তাদের ক্রুশ হাতে শপথ করিয়ে এ মিশনে নামান হয়েছে। যে পাদ্রী তাদের শপথ নিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তারা যত মুসলমানকে হত্যা করবে, তার দশগুণ পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে পারলে মাফ হয়ে যাবে জীবনের সমস্ত গুনাহ আর পরজগতে যীশুখৃষ্ট তাদের দান করবেন চিরশান্তির আবাস জান্নাত।

প্রতিজ্ঞা তাদের দৃঢ়। মনোবলও বেশ অটুট। ভাব তাদের, কাজের কাজ করে-ই তবে মিসর ত্যাগ করবে কিংবা ক্রুশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবে।

অবশিষ্ট আঠার ব্যক্তিও খৃষ্টান বাহিনীর বাছাবাছা সৈনিক। তারা জ্বলন্ত জাহাজ থেকে জীবন রক্ষা করে এসেছে। তারা রোম উপসাগরে এই অপমানজনক পরাজয় বরণের প্রতিশোধ নিতে চায়। পুরস্কারের লোভ তো আছে-ই। প্রতিশোধ স্পৃহা আর পুরস্কারের লোভে-ই অদেখা এক গন্তব্যপানে তাদের এই পদব্রজে রওনা হওয়া।

❖ ❖ ❖

বেলা দ্বি-প্রহর। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ায় এক ঘোড়সওয়ার। পা বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে ঘোড়ার গায়ের ঘাম। ভীষণ ক্লান্ত। কথা ফুটছে না আরোহীর মুখ থেকে। লোকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করলে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে ওঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘোড়াটি। কোন দানা-পানি-বিশ্রাম ছাড়াই গোটা রাত এবং আধা দিন একটানা ঘোড়া ছুটায় আরোহী। আরোহীকে ধরে নিয়ে একস্থানে বসায় সুলতান আইউবীর রক্ষীরা। সামান্য পানি পান করতে দেয় তাকে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর এবার বাক্‌শক্তি ফিরে পায় আরোহী। ভগ্নস্বরে বলে, একজন কমাণ্ডার বা সালারের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে। সংবাদ পেয়ে বেরিয়ে আসেন সুলতান আইউবী নিজেই। সুলতানকে দেখে উঠে দাঁড়ায় আরোহী। সালাম করে বলে— 'দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি মহামান্য সুলতান!' সুলতান তাকে কক্ষের ভিতরে নিয়ে যান এবং বলেন— 'জল্‌দি বলো, কী সংবাদ তোমার।'

'বন্দী মেয়েরা পালিয়ে গেছে। আমাদের প্লাটুনের সব ক'জন রক্ষী মারা গেছে। পুরুষ কয়েদীদের আমরা হত্যা করেছি। বেঁচে এসেছি আমি একা। আক্রমণকারীরা কারা ছিলো, আমি তা জানি না। আমরা ছিলাম মশালের আলোতে আর তারা ছিলো অন্ধকারে। অন্ধকারের দিক থেকে তীর ছুটে আসে এবং সেই তীরের আঘাতে মারা যায় আমার সব ক'জন সঙ্গী।' বলল আরোহী।

এ লোকটি কয়েদীদের রক্ষী প্লাটুনের সেই ব্যক্তি, যে আক্রমণের পর অন্ধকারে উধাও হয়ে গিয়েছিলো এবং সুদানীদের ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছিলো। কাফেলা ত্যাগ করে ঘোড়ার পিঠে বসে লোকটি দ্রুত ছুটে চলে এবং পথে কোথাও মুহূর্তের জন্য না থেমে এত দীর্ঘ পথ অর্ধেকেরও কম সময়ে অতিক্রম করে চলে আসে।

আলী বিন সুফিয়ান এবং ফৌজের একজন সালারকে ডেকে পাঠান সুলতান আইউবী। তারা এসে পৌঁছুলে সুলতান আরোহীকে বললেন, এবার ঘটনাটা বিস্তারিত বলো। লোকটি ক্যাম্প থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনায়। কমাণ্ডার সম্পর্কে বলে, কিছু পথ অতিক্রম করার পর থেকে তিনি একটি কয়েদী মেয়ে নিয়ে মনোরঞ্জনে মেতে ওঠেন এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে সোজা পথ ত্যাগ করে তিনি এমন পথ ধরে চলতে শুরু করেন, যে পথে কায়রো পৌঁছুতে আমাদের অনেক বেশী সময় ব্যয় হতো। আপত্তি জানালে তিনি ক্ষেপে ওঠেন এবং এ ব্যাপারে কাউকে নাক গলাতে বারণ করে দেন। এভাবে একের পর এক পুরো ঘটনা আনুপুংখ বিবৃত করে আরোহী। কিন্তু একথা জানাতে সে ব্যর্থ হলো যে, হামলাটা কারা করলো।

আলী বিন সুফিয়ান ও নায়েবে সালারকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন—'তার মানে মিসরে এখনো খৃষ্টান কমাণ্ডো রয়ে গেছে।'

'হতে পারে, তারা মরুদস্যু। এমন রূপসী ছয়টি মেয়ে দস্যুদের জন্য বেশ লোভনীয় শিকার।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'তুমি লোকটির কথা খেয়াল করে শোননি। ও বললো, পুরুষ কয়েদীরা ময়দান থেকে অস্ত্র কুড়িয়ে এনে রক্ষীদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। টের পেয়ে দু'জন রক্ষী তীরের আঘাতে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে। হামলাটা হয় তার পরে। এতেই বুঝা যায়, খৃষ্টান গেরিলারা পূর্ব থেকেই কাফেলাকে অনুসরণ করছিলো।'

'মুহতারাম সুলতান! হামলাকারীরা যারা-ই হোক, এক্ষুনি আমাদের যে কাজটি করা দরকার, তাহলে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য এ সৈনিককে সঙ্গে দিয়ে অন্তত বিশজন দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার তাদেরকে ধাওয়া করার জন্য প্রেরণ করা। তারা কারা, সে প্রশ্নের জবাব পরে খুঁজে বের করা যাবে।' বললেন নায়েবে সালার।

'আমি আমার এক নায়েবকেও সঙ্গে দেবো।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এ সৈনিককে আহার করাও। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে দাও। এ সুযোগে বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলো। প্রয়োজন মনে করলে আরো বেশী সৈনিক দাও।' বললেন সুলতান আইউবী।

'যেখান থেকে আমি ঘোড়া নিয়ে এসেছি, সেখানে আরো আটটি ঘোড়া বাঁধা ছিলো। সেখানে কোন মানুষ দেখিনি। এ ঘোড়াগুলোর আরোহীরা-ই

আক্রমণকারী হবে বোধ হয়। ঘোড়া যদি আটটি-ই হয়ে থাকে, তাহলে তারাও হবে আটজন।' বললো আরোহী।

'গেরিলাদের সংখ্যা বেশী হবে না। আমরা তাদের ধরে ফেলবো ইনশাআল্লাহ।' বললেন নায়েবে সালার।

'মনে রাখবে, ওরা গেরিলা, আর মেয়েগুলো গুপ্তচর। তোমরা যদি একটি গুপ্তচর কিংবা একজন গেরিলাকে ধরতে পারো, তাহলে বুঝবে, তোমরা শত্রুর দু'শ' সৈনিককে গ্রেফতার করে ফেলেছো। একজন গুপ্তচর খতম করার জন্য আমি দু'শ' শত্রুসেনাকে ছেড়ে দিতে পারি। একজন সাধারণ নারী কারুর তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু একটি গুপ্তচর কিংবা সন্ত্রাসী মেয়ে একাই একটি দেশের সমগ্র সেনাবহর সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে সক্ষম। এই মেয়েগুলো বড় ভয়ঙ্কর। এরা যদি মিসরের অভ্যন্তরেই থেকে যায়, তাহলে তোমরা পুরো বাহিনী-ই ব্যর্থ হয়ে পড়বে। একটি পুরুষ কিংবা মেয়ে গুপ্তচরকে গ্রেফতার কিংবা খুন করার জন্য প্রয়োজনে নিজেদের একশত সৈনিককে উৎসর্গ করে দাও। তারপরও আমি বলবো, এ সওদা অনেক সস্তা। গেরিলাদের ধরতে না পারলেও তেমন চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু যে কোন মূল্যে মেয়েগুলোকে ধরতে-ই হবে। যদি প্রয়োজন হয়, তীর ছুঁড়ে ওদের হত্যা করে ফেলো; তবু জীবিত পালাতে যেন না পারে।' বললেন সুলতান আইউবী।

এক ঘন্টার মধ্যে বিশজন দ্রুতগামী আরোহী প্রস্তুত করে রওনা করা হয়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এই রক্ষী। আলী বিন সুফিয়ানের এক নায়েব যাহেদীন হলেন বাহিনীর কমাণ্ডার।

আলী বিন সুফিয়ান ফখরুল মিসরীকে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন এ বাহিনীতে। ফখরুল মিসরীর একান্ত কামনা ছিলো, যেন তাকে বালিয়ান ও মুবীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এখন এ বাহিনী যাদেরকে ধাওয়া করতে যাচ্ছে, তারা-ই যে বালিয়ান আর মুবী, সে তথ্য না জানে ফখরুল মিসরী, না জানেন আলী বিন সুফিয়ান।

এদিক থেকে রওনা হলো বিশজন আরোহী। একুশতম ব্যক্তি তাদের কমাণ্ডার। টার্গেট তাদের কয়েকটি মেয়ে এবং যারা তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। আবার অপর দিক থেকেও এগিয়ে আসছে খৃষ্টানদের বিশজন কমাণ্ডো, একুশতম ব্যক্তি তাদের কমাণ্ডার। তাদেরও লক্ষ্য সেই মেয়েরা। কিন্তু তাদের দুর্বলতা হলো, তাদের বাহন নেই। পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে তারা। মজার

ব্যাপার হলো, দু' পক্ষের কারুর-ই জানা নেই, যাদের উদ্দেশ্যে এ অভিযান, তারা কোথায়।

খৃষ্টানদের কমাণ্ডো দলটি পরদিন সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলে। এখন তারা যে স্থানে অবস্থান করছে, সেখানকার কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই। উঁচু-নীচু এলাকা। চড়াই বেয়ে উপরে আরোহণের পর তারা দূরবর্তী একটি ময়দানে কতগুলো উট দেখতে পায়। অসংখ্য খেজুর গাছসহ অন্যান্য গাছও আছে সেখানে। তারা দেখতে পায়, উটগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে পিঠ থেকে মাল নামানো হচ্ছে। বার-চৌদ্দটি ঘোড়াও আছে সেখানে। সেগুলোর আরোহীদেরকে সৈনিক বলে মনে হলো। আর যারা আছে, সবাই উষ্ট্রচালক। দেখে থেমে যায় এই একুশ কমাণ্ডোর কাফেলা। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এ মুহূর্তে যা একান্ত প্রয়োজন, তা-ই পেয়ে গেছি এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে সকলের চোখে-মুখে। কাফেলাকে থামিয়ে কমাণ্ডার বললো— 'সত্যমনে ক্রুশের উপর হাত রেখে আমরা শপথ করে এসেছিলাম। ঐ দেখ, ক্রুশের কারিশ্‌মা। জাজ্জ্বলমান অলৌকিক ব্যাপার। আকাশ থেকে খোদা তোমাদের জন্য সওয়ারী পাঠিয়েছেন। তোমাদের কারো মনে কোন পাপবোধ, কর্তব্যে অবহেলা কিংবা জান বাঁচিয়ে পালাবার ইচ্ছা থাকলে এ মুহূর্তে তা ঝেড়ে ফেলে দাও। খোদার পুত্র– যিনি মজলুমের বন্ধু, জালিমের দুশমন– আকাশ থেকে তোমাদের সাহায্যে নেমে এসেছেন।'

ক্লান্তির ছাপ উবে যায় সকলের চেহারা থেকে। মুহূর্ত মধ্যে ঝরঝরে হয়ে উঠে অবসন্ন দেহগুলো। আনন্দের দ্যুতি খেলে উঠে সকলের চোখে-মুখে। কিন্তু সশস্ত্র সৈনিকদের মোকাবেলা করে এতগুলো উট-ঘোড়ার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় বাহন ছিনিয়ে আনার প্রক্রিয়া কী হবে, তারা এখনো ভেবে দেখেনি।

প্রায় একশত উটের বিশাল এক বহর। যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ নিয়ে যাচ্ছে বহরটি। দেশের অভ্যন্তরে বর্তমানে শত্রুর আশঙ্কা নেই ভেবে কাফেলার নিরাপত্তার তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সঙ্গে দেয়া হয়েছে মাত্র দশজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। উষ্ট্রচালকরা সকলে নিরস্ত্র। রাত যাপনের জন্য এখানে অবতরণ করে ছাউনি ফেলেছে তারা।

খৃষ্টান বাহিনীর কমাণ্ডার তার কমাণ্ডোদেরকে একটি নিম্ন এলাকায় বসিয়ে রাখে। কমাণ্ডার কাফেলায় ক'টি উট, ক'টি ঘোড়া, ক'জন সশস্ত্র মানুষ এবং

আক্রমণ করলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার তথ্য নেয়ার জন্য দু' ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। তারপর তারা রাতে আক্রমণ পরিচালনার স্কীম প্রস্তুত করতে বসে যায়। তাদের না আছে অস্ত্রের অভাব, না আছে আগ্রহ-স্পৃহার কমতি। যে কেউ নিজের জীবন নিয়ে খেলতে প্রস্তুত।

তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া লোক দু'টো ফিরে আসে মধ্য রাতের অনেক আগেই। এসে তারা জানায়, কাফেলায় সশস্ত্র আরোহী আছে দশজন। তারা এক স্থানে একত্রে ঘুমিয়ে আছে। ঘোড়াগুলো বাঁধা আছে অন্যত্র। উষ্ট্রচালকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে শুয়ে আছে নানা জায়গায়। মাল-পত্র বেশীর ভাগ বস্তায় ভরা। উষ্ট্রচালকদের নিকট কোন অস্ত্র নেই। আক্রমণ করে সফল হওয়া তেমন কঠিন হবে না।

কাফেলার লোকেরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসে খৃষ্টান কমাণ্ডো। চলে আসে একেবারে নিকটে। আগে আক্রমণ হয় ঘুমন্ত সৈনিকদের উপর। টের পেয়ে চোখ খুলতে না খুলতে পলকের মধ্যে অনেকগুলো তরবারী ও খঞ্জরের উপর্যুপরী আঘাতে লাশ হয়ে যায় সব ক'জন।

খৃষ্টান গেরিলারা তাদের এ অভিযান এত নীরবে সম্পন্ন করে ফেলে যে, অন্যত্র ঘুমিয়ে থাকা উষ্ট্রচালকরা টেরই পেলো না। চোখও খুললো না একজনেরও। যাদের চোখ খুললো, কী হচ্ছে বুঝে উঠতে পারলো না তারা। যার মুখে শব্দ বের হলো, তার সে শব্দ-ই জীবনের শেষ উচ্চারণ বলে প্রমাণিত হলো।

এবার উষ্ট্রচালকদের সন্ত্রস্ত করার জন্য চীৎকার জুড়ে দেয় কমাণ্ডোরা। তারা জেগে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধড়মড় করে উঠে বসে বিহ্বল নেত্রে এদিক-ওদিকে তাকাতে শুরু করে। চেচামেচি করে ওঠে উটগুলো। এবার উষ্ট্রচালকদের কচুকাটা করতে শুরু করে খৃষ্টান কমাণ্ডোরা। পালিয়ে যায় অল্প ক'জন। বাকীরা নির্মম গণহত্যার শিকার হয় খৃষ্টান কমাণ্ডোদের হাতে। খৃষ্টান কমাণ্ডার চীৎকার করে বলে— 'এগুলো মুসলমানদের রসদ, ধ্বংস করে দাও সব। উটগুলোকেও মেরে ফেলো।' সঙ্গে সঙ্গে তরবারীর আঘাত শুরু হয়ে যায় উটগুলোর পিঠে। পশুগুলোর করুণ চীৎকারে ভারী হয়ে উঠে নিঝুম রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ। ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কমাণ্ডার। গুণে দেখে বারটি। দশটি আরোহণের যোগ্য হলেও অবশিষ্ট দু'টি কাজের নয়। নয়টি উট আগেই সরিয়ে রেখেছিলো সে।

রাত শেষে ভোর হলো। পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হলো। এক বীভৎস ভয়ানক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো ছাউনি। অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে আছে এদিক-সেদিক। মারা গেছে অনেক উট। কোনটি এখনো ছট্ফট্ করছে। এদিক-সেদিক পালিয়ে গেছে কিছু। সবদিকে রক্ত আর রক্ত, যেন রাতে রক্তের বৃষ্টি হয়েছিলো এ স্থানটিতে। খুলে ছিড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রসদের বস্তাগুলো। তছনছ হয়ে গেছে সব খাদ্যদ্রব্য। রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে সব। একজন জীবিত মানুষও নেই এখানে। বারটি ঘোড়াও উধাও। যে উদ্দেশ্যে খৃষ্টানদের এ অভিযান, এক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করে কেটে পড়েছে তারা। এবার তীব্রগতিতে শিকারের সন্ধানে এগিয়ে যেতে পারবে খৃষ্টান কমাণ্ডোরা।

মুবীর রূপ-যৌবন আর মদ-মাদকতায় বালিয়ানের মন-মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে আছে। মুবী আর মদ, মদ আর মুবী এ-ই তার একমাত্র ভাবনা। তদুপরি এখন তার হাতে এসেছে আরো সাতটি পরমাসুন্দরী যুবতী। মুবীর চেয়ে এরাও কোন অংশে কম নয়। বিপদাপদের কথা ভুলে-ই গেছে সে। মুবী তাকে বারবার বলছে, এতো বেশী থেমে থাকা ঠিক হচ্ছে না। যতো দ্রুত সম্ভব আমাদের সমুদ্রের নিকট পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। শত্রুরা আমাদের ধাওয়া করবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

কিন্তু বালিয়ান রাজার ন্যায় অট্টহাসির তোড়ে ভাসিয়ে দেয় মুবীর সতর্কবাণী। মুবী যে রাতে বালিয়ানকে দিয়ে মেয়েদের উদ্ধার করিয়েছিলো, তার পরের রাতে এক স্থানে ছাউনি ফেলেছিলো বালিয়ান। সে রাতে সে মুবীকে বলেছিলো, আমরা সাতজন পুরুষ আর তোমরা সাতটি মেয়ে। আমার এ ছয়টি বন্ধু বড় বিশ্বস্ততার সাথে আমার সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের উপস্থিতিতে তাদের চোখের সামনে আমি তোমার সঙ্গে রং-তামাশা করছি। তারপরও তারা কিছু বলছে না। এবার আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করতে চাই। অপর ছয়টি মেয়ের এক একজনকে আমার এক এক বন্ধুর হাতে তুলে দাও আর তাদের বলো, এ তোমাদের ত্যাগের উপহার।

'এ হতে পারে না। আমরা বেশ্যা মেয়ে নই। আমি বাধ্য ছিলাম বলেই তোমার খেলনা হয়ে আছি। কিন্তু এ মেয়েগুলো তোমার কেনা দাসী নয় যে, ইচ্ছে হলো আর তাদেরকে বন্ধুদের মাঝে বন্টন করে দেবে।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো মুবী।

'আমি তোমাদেরকে কখনো সম্ভ্রান্ত মনে করি না। তোমরা প্রত্যেকে আমাদের জন্য নিজ দেহের উপহার নিয়েই এসেছো। এই মেয়েরা না জানি কত পুরুষকে

সঙ্গ দিয়ে এসেছে। তাদের একজনও মরিয়ম নয়।' আবেশমাখা রাজকীয় ভঙ্গিতে বললো বালিয়ান।

আমরা কর্তব্য পালনের স্বার্থে-ই আমাদের দেহকে পুরুষের সামনে উপহার হিসেবে পেশ করে থাকি। আমোদ করার জন্য পুরুষের নিকট যাই না। আমাদের দেশ ও ধর্ম আমাদের উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সে কর্তব্য পালনের নিমিত্ত আমরা আপন দেহ, রূপ ও সম্ভ্রমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। এ যাত্রা আমাদের অর্পিত কর্তব্য পূরণ হয়ে গেছে। এখন তুমি যা করছো ও বলছো, সব-ই নিছক বিলাসিতা, ধর্মহীন কাজ, যা আমাদের কাম্য নয়, কর্তব্যও নয়। আমরা বিশ্বাস করি, যেদিন আমরা বিলাসিতায় মেতে উঠবো, সেদিন থেকে-ই ক্রুশের পতন শুরু হবে। প্রশিক্ষণে আমাদের বলা হয়েছে, একজন মুসলিম কর্ণধারকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনে দশজন মুসলমানের সঙ্গে রাত-যাপন করাও বৈধ এবং পুণ্যের কাজ। মুসলমানদের একজন ধর্মগুরুকে নিজের দেহের পরশে অপবিত্র করাকে আমরা মহা পুণ্যকর্ম মনে করি।' বললো মুবী।

'তার মানে তুমি আমাকে ক্রুশের অস্তিত্বের স্বার্থে ব্যবহার করছো! তুমি কি আমাকে ক্রুশের মুহাফিজ বানাবার চেষ্টা করছো?' বললো বালিয়ান। ধীরে ধীরে জাগ্রত হতে শুরু করে বালিয়ানের অনুভূতি।

'কেন, এখনো কি তোমার সন্দেহ আছে? একজন ক্রুসেডারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে কী উদ্দেশ্যে?' বললো মুবী।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর শাসন থেকে মুক্তি অর্জন করার জন্য– ক্রুশের হেফাজতের জন্য নয়। আমি মুসলমান; কিন্তু তার আগে আমি সুদানী।' বললো বালিয়ান।

'আমি সর্বাগ্রে ক্রুশের অনুসারী– খৃষ্টান। তারপর আমি আমার দেশের একটি সন্তান।' এই বলে মুবী বালিয়ানের ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে আবার বলে, ইসলাম কোন ধর্ম-ই নয়। সে কারণে তুমি দেশকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিচ্ছো। এটা তোমার নয়– তোমার ধর্মের দুর্বলতা। আমার সঙ্গে তুমি সমুদ্রের ওপারে চলো; আমার ধর্ম কী জিনিস, তোমাকে দেখাবো। তখন নিজ ধর্মের কথা তুমি ভুলে-ই যাবে।'

'যে ধর্ম তার অনুসারী মেয়েদের পর-পুরুষের সঙ্গে রাতযাপন, নিজে মদপান করা এবং অন্যকে মদপান করানোকে পুণ্যের কাজ মনে করে, সে ধর্মকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি, হাজারবার অভিসম্পাত করি আমি সেই ধর্মকে।'

অকস্মাৎ জেগে উঠে বালিয়ান। তারপর বলে— 'আমার কাছে তুমি তোমার সম্ভ্রম বিলীন করোনি, বরং তুমি-ই আমার ইজ্জত লুট করে নিয়ে গেছো। আমি তোমাকে নই, বরং তুমি-ই আমাকে খেলনা বানিয়ে রেখেছো।'

'একজন মুসলমানের ঈমান ক্রয় করার জন্য সম্ভ্রম তেমন বেশী মূল্য নয়। আমি তোমার সম্ভ্রম লুটিনি, লুট করেছি তোমার ঈমান। তবে এখন আমি তোমাকে ভবঘুরে অবস্থায় পথে ফেলে যাবো না। আমি তোমাকে নতুন এক আলোর জগতে নিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে হীরা-মাণিক্যের ন্যায় চকমকে উজ্জ্বল এক জীবন দান করবো আমি।' বললো মুবী।

'আমি তোমার সেই আলোর জগতে যেতে চাই না।' বললো বালিয়ান।

'দেখ বালিয়ান! একজন লড়াকু পুরুষ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ না করে পারে না। তুমি আমার সওদা বরণ করে নিয়েছো। তোমার ঈমানটা ক্রয় করে সেটি আমি মদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি; তোমার চাহিদা অনুপাতে আমি তোমাকে মূল্য দিয়েছি। এতটা দিন তোমার দাসী, তোমার স্ত্রী হয়ে রইলাম। তুমি এ সওদা থেকে ফিরে যেও না; একটি অবলা নারীকে ধোঁকা দিওনা।' বললো মুবী।

'সমুদ্রের ওপারে নিয়ে তুমি আমাকে যে আলো দেখাবার কথা বলছো, সে আলো আমাকে এখানেই তুমি দেখিয়ে দিয়েছো। আমার ভবিষ্যত, আমার শেষ পরিণতি এখন-ই তোমার হীরে-মাণিক্যের মতো চমকাতে শুরু করেছে।' বললো বালিয়ান।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলছিলো মুবী। কিন্তু বালিয়ান গর্জে উঠে বললো, খামুশ মেয়ে! একটি কথাও আর তোমার শুনতে চাই না আমি। আমি মিসরের গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবীর দুশমন হতে পারি; কিন্তু আমি সেই মহান রাসূলের শত্রু নই, যার আদর্শ রক্ষার জন্য সালাহুদ্দীন আইউবী তোমাদের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন। সেই রাসূলের নামে আমি মিসর-সুদানকে উৎসর্গ করতে পারি। আমি সেই মহান ও পবিত্র আদর্শের বদৌলতে সালাহুদ্দীন আইউবীর সামনে অস্ত্রসমর্পণও করতে পারি।'

'তোমাকে আমি কতোবার বলেছি, মদ কম পান করো। একদিকে অপরিমিত মদ, অপরদিকে সারাটা রাত জেগে আমার দেহটা নিয়ে খেলা করা; তোমার মাথাটা-ই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। তুমি একথাটাও ভুলে গেছো যে, আমি তোমার স্ত্রী।' বললো মুবী।

'আমি কোন বেশ্যা খৃষ্টানের স্বামী হতে চাই না।' বললো বালিয়ান। বালিয়ানের নজর পড়ে মদের বোতলের উপর। অমনি বোতলটি হাতে নিয়ে

ছুঁড়ে মারে দূরে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। বন্ধুদের ডাক দেয়। ডাক শুনে দৌড়ে আসে সকলে। সে বলে, এই মেয়েগুলো, বিশেষ করে এ মেয়েটি এখন থেকে তোমাদের কয়েদী। এদের নিয়ে কায়রো ফিরে চলো। প্রস্তুত হও, জল্দি করো।

'কায়রো! আপনি কায়রো যেতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমি কায়রো-ই যেতে চাচ্ছি। অবাক্ হওয়ার কিছু নেই। এই বালুকাময় মরু প্রান্তরে ভবঘুরের ন্যায় আর কতকাল ঘুরে বেড়াবো? যাবো কোথায়? চলো, ঘোড়ায় যিন বাঁধো। এক একটি মেয়েকে এক একটি ঘোড়ায় বসিয়ে বেঁধে নিয়ে চলো।'

❖ ❖ ❖

মরুভূমিতে ঘোড়া চলবার সময় তেমন শব্দ হয় না। উট চলে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। চোখে না দেখলে মরুভূমিতে উটের আগমন টের পাওয়া যায় না। বালিয়ান যখন মুবীর সঙ্গে কথা বলছিলো, তখন একটি উট ছোট্ট একটি বালির ঢিবির আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের গতিবিধি অবলোকন করছিলো। কিন্তু তা টের-ই পাইনি বালিয়ান। লোকটি খৃষ্টান কমাণ্ডো দলের একজন সদস্য। দলের কমাণ্ডার অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। বালিয়ানের তাঁবুর প্রায় আধা মাইল দূরে ছাউনি ফেলেছে সে। শিকার যে এতো কাছে, মাত্র আধা মাইল দূরে, তা বুঝতে-ই পারেনি কমাণ্ডার। বুদ্ধি করে সে আশপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিন কমাণ্ডোকে দায়িত্ব দেয়, উটে চড়ে তারা আশপাশে ঘুরে-ফিরে দেখে আসবে এবং আশঙ্কার কিছু চোখে পড়লে কমাণ্ডারকে অবহিত করবে। উট ছিলো এ কাজের উপযুক্ত বাহন।

তিন আরোহী চলে যায় তিন দিকে। এখানকার সমগ্র এলাকাটিই এমন যে, গোটা এলাকা যে কোন কাফেলার অবস্থানের জন্য বেশ উপযোগী। তাই এখানে এসে-ই কমাণ্ডার ভাবলো, অন্য কোন কাফেলা এখানে ছাউনি ফেলে থাকতে পারে।

এক স্থানে আলোর মত কিছু একটা চোখে পড়ে এক আরোহীর। সেদিকে এগিয়ে চলে সে। বস্তুটি একটি মশাল; জ্বলছে বালিয়ানের অস্থায়ী তাঁবুতে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটি টিলার পিছনে দাঁড়িয়ে যায়। টিলাটি উচ্চতায় এতটুকু যে, উটের উপর বসে টিলার উপর দিয়ে সম্মুখে দেখা সম্ভব।

ক্ষীণ আলোতে কয়েকটি মেয়ে চোখে পড়ে তার। সংখ্যায় ছয়জন। কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে বসে গল্প করছে তারা। তাদের থেকে খানিক দূরে বসে

আছে আরো এক জোড়া নারী-পুরুষ। কথা বলছে তারাও। একপাশে বাঁধা আছে কয়েকটি ঘোড়া।

খৃষ্টান আরোহী উটের মোড় ঘুরিয়ে দেয় পিছন দিকে। ধীর-সন্তর্পণে চলে কিছু পথ। তারপর এগিয়ে চলে দ্রুত। আধা মাইল পথ উটের জন্য কিছু-ই নয়। অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যায় ছাউনিতে, কমাণ্ডারের কাছে। সুসংবাদ জানায়, শিকার আমাদের হাতের মুঠোয়.। সময় নষ্ট না করে অপারেশনের প্রস্তুতি নেয় কমাণ্ডার। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে শিকার সতর্ক হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় পায়ে হেঁটে-ই রওনা হয় তারা।

খৃষ্টান কমাণ্ডো দলটি যখন বালিয়ানের তাঁবুর নিকটে পৌঁছে, ততক্ষণে বালিয়ান নির্দেশ জারি করে ফেলেছে, এক একটি মেয়েকে এক একটি ঘোড়ায় বেঁধে ফেলো। বন্ধুরা বিস্মিত অভিভূতের ন্যায় তাকিয়ে আছে বালিয়ানের প্রতি। তাদের ধারণা, লোকটার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে হঠাৎ করে এমন খাপছাড়া কথা বলবে কেন! এ নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয় বন্ধুরা। অনেক সময় নষ্ট হওয়ার পর বালিয়ান তাদের বুঝাতে সক্ষম হয়, সে যা বলছে, হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে বুঝে-শুনেই বলছে এবং এ পরিস্থিতিতে কায়রো ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করাই কল্যাণকর।

পাণ্ডুর মুখে অপলক নেত্রে ফ্যাল ফ্যাল করে বালিয়ানের প্রতি তাকিয়ে আছে মেয়েগুলো। ঘোড়ায় যিন কষে বালিয়ানের সঙ্গীরা। ধরে ধরে মেয়েগুলোকে ঘোড়ার পিঠে বাঁধবে বলে– ঠিক এমন সময়ে তাদের উপর নেমে আসে অভাবিত এক মহাবিপদ। চারদিক ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে বসে খৃষ্টান কমাণ্ডোরা। বালিয়ান বারবার চীৎকার করে উচ্চ কণ্ঠে বলছে— 'আমরা অস্ত্র ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা কায়রো রওনা হচ্ছি। আক্রমণ থামাও, আমাদের কথা শোন।'

আক্রমণকারীদেরকে বালিয়ান সুলতান আইউবীর বাহিনী মনে করেছিলো। কিন্তু তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাই কোন ফল হলো না বালিয়ানের ঘোষণায়। একটি খঞ্জর এসে ঠিক হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে স্তব্ধ করে দেয় তাকে। এ আকস্মিক আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারলো না বালিয়ানের বন্ধুরা। নিজেদের সামলে নেয়ার আগে-ই শেষ হয়ে যায় একে একে সকলে।

খৃষ্টান কমাণ্ডোদের অভিযান সফল। যাদের জন্য সমুদ্রের ওপার থেকে এসে তাদের এ ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণ, তারা এখন মুক্ত। বিলম্ব না করে তারা নিজেদের ছাউনিতে নিয়ে যায় মেয়েগুলোকে।

কমাণ্ডারকে চিনে ফেলে মেয়েরা। সেও তাদের-ই বিভাগের একজন গুপ্তচর। সেখানেই রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। পাহারার জন্য দাঁড়িয়ে যায় দু'জন সান্ত্রী। তারা ছাউনির চার পাশে টহল দিচ্ছে।

সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনীটি এখনো এ স্থান থেকে বেশ দূরে, বালিয়ান কয়েদী মেয়েদেরকে যেখান থেকে মুক্ত করেছিলো সেখানে। অকুস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া রক্ষী তাদের রাহ্‌বর। যেখানে তাদের উপর আক্রমণ হয়েছিলো, বাহিনীটিকে সে আগে সেখানে নিয়ে যায়। তারা একটি মশাল জ্বালিয়ে জায়গাটা দেখছে। রবিন ও তার সঙ্গীদের লাশগুলো পড়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। লাশগুলো এখন আর অক্ষত নেই। শৃগাল-শকুনেরা ছিঁড়ে-ফেড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে দেহগুলো। তখনো কাড়াকাড়ি চলছিলো লাশগুলো নিয়ে। মানুষ দেখে এইমাত্র কেটে পড়েছে হিংস্র পশুগুলো।

রক্ষী যেখান থেকে ঘোড়া নিয়ে পলায়ন করেছিলো, সে কমাণ্ডারকে সেখানে নিয়ে যায়। মশালের আলোতে মাটি পর্যবেক্ষণ করেন কমাণ্ডার। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন পাওয়া গেলো। রবিন তার দলবল নিয়ে কোন্‌দিকে গেলো, তাও অনুমান করা গেলো। কিন্তু রাতের বেলা সে পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা তো সম্ভব নয়, কালক্ষেপণ করাও যাচ্ছে না। তবু তারা রাতটা সেখানেই অবস্থান করলো।

খৃষ্টান বাহিনীর ক্যাম্পের সকলে জেগে আছে। তারা সফলতার আনন্দে উৎফুল্ল। কমাণ্ডার সিদ্ধান্ত জানালো, আমরা শেষ রাতের আলো-আঁধারিতে রোম উপসাগর অভিমুখে রওনা হবো। শুনে মিগনানা মারিউস বললো, মিশন তো এখনো সম্পন্ন হয়নি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার কাজটা এখনো বাকি আছে। কমাণ্ডার বললো, মেয়েগুলোকে উদ্ধার করার জন্য যদি আমাদের কায়রো পৌঁছুতে হতো, তখন আমাদের এ কাজটাও করা সম্ভব ছিলো। এখন একদিকে আমরা কায়রো থেকে অনেক দূরে। অপরদিকে মেয়েদেরকে পেয়ে গেছি। এদেরকে নিরাপদে ওপারে নিয়ে যাওয়া-ই এ মুহূর্তে আমাদের মূল কাজ। তাছাড়া ওটা তো ছিলো একটা অতিরিক্ত বিষয়। কাজেই সে চিন্তা বাদ দিয়ে চলো, জল্‌দি রওনা হই।

মিগনানা মারিউস বললো— 'এটা আমার পরম লক্ষ্য। যে কোন মূল্যে কাজটা আমার সমাধা করতে-ই হবে। মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু এ মিশন থেকে আমাকে হটাতে পারবে না। আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার শপথ নিয়েছি। এ শপথ আমি বাস্তবায়ন না করে ক্ষান্ত হবো না। আমার প্রয়োজন

একজন পুরুষ সঙ্গী আর একটি মেয়ে।'

'দেখ, মারিউস! আমি কাফেলার কমাণ্ডার। কী করবো আর কী করবো না, সে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমার। তোমার কর্তব্য আমার আনুগত্য করা।' বললো কমাণ্ডার।

'আমি কারো হুকুমের গোলাম নই, আমরা সকলেই খোদার দাস।' বললো মিগনানা মারিউস।

ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে কমাণ্ডার। শাসিয়ে দেয় মারিউসকে। মিগনানা মারিউসের কাঁধে ঝুলানো তরবারী। সে-ও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কাঁধের তরবারীটা চলে আসে হাতে। উঁচিয়ে ধরে কমাণ্ডারের মাথার উপর। অবস্থা বেগতিক দেখে এক সঙ্গী এসে দাঁড়ায় মাঝখানে। নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে মারিউসকে। উর্ধ্বে তুলে ধরা তরবারিটা নামিয়ে ফেলে সে। তার চোখ ঠিক্‌রে আগুন ঝরছে যেন। মনে তার প্রচণ্ড ক্রোধ। বলে–

'আমি খোদার এক বিতাড়িত বান্দা। ত্রিশ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী। চলে গেছে পাঁচ বছর। আমার ষোল বছর বয়সের একটি বোন অপহৃতা হয়েছিলো। আমি গরীব মানুষ। বাবা বেঁচে নেই। মা অন্ধ। আমি ছোট ছোট কয়েকটি সন্তানের জনক। গতর খেটে তাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতাম। আমি গীর্জায় ক্রুশের উপর ঝুলান যীশুখৃষ্টের প্রতিকৃতির কাছে বহুবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি গরীব কেন? আমি তো কখনো পাপ করিনি। বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তো আমি এত পরিশ্রম করি, কিন্তু সংসারে অভাব কেন? খোদা আমার মাকে অন্ধ করলেন কেন? কিন্তু যীশুখৃষ্ট আমার জিজ্ঞাসার কোন জবাব দেননি!

যখন আমার কুমারী বোনটি অপহৃতা হয়ে গেলো, তখনও আমি গীর্জায় গিয়ে কুমারী মাতা মরিয়মের প্রতিকৃতির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আমার কুমারী বোনের উপর এভাবে বিপদ নেমে এলো কেন? সে তো জীবনে কখনো অপকর্ম করেনি। তবে কি খোদা তাকে এতো রূপ দিয়ে তার প্রতি জুলুম করলেন? কিন্তু না, মা মরিয়মের পক্ষ থেকেও আমি কোন জবাব পেলাম না।

একদিন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির এক চাকর আমাকে বললো, তোমার বোন আমার মনিবের ঘরে আছে। আমার মনিব বড় বিলাসপ্রিয় মানুষ। সে সুন্দরী কুমারী মেয়েদের অপহরণ করে আনে আর তাদের সঙ্গে ক'দিন ফুর্তি করে কোথায় যেন গায়েব করে ফেলে। রাজ দরবারে লোকটির যাওয়া-আসা, উঠা-বসা। মানুষ তাকে বেশ শ্রদ্ধা করে। বাদশাহ তাকে একটি তরবারীও

উপহার দিয়েছেন। এত পাপিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট। দুনিয়ার আইন-কানুন তার হাতের খেলনা।

সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ঘরে গেলাম এবং আমার বোনকে ফিরিয়ে দিতে বললাম। লোকটি ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। আমি আবারো গীর্জায় গেলাম। যীশুখৃষ্ট ও মা মরিয়মের প্রতিকৃতির নিকট দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করলাম। খোদাকে ডাকলাম। কিন্তু আমার আকুল আহ্বানে কেউ সাড়া দিলো না। আমি যখন সেদিন গীর্জায় প্রবেশ করি, তখন গীর্জায় আর কেউ ছিলো না। শেষে পাদ্রী আসলেন। তিনি আমাকে দেখে ধমক দিয়ে বাইরে বের করে দিলেন এবং বললেন— 'এখান থেকে দু'টি মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। তুমি জল্‌দি চলে যাও, অন্যথায় তোমাকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেবো।' আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, এটা কি খোদার ঘর নয়? তিনি বললেন, আমাকে না বলে তুমি এ ঘরে ঢুকলে কেন? পাপের ক্ষমা-ই যদি চাইতে হয়, তাহলে আমার কাছে এসো; কি পাপ করেছো বলো, আমি খোদাকে বলবো তোমাকে ক্ষমা করে দিতে। খোদা সরাসরি কারো কথা শুনেন না। যাও, বের হও এখান থেকে।' এই বলে তিনি খোদার ঘর থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন।

মিগনানা মারিউসের করুণ কণ্ঠের স্মৃতিচারণে সকলে অভিভূত হয়ে পড়ে। অশ্রু ঝরতে শুরু করে মেয়েদের চোখ বেয়ে। মরুভূমির রাতের নিস্তব্ধতায় তার কথাগুলো সকলের মনে যাদুর মতো রেখাপাত করে।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে মিগনানা আবার বলে, সেদিন আমি পাদ্রী, যীশু-খৃষ্ট, কুমারী মরিয়মের প্রতিকৃতি এবং খোদার প্রতি তীব্র সংশয় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মনে প্রশ্ন জাগলো, এরা যদি সত্য-ই হয়ে থাকে, তাহলে আমার প্রতি এতো অত্যাচার কেন? কেন এরা কেউ আমার আকুতিতে সাড়া দিলো না? বাড়ি গেলে অন্ধ মা জিজ্ঞেস করলেন, বাছা! আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছো? স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, জিজ্ঞেস করলো সন্তানরা। যীশু-মরিয়ম-খোদার মত আমিও নীরব রইলাম, কথা বললাম না। কিন্তু আমার সহ্য হলো না। ভেতর থেকে একটি প্রচণ্ড ঝড় উঠে এলো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জ্ঞানশূন্যের মত আমি সারাদিন ঘুরতে থাকি।

সন্ধ্যার সময় একটি খঞ্জর ক্রয় করলাম। সমুদ্রের কূলে গিয়ে পায়চারী করতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার নেমে এলো। এবার আমি একদিকে হাঁটা দিলাম। আমার বোন যে গৃহে বন্দী, সে গৃহের আলো চোখে পড়লো।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। সতর্কপদে চলে গেলাম মহলের পিছনে। আমি স্বল্পবুদ্ধির হাবাগোবা ধরনের মানুষ। কিন্তু এক্ষণে এক বুদ্ধি খেলে যায় আমার মাথায়।

আমি মহলের পিছন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটি কক্ষ থেকে কোলাহলের শব্দ কানে ভেসে এলো। মদের আড্ডা বসেছিলো বোধ হয়। আমি একটি কক্ষে ঢুকতে চাইলাম। সামনে এসে দাঁড়ায় চাকর, বাধা দেয় আমাকে। তার বুকে খঞ্জর ধরে বোনের নাম বলে জিজ্ঞেস করলাম, ও কোথায় আছে বল্। চাকর সিঁড়ি বেয়ে আমাকে উপরে নিয়ে গেলো। আমাকে নিয়ে একটি কক্ষের দ্বারে দাঁড়িয়ে বললো, এখানে। আমি ভিতরে ঢুকে পড়লাম; অমনি বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায় কক্ষের দরজা। ভিতরটা শূন্য।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেলো। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ঢুকে পড়লো কতগুলো মানুষ। হাতে তাদের তরবারী আর লাঠি। আমি কক্ষের জিনিস-পত্র তুলে তুলে তাদের প্রতি ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। পাগলের মতো যেখানে যা পেলাম, ভেঙ্গে চুরমার করলাম। তারা আমাকে ধরে ফেললো, অনেক মারলো। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন আমি হাতকড়া আর ডান্ডা-বেড়ীতে বাঁধা। আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলো, আমি ডাকাতি করেছি, বাদশাহর একজন দরবারীর ঘরে ভাংচুর করেছি, হত্যা করার উদ্দেশ্যে তিনজনকে জখম করেছি।

আমার আর্জি-ফরিয়াদ, আকুতি-মিনতি কেউ শুনলো না। ত্রিশ বছরের দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে আমি নিক্ষিপ্ত হলাম কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। কেটেছে মাত্র পাঁচ বছর। এতদিনে আমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি। কারাজীবনের কষ্ট তোমরা জানো না। দিনে পশুর মত খাটান হয় আর রাতে কুকুরের মতো জিঞ্জির পরিয়ে ফেলে রাখা হয় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এ পাঁচ বছরে আমি জানতে পারিনি, আমার অন্ধ মা এবং স্ত্রী সন্তানেরা বেঁচে আছেন কি-না। ভয়ঙ্কর ডাকাত মনে করে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পর্যন্ত দেয়া হয়নি কাউকে।

আমি সর্বক্ষণ ভাবতাম, খোদা সত্য না আমি সত্য। শুনেছিলাম, খোদা নিরপরাধ লোকদের শাস্তি দেন না। তাই প্রশ্ন জাগে, তিনি আমায় কোন্ পাপের শাস্তি দিলেন? কোন্ অপরাধের কারণে আমার নিষ্পাপ সন্তানদের তিনি অসহায় বানালেন?

পাঁচ পাঁচটি বছর এ ভাবনা আমার মাথায় তোলপাড় করতে থাকে। এই কিছুদিন আগে দু'জন সেনা অফিসার যান কারাগারে। এখন আমরা যে মিশন

নিয়ে এসেছি, তারা তার জন্য লোক খুঁজছিলেন। আমি প্রথমে নিজেকে পেশ করতে চাইনি। কারণ, এসব হল রাজা-বাদশাদের লড়াই। আর কোন রাজার প্রতি-ই আমার শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু যখন আমি শুনলাম, কয়েকটি খৃষ্টান মেয়েকে মুসলমানদের কব্জা থেকে উদ্ধার করতে হবে, তখন আমার বোনের কথা মনে পড়ে যায়। আমাকে বলা হয়েছিলো, মুসলমান একটি ঘৃণ্য জাতি। আমি মনস্থ করলাম, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমি এ অভিযানে অংশ নেবো। মুসলমানদের কবল থেকে খৃষ্টান মেয়েদের উদ্ধার করে আনবো। খোদা যদি সত্য হয়ে থাকেন, তাহলে এর বদৌলতে আমার বোনকে তিনি খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করে দেবেন। অফিসারদের কাছে আমার সিদ্ধান্ত জানালাম। তারা আমাকে আরো বললেন, একজন মুসলমান রাজাকে হত্যা করতে হবে। আমি সে দায়িত্বও মাথায় তুলে নিলাম। নিজেকে পেশ করলাম তাদের হাতে। তবে শর্ত দিলাম, এর বিনিময়ে আমাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দিতে হবে, যা আমি আমার পরিবারের হাতে তুলে দেবো। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বললেন, যদি তুমি সমুদ্রের ওপারে মারাও যাও, তবু তোমার পরিবারকে আমরা এতো পরিমাণ অর্থ দেবো, যা তারা জীবনভর খেয়ে বাঁচতে পারবে, তাদের কারো কাছে হাত পাততে হবে না।

দু'জন সঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করে মিগনানা মারিউস বললো, এরা দু'জনও আমার সঙ্গে কারাগারে ছিলো। এরাও নিজেদেরকে অফিসারদের হাতে তুলে দেয়। খুটিয়ে খুটিয়ে তারা আমাদের নানা কথা জিজ্ঞেস করে। আমরা নিশ্চয়তা দেই, নিজের জাতি ও ধর্মের সঙ্গে আমরা প্রতারণা করবো না। আমরা মূলত নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য-ই জীবন বিক্রি করে দিয়েছি।

কারাগার থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে এক পাদ্রী আমাদেরকে বললেন, 'মুসলমান হত্যা করলে খোদা সব গুনাহ মাফ করে দেন। আর যদি তোমরা খৃষ্টান মেয়েদের মুক্ত করে আনতে পারো, তাহলে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।' আমি পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, খোদা আছেন কোথায়? জবাবে তিনি যা বললেন, তাতে আমি সান্ত্বনা পেলাম না। ক্রুশের উপর হাত রেখে আমি শপথ করলাম।

আমাদেরকে কারাগার থেকে বের করে আনা হলো। আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার সামনে আমার পরিবারকে প্রচুর অর্থ দেয়া হলো। আমি আশ্বস্ত হলাম। আমার বন্ধুরা! তোমরা আমাকে এখন সেই শপথ পূরণ করতে দাও। খোদা কোথায় আছেন, দেখতে চাই আমি। আচ্ছা, একজন মুসলমানকে হত্যা করলে আমি খোদাকে দেখতে পাবো তো?'

'তুমি একটা বদ্ধ পাগল। এতক্ষণ যা বক্‌বক্‌ করলে, তাতে আমি বিবেক-বুদ্ধির গন্ধও পেলাম না।' বললো কমাণ্ডার।

'কেন, ইনি বেশ চমৎকার কথা বলেছেন। আমি এর সঙ্গে যাবো।' বললো মিগনানার এক সঙ্গী।

'আমার একটি মেয়ের প্রয়োজন'– মিগনানা মারিউস মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললো– 'আমার সঙ্গে যে মেয়েটি যাবে, তার জীবন-সম্ভ্রমের দায়িত্বও আমার। মেয়ে ছাড়া সালাহুদ্দীন আইউবীর নিকট পৌছতে পারবো না। এসে অবধি আমি ভাবছি, আইউবীর সঙ্গে একাকী কিভাবে সাক্ষাৎ করতে পারি।'

বসা থেকে উঠে মিগনানা মারিউসের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ায় মুবী। বলে— 'আমি যাবো এর সঙ্গে।'

'শোন মুবী! আমরা তোমাদের বড় কষ্টে মুক্ত করে এনেছি। এখন আমি তোমাকে এমন বিপজ্জনক মিশনে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না।' বললো কমাণ্ডার।

'আমাকে সম্ভ্রম হারাবার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর শয়নকক্ষে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারবো। আমি জানি, মুসলমানদের মর্যাদা যতো উঁচু, সুন্দরী নারীর প্রতি তারা ততো দুর্বল। আমি এমন কৌশল অবলম্বন করবো, আইউবী বুঝতে-ই পারবে না, এ-ই তার জীবনের সর্বশেষ নারীদর্শন।' বললো মুবী।

দীর্ঘ আলোচনা-তর্কের পর মিগনানা মারিউস তার এক সঙ্গী ও একটি মেয়েকে নিয়ে কাফেলা ত্যাগ করে রওনা হয়। তাকে দু'আ দিয়ে সকলে বিদায় জানায়। দু'টি উট নেয় সে। একটিতে সওয়ার হয় মুবী, অপরটিতে তারা দু'জন। তাদের সঙ্গে আছে মিসরী মুদ্রা, সোনার আশরাফী। মিগনানা ও তার সঙ্গীর পরনে জুব্বা। এতদিনে মিগনানার দাঁড়িগুলো বেশ লম্বা হয়ে গেছে। কারাগারের অসহনীয় গরম এবং হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কারণে তাঁর গায়ের রং এখন আর ইতালীদের মত গৌর নয়; অনেকটা কালো হয়ে গেছে। এখন তাকে ইউরোপিয়ান বলে সন্দেহ করার উপায় নেই। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য আলাদা পোশাক দিয়ে পাঠান হয়েছিলো তাদের। কিন্তু সমস্যা হলো, মিগনানা মারিউস ইতালী ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না। মিসরের ভাষা জানা আছে মুবীর। অপরজনও মিসরী ভাষা জানে না। এর একটা বিহিত না করলে-ই নয়।

তারা রাতারাতি-ই রওনা দেয়। অত্র অঞ্চলের পথ-ঘাট সব মুবীর চেনা। সে কায়রো থেকে-ই এসেছিলো। তার গায়েও একটি চোগা পরিয়ে দেয় মিগনানা। মাথায় পরিয়ে দেয় দোপাট্টার মত একটি চাদর।

❖❖❖

ভোরের আলোতে সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনী ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করে রওনা হয়ে পড়ে। খৃষ্টান কমাণ্ডোরা মেয়েদের নিয়ে রাত পোহাবার আগেই সমুদ্র অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। তারা তীব্রগতিতে এগিয়ে চলছে।

সূর্যাস্তের এখনো অনেক বাকি। হঠাৎ এক স্থানে আইউবী বাহিনীর চোখে পড়ে কয়েকটি লাশ। আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব দেখেই বলে ওঠেন, এ-যে বালিয়ানের লাশ! মুখাবয়ব তার সম্পূর্ণ অবিকৃত। পার্শ্বেই এলোপাতাড়ি পড়ে আছে তার ছয় বন্ধুর মৃতদেহ। শকুন-হায়েনারা তাদের দেহের অনেক গোশত খেয়ে ফেলেছে। অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে কাফেলা। বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছে না তারা। রক্ত বলছে, এরা মরেছে বেশীদিন হয়নি। লোকগুলো বিদ্রোহের রাতে মারা গিয়ে থাকলে এতদিনে রক্তের দাগ মুছে যেতো, থাকতো শুধু হাড়গোড়। বিষয়টি দুর্ভেদ্য ঠেকে তাদের কাছে।

অশ্বখুরের চিহ্ন ধরে আবার রওনা হয় কাফেলা। তীব্রগতিতে ঘোড়া হাঁকায়। আধা মাইল পথ অতিক্রম করার পর এবার উটের পায়ের দাগও চোখে পড়ে তাদের। এগিয়ে চলছে অবিরাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও তারা থামেনি। এখন তারা যে স্থানে চলছে, সেখান থেকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উঁচু উঁচু মাটির টিলা। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আঁকা বাঁকা একটিমাত্র পথ।

খৃষ্টান কমাণ্ডোরাও এগিয়ে যাচ্ছে এ পথে-ই। বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকার পরে বিশাল ধূ ধূ বালু প্রান্তর। পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করে-ই থেমে যায় পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম বাহিনী। রাত কাটায় সেখানে।

ভোর হতে-ই আবার রওনা দেয় তারা। পাড়ি দেয় বিশাল মরু এলাকা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা সামুদ্রিক আবহাওয়া অনুভব করে। তার মানে সমুদ্র আর বেশী দূরে নয়। কিন্তু শিকার এখানেও চোখে পড়ছে না। পথে একস্থানে খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট প্রমাণ দিলো, রাতে এখানে কোন কাফেলা অবস্থান নিয়েছিলো। ঘোড়া বাঁধার এবং পরে ঘোড়াগুলোর সমুদ্রের দিকে চলে যাওয়ার আলামতও দেখা গেলো। তারা মাটিতে ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আরো দ্রুত ঘোড়া হাঁকায়।

সম্মুখে এক স্থানে অবতরণ করে কাফেলা। ঘোড়াগুলোকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে, পানি পান করিয়ে আবার ছুটে চলে। সমুদ্রের বাতাসের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। সমুদ্রের লোনা  ঘ্রাণ অনুভূত হচ্ছে নাকে। আস্তে আস্তে চোখে পড়তে শুরু করে উপকূলীয় টিলা।

ঘোড়া যতো সামনে এগুচ্ছে, উপকূলীয় টিলাগুলো ততো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। একটি টিলার উপরে দু'জন মানুষ নজরে পড়ে মুসলিম বাহিনীর। এক নাগাড়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারা কাফেলার প্রতি। তারপর তীব্রবেগে নেমে পড়ে সমুদ্রের দিকে। পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেলার ঘোড়াগুলোর গতি আরো বেড়ে যায়। টিলার নিকটে এসে হঠাৎ থেমে যেতে হয় তাদের। কারণ, টিলার পিছনে যাওয়ার একাধিক পথ। উপরে উঠে সম্মুখে দেখে আসার জন্য প্রেরণ করা হয় একজনকে। লোকটি ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে যায় সেদিকে। একটি টিলায় উঠে শুয়ে শুয়ে তাকায় অপরদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে পেছনে। সেখান থেকেই ইঙ্গিতে সঙ্গীদের বলে, ঘোড়া থেকে নেমে জল্‌দি পায়ে হেঁটে এসো। আরোহীরা নেমে পড়ে ঘোড়া থেকে। দৌড়ে এসে দাঁড়ায় টিলার নিকট। সর্বাগ্রে উপরে ওঠেন আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব। সম্মুখে তাকান তিনি। তৎক্ষণাৎ পিছনে সরে নেমে আসেন নীচে। মুহূর্তের মধ্যে তার বাহিনীকে ছড়িয়ে দেন তিন দিকে। এক একজনকে পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে বলেন এক এক স্থানে।

বিপরীত দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি কানে আসছে। সুলতান আইউবীর গ্রেফতারকৃত গোয়েন্দা মেয়েদের ছিনিয়ে আনা খৃষ্টান কমাণ্ডো দল ঐখানে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রের ওপার থেকে এসে তারা যে স্থানে নৌকা বেঁধে রেখে অভিযানে নেমেছিলো, এই সেই জায়গা। অভিযান সফল করে এখন তাদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আপন দেশে ফিরে যাওয়ার পালা। তারা ঘোড়া থেকে নেমে এক এক করে নৌকায় উঠছে। ছেড়ে দিয়েছে ঘোড়াগুলো।

আচম্বিত তীরবর্ষণ শুরু হয় তাদের উপর। পালাবার পথ নেই। পাল্টা আক্রমণেরও সুযোগ নেই। তারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ক'জন লাফিয়ে উঠে নৌকায়। তারা রশি কেটে দিয়ে শপাশপ দাড় ফেলতে শুরু করে। পিছনে যারা রয়ে গেলো, তারা তীরের নিশানায় পরিণত হলো। নৌকায় করে পলায়নপর কমাণ্ডোদের থামতে বলা হয়। কিন্তু তারা থামছে না। বাতাস নেই। ধীরে ধীরে মাঝের দিকে চলে যাচ্ছে নৌকা। শোঁ শোঁ শব্দ করে বেশ ক'টি তীর গিয়ে বিদ্ধ হয় তাদেরও গায়ে। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় দাড়ের শব্দ। আরো এক ঝাঁক তীর ছুটে যায় নৌকায়। তারপর আরো এক ঝাঁক। গেঁথে গেঁথে দাঁড়িয়ে আছে লাশগুলোর গায়ে। মাঝি-মাল্লাহীন নৌকা দুলতে দুলতে স্রোতে ভেসে অল্পক্ষণের মধ্যে কূলে এসে ঠেকে। মুসলিম বাহিনী পাড়ে এসে ধরে ফেলে নৌকাটি। নৌকায় কোন প্রাণী নেই। আছে প্রাণহীন কতগুলো দেহ। তীরের আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে মেয়েরাও। গোটা কমাণ্ডোর বেঁচে নেই একজনও।

একটি খুটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো নৌকাটি। সাফল্যের গৌরব নিয়ে উপকূলীয় ক্যাম্প অভিমুখে রওনা হয় মুসলিম সেনারা।

❖❖❖

মুবী ও সঙ্গীকে নিয়ে কায়রোর একটি সরাইখানায় অবস্থান করছে মিগনানা মারিউস। এ সরাইখানাটি দু' ভাগে বিভক্ত। একাংশ সাধারণ ও নিম্নস্তরের মুসাফিরদের জন্য, অপর অংশ বিত্তশালী ও উচ্চস্তরের পর্যটকদের জন্য। ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরাও এ অংশে অবস্থান করে। এদের জন্য মদ, নারী ও নাচ-গানের ব্যবস্থা আছে। মিগনানা মারিউসের এসে অবস্থান নেয় এ অংশে। এসে পরিচয় দেয়, মুবী তার স্ত্রী আর সঙ্গের লোকটি তার ভৃত্য।

মুবীর রূপ-যৌবন সরাইখানার মালিক-কর্তৃপক্ষ এবং অবস্থানরত লোকদের মনে মিগনানা মারিউস এর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এমন একজন সুন্দরী যুবতী যার স্ত্রী, তিনি অবশ্যই একজন বিত্তশালী আমীর। মিগনানাকে বিশেষ গুরুত্বের চোখে দেখতে শুরু করে কর্তৃপক্ষ।

নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবীর বাড়ী-ঘর ও দফতর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে মুবী। মুবী জানতে পায়, সুলতান আইউবী সুদানীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন ও সুদানী বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। মুবী আরো জানতে পারে, সুলতান আইউবী সুদানী সালার ও কমাণ্ডার শ্রেণীর লোকদের হেরেম থেকে ললনাদের বিদায় করে দিয়েছেন এবং আবাদী জমি দিয়ে তাদের পুনর্বাসিত করছেন।

মিসরের ভাষা জানে না মিগনানা মারিউস। তথাপি সে আগুন নিয়ে খেলার মত এই ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে অবতরণ করলো। এটি হয়ত তার অস্বাভাবিক দুঃসাহস কিংবা চরম নির্বুদ্ধিতর পরিচয়। এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটন এবং এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের নিকটে পৌছার প্রশিক্ষণও তার নেই। তদুপরি সে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত। তারপরও সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করতে আসলো! কমাণ্ডার বলেছিলো— 'তুমি একটি বদ্ধ পাগল; বুদ্ধি বিবেকের বাষ্পও নেই তোমার মাথায়'। বাহ্যত পাগল-ই ছিলো মিগনানা মারিউস।

এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে, বড়দেরকে যারা হত্যা করে, তারা পাগল-ই হয়ে থাকে। বিকৃত-মস্তিষ্ক না হোক মাথার নাট-বোল্ট কিছুটা হলেও ঢিলে থাকে তাদের। ইতালীর এই সাজাপ্রাপ্ত লোকটির অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। তার কাছে এমন একটি সম্পদ আছে, যাকে সে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে শুধু। সে হলো মুবী। মুবী শুধু মিসরের ভাষা-ই জানতো না, বরং তাকে এবং তার নিহত ছয় সঙ্গী মেয়েকে মিসরী ও আরবী মুসলমানদের চলাফেরা,

উঠাবসা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সব সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কেও দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সে মুসলমান পুরুষদের মনের যথার্থ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অভিনয় করতে জানে ভালো। মুবীর সবচে' বড় গুণ, সে আঙ্গুলের ইশারায় পুরুষদের নাচাতে জানে। জানে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে যে কোন পুরুষের সামনে নিজেকে মেলে ধরতে।

সরাইখানার রুদ্ধ কক্ষে মিগনানা মারিউস, মুবী ও তাদের সঙ্গী কী আলোচনা করলো, কী পরিকল্পনা আঁটলো, তা কেউ জানে না। সরাইখানায় তিন-চারদিন অবস্থান করার পর মিগনানা মারিউস যখন বাইরে বের হয়, তখন তার মুখে লম্বা দাড়ি, চেহারার রং সুদানীদের ন্যায় গাঢ় বাদামী। এই বেশ তার কৃত্রিম হলেও দেখতে কৃত্রিম বলে মনে হলো না। পরনে সাধারণ একটি চোগা, মাথায় পাগড়ী ও রোমাল। মুবী আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃত। তার শুধু মুখমণ্ডলটাই দেখা যায়। কপালের উপর কয়েকটি রেশমী চুল সোনার তারের মত ঝক্ ঝক্ করছে। রূপের বন্যা বইছে তার চেহারায়। মেয়েটির প্রতি রাস্তার পথিকদের যার-ই দৃষ্টি পড়ছে, তারই চোখ আটকে যাচ্ছে। সঙ্গের লোকটির পরণে সাধারণ পোশাক। দেখে লোকটাকে এদের চাকর-ভৃত্য বলেই মনে হলো।

বাইরে উন্নত জাতের দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সরাইখানার কর্তৃপক্ষ মিগনানা মারিউসের জন্য ভাড়ায় এনে দিয়েছে ঘোড়া দু'টো। সে স্ত্রীকে নিয়ে ভ্রমণে যাবে বলেছিলো। মিগনানা মারিউস ও মুবী দু'জন দু'টি ঘোড়ায় চড়ে বসে। অপরজন ভৃত্যের মত তাদের পিছনে পিছনে হাঁটছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী কক্ষে উপবিষ্ট। তিনি সুদানীদের ব্যাপারে নায়েবদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এই ঝামেলা অল্প সময়ে শেষ করে ফেলতে চান সুলতান। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুলতান জঙ্গীর প্রেরিত বাহিনী, মিসরের নতুন ফৌজ এবং ওফাদার সুদানীদের সমন্বয়ে একটি যৌথ বাহিনী গঠন করবেন এবং অতিসত্ত্বর জেরুজালেম আক্রমণ করবেন।

রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের পরাজয়বরণের পর পরই সুলতান জঙ্গী রাজা ফ্রাংককে পরাজিত করেন। ফলে চরমভাবে বিপর্যস্ত খৃষ্টান বাহিনী দীর্ঘদিন পর্যন্ত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। আত্মসংবরণের আগে আগেই খৃষ্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করার পরিকল্পনা নেন সুলতান আইউবী। তিনি তারও আগে সুদানীদের পুনর্বাসনের কাজটা সম্পন্ন করে ফেলতে চাইছেন, যাতে তারা চাষাবাদ ও সংসার কর্মে আত্মনিয়োগ করে এবং বিদ্রোহের চিন্তা করার সুযোগ না পায়।

নতুন বাহিনীর পুনর্গঠন এবং হাজার হাজার সুদানীকে জমি দিয়ে পুর্নবাসিত করা সহজ কাজ নয়। সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এমন কিছু কর্মকর্তা আছেন, যারা মিসরের গভর্নর হিসেবে সুলতান আইউবীকে দেখতে চান না। সুদানী বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়েও সুলতান সমস্যার এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন। সুদানী বাহিনীর কয়েকজন পদস্থ অফিসার এখনো জীবিত। তারা বাহ্যত সুলতান আইউবীর আনুগত্য মেনে নিয়েছিলো ঠিক, কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের ইন্টেলিজেন্স বলছে, বিদ্রোহের ভস্মস্তূপে এখনো কিছু অঙ্গার রয়ে গেছে। সুদানীদের পুনর্বাসন এবং সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনে এ একটি মারাত্মক সমস্যা।

গোয়েন্দা বিভাগ আরো রিপোর্ট করে, নিজেদের পরাজয়ে এ বিদ্রোহী নেতাদের যতটুকু দুঃখ, তার চেয়ে বেশী দুঃখ খৃষ্টানদের পরাজয়ে। কারণ, তারা বিদ্রোহে ব্যর্থ হওয়ার পরও খৃষ্টানদের সাহায্য পেতে চাচ্ছিলো। এখন খৃষ্টানদের পরাজয়ে তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়েছে। মিসরের প্রশাসন ও ফৌজের দু'-তিনজন কর্মকর্তা সুদানীদের পরাজয়ে এজন্যেও ব্যথিত যে, তাদের বুকভরা আশা ছিলো, এ বিদ্রোহে সুলতান আইউবী হয়তো নিহত হবেন কিংবা মিসর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবেন।

এরা হলো ঈমান-বিক্রয়কারী গাদ্দার। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ঘটা করে তাদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেননি। তিনি তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ-ই করতেন। কোন বৈঠকে তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি। অধীন ও সেনাবাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কখনো তিনি একথা বলেননি যে, যারা আমার বিরোধিতা করছে, আমি তাদের দেখিয়ে ছাড়বো। তাদের ব্যাপারে ধমকের সুরে কথা বলেননি কখনো। তবে প্রসঙ্গ এলে মাঝে-মধ্যে বলতেন— 'কেউ যদি কোন সহকর্মীকে ঈমান বিক্রি করতে দেখো, তাহলে তাকে বারণ করো। তাকে স্মরণ করিয়ে দিও যে, সে মুসলমান। তার সঙ্গে মুসলমানদের মত আচরণ করো, যাতে আত্মপরিচয় লাভ করে সে দুশমনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।'

কিন্তু তিনি তাদের তৎপরতার উপর কড়া নজর রাখতেন। আলী বিন সুফিয়ানের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোও গুরুত্বের সঙ্গে তাদের গতিবিধির উপর নজরদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। বিশ্বাসঘাতকদের গোপন রাজনীতি সম্পর্কে অবহিত হতেন সুলতান আইউবী।

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব এখন বেড়ে গেছে আরো। রক্ষী ও উষ্ট্রচালকদের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে গেছে কায়রো। এই রক্ষী ও

উষ্ট্রচালকদের হত্যা এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা রক্ষীদের হাত থেকে গুপ্তচরদের ছিনিয়ে নেয়া প্রমাণ করলো, এখনো মিসরে খৃষ্টান গুপ্তচর এবং গেরিলা বাহিনী রয়ে গেছে। আর দেশের কিছু লোক যে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আশ্রয় দিচ্ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে সুলতান আইউবীর প্রেরিত বাহিনী যে ঠিক নৌকায় উঠে ওপারে পাড়ি দেয়ার সময় সেই গেরিলা বাহিনী ও গুপ্তচরদের শেষ করে দিয়েছে, সে খবর কায়রো পৌঁছেনি এখনো। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি গেরিলাদের প্রতিহত করার জন্য প্রেরণ করেছেন দু'টি টহল বাহিনী। জোরদার করেছেন গোয়েন্দা তৎপরতা।

বিষন্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সুলতান আইউবী। যে প্রত্যয় নিয়ে তিনি মিসর এসেছিলেন, তা কতটুকু সফল হলো, সে ভাবনায় তিনি অস্থির। তিনি সালতানাতে ইসলামিয়াকে জঞ্জালমুক্ত করে তাকে আরো বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছে যেমন মাটির উপর থেকে, তেমনি নীচ থেকেও। সেই ঝড়ে কাঁপতে শুরু করেছে তাঁর সেই স্বপ্নসৌধ। এ চিন্তায়ও তিনি অস্থির যে, মুসলমানদের তরবারী আজ মুসলমানদের-ই মাথার উপর ঝুলছে। নীলাম হচ্ছে মুসলমানদের ঈমান। ষড়যন্ত্রের জালে আটকে গিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার খেলাফতও এখন খৃষ্টানদের ক্রীড়নকে পরিণত। নারী আর কড়ি প্রকম্পিত করে তুলেছে আরবের বিশাল পবিত্র ভূখণ্ড।

নিজেকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সুলতান সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তার জন্য তিনি কখনো পেরেশান হননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন— 'জীবন আমার আল্লাহ'র হাতে। তাঁর নিকট যখন পৃথিবীতে আমার অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে, তখন তিনি আমাকে তুলে নেবেন।'

তাই সুলতান আইউবী কখনো নিজের হেফাজতের কথা ভাবেননি। কিন্তু গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ। খৃষ্টানদের কোন ষড়যন্ত্র যেনো সফল হতে না পারে, তার জন্য তিনি সুলতান আইউবীর চারদিকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করে রেখেছিলেন।

আজ কক্ষে বসে সুদানীদের ব্যাপারে নায়েবদের নির্দেশনা দিচ্ছেন সুলতান। হঠাৎ নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়ে যায় দু'টি ঘোড়া। আরোহী দু'জন মিগনানা মারিউস ও মুবী। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করে। এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ হাতে নেয় পিছনে পিছনে হেঁটে আসা আরেকজন লোক। নিরাপত্তা কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলে মুবী। বলে, সঙ্গের লোকটি আমার পিতা। আমরা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। মিগনানা মারিউসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কথা বলে কমাণ্ডার। সে সাক্ষাতের হেতু জানতে

চায়। না শোনার ভান করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে লোকটি। পাশের থেকে মুবী বলে— 'ইনি বধির ও বোবা। এর সাথে কথা বলে লাভ নেই। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য আমি সরাসরি সুলতানকে কিংবা উর্ধ্বতন অফিসারকেই জানাবো।'

কক্ষের বাইরে টহল দিচ্ছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। মিগনানা মারিউস ও মুবীকে দেখে তিনি এগিয়ে আসেন। আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে ওয়ালাইকুমুস্ সালাম বলে জবাব দেয় মুবী। কমাণ্ডার তাঁকে বললেন, এরা সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আলী বিন সুফিয়ান মিগনানা মারিউসকে সাক্ষাতের কারণ জিজ্ঞেস করেন। মুবী বললো, ইনি আমার পিতা। কানে শুনেন না, কথা বলতে পারেন না। আলী বিন সুফিয়ান বললেন, সুলতান এ মুহূর্তে কাজে ব্যস্ত। অবসর হলে হয়তো সময় দিতে পারেন। তার আগে আমাকে বলো, তোমরা কেন এসেছো; দেখি আমি-ই তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি কিনা। ছোট-খাট অভিযোগ শোনবার জন্য সুলতান সময় দিতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট বিভাগ জনতার অনেক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে।

'কেন, সুলতান কি একটি নির্যাতিত নারীর ফরিয়াদ শুনবার জন্য সময় দিতে পারবেন না? আমার যা কিছু বলার, তাঁর কাছে-ই বলবো।' বললো মুবী।

'আমাকে না বলে আপনি সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। বলুন, আপনার ফরিয়াদ আমি-ই সুলতানের কাছে পৌঁছিয়ে দেবো। প্রয়োজন মনে করলে তিনি-ই আপনাদের ডেকে নেবেন।' একথা বলে-ই আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে নিজের কক্ষে নিয়ে যান।

উত্তরাঞ্চলের একটি পল্লী এলাকার নাম উল্লেখ করে মুবী বললো— 'দু' বছর আগে সুদানী বাহিনী এ অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। তাদের দেখার জন্য মহল্লার নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোররা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে আসি। হঠাৎ এক কমাণ্ডার ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে আমার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী? আমি আমার নাম জানালে তিনি আমার পিতাকে ডেকে পাঠান। আড়ালে নিয়ে গিয়ে বাবাকে কানে কানে কী যেন বললেন। দূর থেকে এগিয়ে গিয়ে একজন বললো, ইনি তো বোবা ও বধির। শুনে কমাণ্ডার চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলো চারজন সুদানী সৈনিক। কোন কথা না বলে তারা আমাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে কমাণ্ডারের হাতে অর্পণ করে। কমাণ্ডারের নাম বালিয়ান। তিনি আমাকে সঙ্গে করে আনেন এবং তার হেরেমে আবদ্ধ করে রাখেন। আরো চারটি মেয়ে ছিলো তার কাছে। আমি তাকে বললাম, আপনি সেনাবাহিনীর একজন কমাণ্ডার। আমাকে যখন নিয়ে-ই

এলেন, তো বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিন। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। বিয়ে ছাড়া-ই আমাকে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

দু'টি বছর তিনি আমাকে সঙ্গে রাখলেন। সুদানীদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের পর তিনি পালিয়ে গেছেন। পরে মারা গেছেন, না জীবিত আছেন জানি না। আপনার সৈন্যরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আমাদের সব ক'টি মেয়েকে এই বলে বের করে দেয় যে, যাও তোমরা এখন মুক্ত।

আমি আমার বাড়িতে চলে গেলাম। আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিতে চাইলেন; কিন্তু কেউ আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলো না। মানুষ বলছে, আমি হেরেমের চোষা হাড়, চরিত্রহীনা, বেশ্যা। সমাজ আমাকে এক ঘরে করে রেখেছে। এখন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার।

নিরূপায় হয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ইনি আমাকে নিয়ে সরাইখানায় এসে উঠেছেন। শুনলাম, সুলতান নাকি সুদানীদের জমি ও বাড়ি দিয়ে পুনর্বাসিত করছেন। আমাকে আপনি আপনাদের-ই কমাণ্ডার বালিয়ানের রক্ষিতা বা স্ত্রী মনে করে একখণ্ড জমি এবং মাথা গোঁজার জন্য একটি ঘর প্রদান করুন। অন্যথায় আত্মহত্যা কিংবা পতিতাবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোন পথ থাকবে না।'

'সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া-ই যদি আপনি জমি-বাড়ি পেয়ে যান, তবু কি আপনার সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে হবে?' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'হ্যা, তারপরও আমি সুলতানকে এক নজর দেখতে চাই। একে আপনি আমার আবেগও বলতে পারেন। আমি সুলতানকে শুধু এ কথাটা জানাতে চাই যে, তার সালতানাতে নারীরা তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বিত্তশালী ও শাসক গোষ্ঠীর কাছে বিয়ে এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি নারীর সম্ভ্রম-সতীত্ব রক্ষা করুন এবং হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনুন। একথাগুলো সুলতানকে জানাতে পারলে হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।'

মিগনানা মারিউস এমন নির্লিপ্তের মত বসে আছে, যেন আসলেই কোন কথা তার কানে ঢুকছে না। আলী বিন সুফিয়ান মুবীকে বললেন, ঠিক আছে, সুলতানের বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। বৈঠক শেষ হলে আমি তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবো। একথা বলেই তিনি দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে যান।

ফিরে আসেন অনেক বিলম্বে। এসে বললেন, আপনারা আরেকটু বসুন, আমি সুলতানের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসছি। আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীর কক্ষে প্রবেশ করেন; কথা বলেন অনেকক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এসে

মুবীকে বললেন, ঠিক আছে, এবার পিতাকে নিয়ে আপনি সুলতানের কক্ষে চলে যান; সুলতান আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। বলেই তিনি তাদেরকে সুলতান আইউবীর কক্ষটা দেখিয়ে দেন। সুলতান আইউবীর কক্ষে প্রবেশ করার সময় তারা গভীর দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকায়। সুলতানকে হত্যা করার পর পালাবার পথটা-ই দেখে নিলো বোধ হয়।

কক্ষে সুলতান আইউবী একাকী দাঁড়িয়ে। তিনি মিগনানা মারিউস ও মুবীকে বসালেন। মুবীর প্রতি তাকিয়ে বললেন— 'তোমার বাবা কি জন্মগতভাবেই বোবা ও বধির?'

'জি, মুহতারাম সুলতান! এটা তার জন্মগত ত্রুটি।' জবাব দেয় মুবী।

সুলতান আইউবী বসছেন না। কক্ষময় পায়চারী করছেন আর কথা বলছেন। তিনি বললেন— 'তোমার আর্জি-ফরিয়াদ আমি শুনেছি। তোমাদের ব্যথায় আমিও ব্যথিত। এখানে আমি তোমাদের জমিও দেবো, বাড়িও দেবো। শুনেছি, তুমি নাকি আরো কিছু বলতে চাও? বলো, কী সে কথা?'

'আল্লাহ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করুন। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন যে, আমাকে কেউ বিয়ে করছে না। মানুষ আমাকে হেরেমের চোষা হাড্ডি আর নিংড়ানো ছোবড়া, চরিত্রহীনা, বেশ্যা বলে আখ্যা দেয়। তারা বলে, আমার পিতা নাকি আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এখন আপনি আমাকে জমি-ঘর তো দেবেন ঠিক, কিন্তু আমার একজন স্বামীরও প্রয়োজন, যিনি আমার ইজ্জত-সম্ভ্রমের সংরক্ষণ করবেন। অভয় দিলে আপনার নিকট আমি এ আর্জিও পেশ করবো যে, বিয়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে আপনি-ই আমাকে আপনার হেরেমে রেখে দিন। আপনি আমার বয়স, রূপ-যৌবন ও দেহ-গঠন দেখুন। বলুন, আমি কি আপনার যোগ্য নই?'

একথা বলেই মুবী এক হাত মিগনানা মারিউসের কাঁধে রেখে অপর হাত নিজের বুকে স্থাপন করে এবং চোখে সুলতান আইউবীর প্রতি ইঙ্গিত করে।

মিগনানা মারিউস দু' হাত একত্র করে সুলতান আইউবীর প্রতি বাড়িয়ে ধরে, যেন সে বলছে, আপনি দয়া করে আমার মেয়েটাকে বরণ করে নিন।

'আমার কোন হেরেম নেই বেটী! আমি রাজ্য থেকে হেরেম, পতিতালয় এবং মদ উৎখাত করছি।' বললেন সুলতান আইউবী।

কথা বলতে বলতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের করলেন এবং হাতে নিয়ে মুদ্রাটি নাড়াচাড়া করছেন আর 'আমি নারীর ইজ্জতের মুহাফিজ হতে চাই' বলতে বলতে দু'জনের পিছনে চলে যান এবং হঠাৎ

মুদ্রাটি হাত থেকে ফেলে দেন। 'টন' করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে মিগনানা মারিউস চকিতে পেছন ফিরে তাকিয়েই অমনি মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজের কোমরবন্ধ থেকে একটি খঞ্জর বের করে আগাটা মিগনানা মারিউসের ঘাড়ে তাক করে ধরে মুবীকে বললেন— 'লোকটা আমার ভাষা বুঝে না। একে বলো, হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিতে। তোমার বাবাকে বলো, যেন একটুও নড়াচড়া না করে। অন্যথায় তোমরা দু'জন এক্ষুনি লাশে পরিণত হবে।'

ভয়ে-বিস্ময়ে মুবীর চোখ দু'টো কোঠর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারপরও মেয়েটি অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাবার চেষ্টা করে এবং বলে— 'আমার বাবাকে ভয় দেখিয়ে আপনি আমাকে কব্জা করতে চাচ্ছেন কেন? আমি তো নিজেই নিজেকে আপনার সামনে পেশ করে দিলাম।'

সুলতান আইউবীর খঞ্জরের আগা মিগনানা মারিউসের ঘাড়েই ধরা। সে অবস্থায়-ই তিনি বললেন— 'যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তুমি আমার মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন আমার ভাষা বলোনি। এখন এতো দ্রুত আমার ভাষাটা শিখে ফেললে তুমি ..........! একে এক্ষুণি অস্ত্র ফেলতে বলো।'

মুবী তার ভাষায় মিগনানা মারিউসকে কি যেন বললো। সাথে সাথে সে চোগার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটি খঞ্জর বের করলো। লম্বায় ঠিক সুলতান আইউবীর খঞ্জরের সমান। সুলতান আইউবী হাত থেকে তার খঞ্জরটা নিয়ে নেন এবং ঘাড়ে তাক করে নিজের খঞ্জরটা সরিয়ে ফেলে বললেন— 'অপর ছয়টি মেয়ে কোথায়?'

'আপনি আমাকে চিনতে ভুল করেছেন মহামান্য সুলতান! আমার সঙ্গে আর কোন মেয়ে নেই। আপনি কোন্ মেয়েদের কথা বলছেন?' কম্পিত কণ্ঠে বললো মুবী।

সুলতান আইউবী বললেন— 'আল্লাহ আমাকে চোখ দিয়েছেন, মেধাও দিয়েছেন। একবার কাউকে দেখলে তার চেহারাটা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যায়। অর্ধেকটা নেকাবে ঢাকা তোমার এই মুখাবয়ব এর আগেও আমি দেখেছি। তোমরা যে কাজে এসেছো, তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে সে মেধা দেননি। সরাইখানায় তোমরা দু'জন ছিলে স্বামী-স্ত্রী। এখানে এসে হয়েছো পিতা-কন্যা। বাইরে ঘোড়ার নিকট দণ্ডায়মান তোমাদের সঙ্গীটিও তোমাদের ভৃত্য নেই। লোকটি এখন আইউবীর বন্দী।

কৃতিত্বটা আলী বিন সুফিয়ানের। মুবী তাঁকে বলেছিলো, তারা সরাইখানায় এসে উঠেছে। দু'জনকে নিজের কক্ষে বসিয়ে রেখে বের হয়েই ঘোড়ায় চড়ে

ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। মুবী ও মিগনানা মারিউসের আকৃতির বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করলে কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গের লোকটি তাদের ভৃত্য। তারা আরো জানায়, এখানে উঠে লোক দু'টো বাজার থেকে কিছু কাপড় ক্রয় করে এনেছিলো। তন্মধ্যে মেয়েটির বোরকার ন্যায় চোগা এবং জুতাও ছিলো।

এতটুকু তথ্য পাওয়ার পর আলী বিন সুফিয়ান আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি কক্ষের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করেন। তল্লাশী চালিয়ে এমন কিছু বস্তু উদ্ধার করেন, যা তাঁর সন্দেহকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে।

সুলতান আইউবীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের মতলব বুঝে ফেলেন আলী বিন সুফিয়ান। তিনি ফিরে এসে তাদের ঘোড়াগুলোকে নিরীক্ষা করে দেখে গিয়েছিলেন। বেশ উন্নত জাতের ঘোড়া। সরাইখানার কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করে আলী বিন সুফিয়ান জানতে পারেন, এরা তিনজন এসেছিলো উটে চড়ে। মেয়েটি এই ঘোড়া দু'টো সংগ্রহ করায়। বলেছিলো, আমাদের অতি উন্নত ও দ্রুতগামী দু'টো ঘোড়ার প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, মেয়েটির স্বামী বোবা। ভৃত্যটিও বোধ হয় কথা বলতে পারে না। এখানে এসে অবধি দু'জনের কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেনি। যা বলেছে সব মেয়েটিই বলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান যখন ফিরে আসেন, ততক্ষণে বৈঠক শেষ হয়ে গেছে। সোজা চলে যান তিনি সুলতানের কাছে। তাঁকে আগন্তুকদের প্রসঙ্গে অবহিত করেন, তারা তাঁকে যা বলেছে তা-ও শোনান এবং ইতিমধ্যে সরাইখানা থেকে যেসব তথ্য এনেছেন, তা-ও সুলতানের কানে দেন। তাদের কক্ষ তল্লাশী করে সন্দেহজনক যা যা পেয়েছেন, তা-ও দেখান এবং নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আমি নিশ্চিত, তারা আপনাকে হত্যা করতে এসেছে। সেজন্য-ই আপনার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করা তাদের এতো প্রয়োজন। আমার প্রবল ধারণা, তারা পরিকল্পনা করে এসেছে, আপনাকে খুন করে বেরিয়ে যাবে এবং অন্যরা টের পেতে না পেতে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ততক্ষণে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে। এ-ও হতে পারে, এই সুন্দরী মেয়েটির ফাঁদে ফেলে আপনার শয়নকক্ষে-ই তারা আপনাকে হত্যা করতে চায়।

ভাবনায় পড়ে গেলেন সুলতান। ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন— 'এখনই ওদেরকে গ্রেফতার করো না; আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে সুলতানের কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে দরজা ঘেঁষে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর কমাণ্ডারকে ডেকে বললেন— ঐ ঘোড়া দু'টোকে আমাদের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে, যিনগুলো খুলে রাখ

আর সঙ্গের লোকটাকে তোমাদের প্রহরায় বসিয়ে রাখো। তল্লাশী করে দেখো, লোকটার সঙ্গে অস্ত্র আছে কিনা। থাকলে নিয়ে নাও।

নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হলো। মিগনানা মারিউসের সঙ্গী গ্রেফতার হলো, তল্লাশী নেয়া হলো। পোশাকের মধ্যে লুকানো একটি খঞ্জর পাওয়া গেলো। ঘোড়া দু'টোও জব্দ করা হলো।

সুলতান আইউবী তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে হাত থেকে একটি মুদ্রা নীচে ফেলে দিয়ে নিশ্চিত হলেন যে, মেয়েটির সঙ্গের লোকটি বধির নয়। মুদ্রাপতনের শব্দ হওয়া মাত্র সে চকিতে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলো।

❖ ❖ ❖

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী গম্ভীর কণ্ঠে মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তাকে বলো, আমার জীবন খৃষ্টানদের হাতে নয়– জীবন আমার খোদার হাতে।'

মুবী তার নিজের ভাষায় মিগনানা মারিউসকে কথাটা বললে সে চমকিত হয়ে মুবীকে কী যেন বললো। মুবী সুলতান আইউবীকে বললেন, ইনি জিজ্ঞেস করছেন, আপনারও কি খোদা আছেন, মুসলমানও কি খোদায় বিশ্বাস করে?

সুলতান আইউবী বললেন— 'তাকে বলো, মুসলমান সেই খোদাকে বিশ্বাস করে, যিনি নিজে সত্য এবং সত্যের অনুসারীদের ভালবাসেন। আমাকে কে বলে দিলো যে, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছো? বলেছেন আমার খোদা। তোমার খোদা যদি সত্য হতো, তাহলে তোমার খঞ্জর আমাকে শেষ করে ফেলতো। কিন্তু আমার খোদা তোমার হাতের খঞ্জরটি আমার হাতে এনে দিয়েছেন। এই বলে তিনি পার্শ্ব থেকে একটি তরবারী ও কিছু জিনিসপত্র বের করে তাদের দেখিয়ে বললেন— 'এ তরবারী ও এই জিনিসগুলো তোমাদের। সমুদ্রের ওপার থেকে তোমরা এগুলো নিয়ে এসেছিলে। কিন্তু তোমার পৌঁছার আগেই এগুলো আমার কাছে পৌঁছে গেছে।'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠে দাঁড়ায় মিগনানা মারিউস। চোখ দু'টো কোঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে তার। এ পর্যন্ত যতো কথা হয়েছে, সব হয়েছে মুবীর মাধ্যমে। এবার নিজেই কথা বলতে শুরু করে সে। খোদা সম্পর্কে সুলতান আইউবীর কথাগুলো শুনে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নিজের ভাষায় বলে ওঠে— 'এ লোকটিকে সঠিক বিশ্বাসের অনুসারী বলে মনে হয়। আমি তার জীবন নিতে এসেছিলাম; কিন্তু এখন আমার-ই জীবন তার হাতে। তাকে বলো, তোমার বুকে যে খোদা আছেন, তাকে আমাকে একটু দেখাও, আমি তার সেই খোদাকে এক নজর দেখতে চাই, যিনি বলে দিয়েছেন, আমরা তাঁকে হত্যা করতে এসেছি।'

এত দীর্ঘ আলাপচারিতার সময় নেই সুলতান আইউবীর; নেই প্রয়োজনও। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়াই ছিলো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু লোকটাকে বিধ্বস্ত ও বিভ্রান্ত বলে মনে হলো তাঁর কাছে। সুলতানের কাছে মনে হলো, লোকটা পাগল না হলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই মিগনানা মারিউসের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ কথা বলতে শুরু করেন তিনি।

ইত্যবসরে ভিতরে প্রবেশ করেন আলী বিন সুফিয়ান। সুলতান কি হালে আছেন, তিনি দেখতে এসেছেন। সুলতান আইউবী স্মিত হেসে বললেন— 'কোন অসুবিধা নেই আলী! তার থেকে আমি খঞ্জর নিয়ে নিয়েছি।' প্রশান্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বের হয়ে যান আলী বিন সুফিয়ান।

মিগনানা মারিউস মুবীকে বললো, সুলতানকে বলো, আমার দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করার আগে আমি তাঁকে আমার জীবন-কাহিনী শোনানোর একটু সময় চাই। অনুমতি পেয়ে মিগনানা মারিউস আগের রাতে তার কমাণ্ডার ও সঙ্গীদের যে আত্মকাহিনী শুনিয়েছিলো, সুলতান আইউবীকে আনুপুংখ তা শোনায়। সুলতান আইউবী তন্ময় হয়ে শ্রবণ করেন তার সেই করুণ কাহিনী। তারপর যীশুখৃষ্টের প্রতিকৃতির প্রতি, কুমারী মরিয়মের ছবির প্রতি এবং পাদ্রীদের মাধ্যম ছাড়া যে খোদার সঙ্গে কথা বলা যায় না, তার প্রতি তীব্র বিরাগ প্রকাশ করে সে বললো— 'আমার মৃত্যুর আগে আপনি আপনার খোদার একটি ঝলক দেখিয়ে দিন। আমার খোদা আমার পুত্র-কন্যাদের না খাইয়ে মেরে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে আমার মায়ের দৃষ্টিশক্তি। মদ্যপ হায়েনাদের হাতে তুলে দিয়েছে আমার নিষ্পাপ সুন্দরী বোনকে। আর ত্রিশটি বছরের জন্য আমাকে নিক্ষেপ করেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। সেখান থেকে বের হয়ে এখন আমি নিপতিত হয়েছি মৃত্যুর মুখে। মহামান্য সুলতান! আমার জীবন এখন আপনার হাতে। আমায় সত্য খোদাকে একটু দেখিয়ে দিন, আমি তাঁর সমীপে ফরিয়াদ জানাবো, ন্যায় বিচার প্রার্থনা করবো।'

সুলতান আইউবী বললেন— 'তোমার জীবন আমার হাতে নয়– আমার আল্লাহর হাতে। অন্যথায় এতক্ষণে থাকতে তুমি আমার জল্লাদের কব্জায়। যে খোদা তোমার থেকে আমার তরবারীকে ফিরিয়ে রেখেছেন, তার দর্শন লাভে আমি তোমায় ধন্য করবো। কিন্তু তোমাকে সে খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় তিনি তোমার আকুতি শুনবেন না। ন্যায় বিচারও পাবে না কোনদিন।

সুলতান আইউবী মিগনানা মারিউসের খঞ্জরটি ছুঁড়ে মারেন তার কোলে। নিজে তার কাছে গিয়ে পিঠটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। মুবীকে

উদ্দেশ করে বললেন— 'তাকে বলো, আমি আমার জীবনটা তার হাতে অর্পণ করছি। পিঠে খঞ্জর বিদ্ধ করে আমাকে হত্যা করতে বলো।'

খঞ্জরটি হাতে তুলে নেয় মিগনানা মারিউস। নেড়ে-চড়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখে অস্ত্রটি। দৃষ্টি বুলায় সুলতান আইউবীর পিঠে। তারপর উঠে ধীরে ধীরে চলে যায় সুলতান আইউবীর সামনে। তাঁকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষা করে দেখে। হাতটা কেঁপে উঠে মিগনানা মারিউসের। হাতের খঞ্জরটি রেখে দেয় সুলতানের পায়ের উপর। বসে পড়ে হাটু গেড়ে। সুলতানের ডান হাতটা টেনে ধরে চুমু খেয়ে কেঁদে উঠে হাউমাউ করে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে মুবীকে বলে, জিজ্ঞেস করো, ইনি নিজেই কি খোদা, নাকি নিজের বুকের মধ্যে খোদাকে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর খোদাকে আমায় একটু দেখাতে বলো।'

মিগনানা মারিউসের দু' বাহু ধরে তুলে দাঁড় করান সুলতান আইউবী। বুকে জড়িয়ে নিয়ে নিজ হাতে মুছে দেন তার বিগলিত অশ্রুধারা।

মিগনানা মারিউস একজন বিভ্রান্ত মানুষ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার মনে ভরে দেয়া হয়েছিলো প্রচণ্ড ঘৃণা, ইসলামের বিরুদ্ধে ঢেলে দেয়া হয়েছিলো বিষ। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে সে নিজ ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। এক পর্যায়ে যে বিষয়টি তাকে এম্‌নি এক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামিয়েছে, তা এক প্রকার পাগলামী ও তৃষ্ণা। সুলতান আইউবীর দৃষ্টিতে সে নিরপরাধ। কিন্তু তিনি লোকটাকে মুক্তি না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে মুবী রীতিমত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি মেয়ে, জঘন্য এক গুপ্তচর। যে সাতটি মেয়ে সুদানীদের নিকট খৃষ্টানদের বার্তা নিয়ে এসেছিলো এবং সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে সুদানীদের বিদ্রোহে নামিয়েছিলো, মুবী তাদের একজন। মুবী ইসলামী সালতানাতের দুশমন, দেশের শত্রু। ইসলামী আইন তাকে ক্ষমা করে না।

মুবী ও মিগনানা মারিউসকে আলী বিন সুফিয়ানের হাতে সোপর্দ করেন সুলতান আইউবী। জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধ স্বীকার করেছে দু'জন-ই। স্বীকার করেছে, তারা-ই রসদ কাফেলা লুট করেছে, বন্দী গুপ্তচর মেয়েদের তারা-ই মুক্ত করে নিয়েছে। রক্ষী বাহিনী এবং বালিয়ান ও তার সঙ্গীদেরও হত্যা করেছে তারা-ই।

জিজ্ঞাসাবাদ চলে একটানা তিনদিন। এ সময়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যায় মিগনানা মারিউসের মস্তিষ্ক। সে সুলতান আইউবীকে জিজ্ঞেস করে— 'মুবীকে মুসলমান বানিয়ে আপনার হেরেমে স্থান দিয়েছেন কি?'

'আজ সন্ধ্যায় আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবো।' কিছুক্ষণ মৌন থেকে জবাব দেন সুলতান আইউবী।

সন্ধ্যার সময় সুলতান আইউবী মিগনানা মারিউসকে সঙ্গে করে খানিক দূরে একস্থানে নিয়ে যান। সেখানে পাশাপাশি বিছানো লম্বা দু'টি তক্তা। সাদা চাদর দিয়ে কি যেন ঢেকে রাখা আছে তার উপরে। একটি কোণ ধরে টান দিয়ে চাদরটি সরিয়ে ফেলেন সুলতান আইউবী। অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যায় মিগনানা মারিউসের চেহারা। চোখের সামনে একটি তক্তায় মুবীর লাশ, অপরটিতে তার সঙ্গীর মৃতদেহ। সুলতান আইউবী মুবীর মাথা ধরে টান দেন সামনের দিকে। ধড় থেকে আলাদা হয়ে সরে আসে মাথাটা। তারপর মিগনানা মারিউসের প্রতি তাকিয়ে বলেন, আমি মেয়েটাকে ক্ষমা করতে পারিনি। তাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো, যাতে রূপের ফাঁদে পড়ে আমি আমার ঈমান হারাই। কিন্তু তার দেহটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি । এ একটি অপবিত্র দেহ। তবে হ্যাঁ, এখন মেয়েটাকে বেশ ভালো লাগছে। আমি দু'আ করি, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

'কিন্তু আমাকে ক্ষমা করলেন কেন সুলতান!' আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মিগনানা মারিউস।

'কারণ, তুমি হত্যা করতে এসেছিলে আমাকে। আর ও এসেছিলো আমার জাতির চরিত্র ধ্বংস করতে। তোমার সঙ্গীটিও বুঝে-শুনে পরিকল্পনা মোতাবেক এসেছিলো মানুষ খুন করতে। আর তুমি এসেছো, আমার রক্ত ঝরিয়ে আল্লাহর দর্শন লাভ করতে।' জবাব দেন সুলতান আইউবী।

অল্প ক'দিন পর-ই সাইফুল্লাহ'য় পরিণত হয় মিগনানা মারিউস। পরবর্তীতে সুলতান আইউবীর দেহরক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে সে।

সুলতান আইউবীর মৃত্যুর পর সাইফুল্লাহ বাকী জীবনের সতেরটি বছর কাটিয়ে দেয় সুলতানের কবরের পার্শ্বে। আজ কেউ জানে না, সাইফুল্লাহ'র সমাধি কোথায়।

# আরেক বউ

কায়রো থেকে দেড়-দু' মাইল দূরবর্তী একটি অঞ্চল। এখানকার একদিকে উঁচু-নীচু বালির টিলা। অপর তিনদিকে ধু-ধু বালুকা প্রান্তর।

আজ লাখো জনতার পদভারে মুখরিত-প্রকম্পিত এ অঞ্চলটি। চারদিক থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় এসে ভীড় জমিয়েছে অগণিত মানুষ। কেউ এসেছে উটে চড়ে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ বা এসেছে গাধার পিঠে করে। পায়ে হেঁটে এসেছে অসংখ্য।

চার-পাঁচদিন ধরে মানুষ আসছে আর আসছে। সমবেত হচ্ছে বিশাল-বিস্তৃত এই মরুপ্রান্তরে। কায়রোর বাজারগুলোতে লোকের ভীড় বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে জৌলুস। সরাইখানাগুলোতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

দূর-দূরান্ত থেকে এরা এসেছে সরকারী এক ঘোষণা শুনে। মিসরী ফৌজের সামরিক মহড়া হবে এখানে। ঘোড়-সওয়ারী, শতর-সওয়ারী, ধাবমান উট-ঘোড়ার পিঠ থেকে তীরান্দাজি ইত্যাদি রণকৌশলের মহড়া প্রদর্শন করবে মিসরী সৈন্যরা।

ঘোষণাটি প্রচারিত হয়েছে মিসরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পক্ষ থেকে। তাঁর উদ্দেশ্য দু'টি। এক. এতে সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার উৎসাহ পাবে। দুই. এখনো যারা সামরিক শক্তিতে সুলতান আইউবীকে দুর্বল মনে করে, তাদের সংশয় দূর হবে।

এ সামরিক মহড়ার প্রতি জনসাধারণের এত আগ্রহ দেখে সুলতান আইউবী বেজায় খুশী। কিন্তু খানিকটা অস্থিরচিত্ত বলে মনে হচ্ছে আলী বিন সুফিয়ানকে। তিনি সুলতানের সামনে নিজের এ অস্থিরতার কথা ব্যক্তও করেছেন। জবাবে সুলতান আইউবী হাসিমুখে বললেন— 'আরে, মহড়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা যদি এক লাখ হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে আমরা পাঁচ হাজার সৈন্যও তো পাবো।'

'আমীরে মুহতারাম! আমি তো বিষয়টাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। আপনার ধারণা অনুযায়ী মহড়ায় অংশগ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা যদি এক লাখ হয়, তবে তাতে গুপ্তচর থাকবে অন্তত এক হাজার। পাড়া গাঁ থেকে অসংখ্য

মহিলাও আসছে। তাদের বেশীর ভাগ-ই সুদানী ও শ্বেতাঙ্গী। ফলে খৃষ্টান মহিলারা তাদের মধ্যে লুকিয়ে যেতে পারবে অনায়াসেই।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এ সমস্যাটা আমিও ভালো করেই বুঝি। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি যে মেলার আয়োজন করেছি, তা কতো জরুরী। তোমার গোয়েন্দা বিভাগকে তুমি আরো সতর্ক করো।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'হ্যাঁ, তা আমি করবো অবশ্যই। এই মেলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার অস্থিরতার কথা আপনাকে পেরেশান করার জন্য বলিনি। এই মেলা কি বিপদ সঙ্গে নিয়ে আসছে, আমি আপনাকে তা-ই শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কায়রোতে অস্থায়ী পতিতালয় খোলা হয়েছে, যা কিনা আমোদীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে সারা রাত। অনেকে শহরের বাইরে তাঁবু গেড়েছে। আমার গুপ্তচররা আমাকে তথ্য দিয়েছে, তাঁবুগুলোর মধ্যে জুয়াড়ী এবং বেশ্যা মেয়েদের আস্তানাও রয়েছে। আগামীকাল মেলার প্রথম দিন। নর্তকী-গায়িকারা মেলায় অংশ নেয়া নিরীহ লোকদের পকেট উজাড় করে নিচ্ছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'মেলা শেষ হয়ে গেলে এসব নোংড়ামীরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখনি এসবের উপর আমি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চাই না। মিসরের মানুষের বর্তমান নৈতিক অবস্থা ভালো নয়। নাচ-গান, বেশ্যাবৃত্তি দু'-একদিনে নির্মূল করা যায় না। এ মুহূর্তে আমার প্রয়োজন বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী। আমার ফৌজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তুমি তো জানো আলী! আমাদের সৈন্যের কতো প্রয়োজন। সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে স্পষ্ট করে-ই আমি একথা ঘোষণা দিয়েছি।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'আপনার বক্তব্যে আমার দ্বিমত নেই। তবে আমীরে মুহতারাম! আমার গুপ্তচরদের দৃষ্টিতে আমাদের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অর্ধেক-ই আমাদের ওফাদার নয়। আপনি ভালো করে-ই জানেন, এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আপনাকে এই গদিতে দেখতে চায় না। আর অবশিষ্ট যারা আছে, তাদের মনও সুদানীদের সঙ্গে। তাদের প্রত্যেকের পিছনে আমি একজন করে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছি। তারা আমাকে এদের তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আচ্ছা, কারো কোন ভয়ঙ্কর তৎপরতা চোখে পড়েছে কি?' কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন সুলতান আইউবী।

'এরা আপন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে রাতের আঁধারে বিভিন্ন সন্দেহজনক তাঁবুতে এবং পতিতালয়ে চলে যায়। দু'জন কর্মকর্তা সম্পর্কে আমি

এমন রিপোর্টও পেয়েছি যে, তারা নিজ ঘরে নর্তকী ডেকে এনে আসর বসায়। এ যাবত এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে আমীরে মুহতারাম! দশদিন আগে রোম উপসাগরের কূলে যে রহস্যময় পালতোলা নৌকাটি দেখা গিয়েছিলো, আমার সব চিন্তা এখন তাকে নিয়ে-ই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে চান সুলতান আইউবী। আলী বিন সুফিয়ান বললেন–

'রোম উপসাগরের তীর থেকে আমাদের সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নিয়ে আসার সময় সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য বিভিন্ন স্থানে দু' দু'জন করে সৈন্য মোতায়েন করে রাখা হয়েছিলো। জেলে ও যাযাবর বেশে আমিও আমার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কয়েকজন লোক রেখে এসেছিলাম। খৃষ্টানরা ইচ্ছে করলে-ই যাতে হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসতে না পারে এবং ওদিক থেকে কোন খৃষ্টান চর যাতে মিসরে ঢুকতে না পারে, তার জন্যই ছিলো আমার এ আয়োজন। কিন্তু সমুদ্রতীর অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে সর্বত্র নজর রাখা সম্ভব হয়নি। দশদিন আগে একস্থান থেকে একটি পালতোলা নৌকা বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিলো। সম্ভবত নৌকাটি কোন এক রাতের আঁধারে ঢুকে গিয়েছিলো।

নৌকাটি যেতে দেখে ঘোড়া ছুটায় আমাদের দু'জন অশ্বারোহী। কিন্তু যে স্থান থেকে নৌকাটি বেরিয়েছিলো, সেখানে গিয়ে তারা কিছু-ই দেখতে পেলো না। তীরে কোন মানুষ নেই, নৌকা চলে গেছে মাঝ নদীতে। নৌকা ও পালের গঠনে তাদের মনে হয়েছে নৌকাটি মিসরী জেলেদের নয়– সমুদ্রের ওপারের হবে। আরোহীদ্বয় চারদিক ঘুরে-ফিরে কোন তথ্য বের করতে পারেনি। এ সংবাদ তারা কায়রোতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো।'

ঘটনার বিবরণ দিয়ে আলী বিন সুফিয়ান বললেন, মেলা অনুষ্ঠানের কথা আমরা দেড় মাস ধরে প্রচার করছি। দেড় মাসে এ সংবাদ ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে গুপ্তচর আগমন করা মোটেই বিচিত্র নয়। আমার তো প্রবল ধারণা, আমোদীদের সঙ্গে খৃষ্টানদের বহু গুপ্তচরও মেলায় ঢুকে পড়েছে।

কায়রোতে মেয়ে ক্রয়-বিক্রয় এখন একটি স্বতন্ত্র পেশা। সুলতানের বুঝতে নিশ্চয় কষ্ট হবে না যে, যারা এই মেয়েদের ক্রয় করে, তারা সমাজের সাধারণ মানুষ নয়। কায়রোর বড় বড় ব্যবসায়ী, আমাদের প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারাই হলো মেয়েদের খরিদ্দার। আর বিক্রি হচ্ছে যেসব মেয়ে, তাদের মধ্যে যে খৃষ্টান গুপ্তচরও রয়েছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

এসব রিপোর্টে সুলতান আইউবী বিচলিত হলেন না মোটেই। রোম উপসাগরে খৃষ্টানদের পরাস্ত করা হলো প্রায় এক বছর কেটে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান সমুদ্রোকূলে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বিছিয়ে রেখেছেন। তা শতভাগ নির্ভরযোগ্য না হলেও তিনি এ তথ্য পেয়ে গেছেন যে, খৃষ্টানরা মিসরে বহু গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী ঢুকিয়ে রেখেছে। তবে মিসরে তাদের পরিকল্পনা কী, সে ব্যাপারে এখনো কিছু জানা যায়নি। বাগদাদ ও দামেশ্‌ক থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা গেছে; খৃষ্টানরা ওদিকে-ই বেশী চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। বিশেষত সিরিয়ায় তারা মুসলমান শাসকদের ভোগ-বিলাস ও মদ-নারীতে মত্ত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর বর্তমানে এখন-ই তারা সরাসরি সংঘাতে জড়িত করার সাহস পাচ্ছে না। রোম উপসাগরে যখন সুলতান আইউবী হাজার হাজার সৈন্যসহ খৃষ্টানদের নৌবহরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, ঠিক তখন নুরুদ্দীন জঙ্গী আরবে খৃষ্টানদের সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে সন্ধিচুক্তিতে বাধ্য করেছিলেন এবং জিযিয়া উসুল করে নিয়েছিলেন। সেই লড়াইয়ে বহু খৃষ্টান সুলতান জঙ্গীর হাতে বন্দী হয়েছিলো। রেনাল্ট নামক এক খৃষ্টান সালারও ছিলো তাদের মধ্যে। সুলতান জঙ্গী তাদেরকে মুক্তি দেননি। কারণ, ইতিপূর্বে খৃষ্টানরা মুসলমান কয়েদীদের শহীদ করেছিলো। তাছাড়া একে একে অনেক প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করে চলেছে খৃষ্টানরা।

সুলতান আইউবীর স্বপ্ন, খৃষ্টানদের হাত থেকে ফিলিস্তীন উদ্ধার করতে হবে এবং আরব ভূখণ্ডকে ক্রুসেডারদের নাপাক পদচারণা থেকে পবিত্র করতে হবে। পাশাপাশি তিনি মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও মজবুত করতে চান। তাই একই সময়ে নানামুখী সেনা অভিযান পরিচালনা এবং শত্রুদের চতুর্মুখী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন বিপুলসংখ্যক সৈন্য।

সুলতানের পরিকল্পনা অনুপাতে মিসরের সেনাবাহিনীতে নতুন সেনাভর্তির গতি অনেক ধীর। এর কারণ, বিলুপ্ত সুদানী বাহিনীর আইউবী বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা।

সুলতান আইউবীর যে বাহিনীটি এখন আছে, তার কিছু সৈন্য মিসর থেকে সংগৃহীত। কিছু সুলতান জঙ্গীর পাঠানো। কিছু আছে, যারা ওফাদারীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিলুপ্ত সুদানী বাহিনী থেকে এসে যোগ দিয়েছে।

মিসরের জনগণ এখনো এ বাহিনীটিকে চোখে দেখেনি। সুলতান আইউবীকেও দেখেনি তারা। তাই মেলার আয়োজন করে সুলতান তাঁর সামরিক কর্মকর্তা ও কমাণ্ডারদের আদেশ দিয়েছেন, যেন তারা মেলায় আগত সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে যায় এবং সদাচার ও ভালবাসা দিয়ে তাদের আস্থা অর্জন

করে। সুলতান তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, তোমরা জনসাধারণের-ই একজন। আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাজত্বকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করা এবং তাকে খৃষ্টানদের অরাজকতা থেকে মুক্ত করা।

মেলা শুরু হওয়ার আগের দিন থেকে আলী বিন সুফিয়ান সুলতানকে গুপ্তচরদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। তিনি বললেন, আমীরে মুহতারাম! আমার মূলত গুপ্তচরদের কোন ভয় নেই। আমার আসল শঙ্কা সেই মুসলমান ভাইদের, যারা কাফিরদের গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে। এই গাদ্দাররা না থাকলে আমাদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের কোন পরিকল্পনা-ই সফল হতো না। আমি মেলায় যেসব নর্তকীদের দেখতে পাচ্ছি, তাদেরকে আমি ক্রুসেডারদের এক একটি ফাঁদ বলে মনে করি। তবু আমার লোকেরা দিন-রাত সারাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

'তোমাদের লোকদের বলে দাও, যেন কোন গুপ্তচরকে খুন না করে। যাকেই সন্দেহ হবে, জীবন্ত ধরে নিয়ে আসবে। গুপ্তচর হলো দুশমনের চোখ-কান। আর আমাদের জন্য তারা জবান। ধরে এনে কায়দা মত চাপ সৃষ্টি করতে পারলে খৃষ্টানদের অজানা পরিকল্পনার তথ্য বের করা যাবে।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

মেলা দিবসের ভোরবেলা। বিশাল-বিস্তৃত মাঠের তিন দিক দর্শনার্থীদের ভীড়ে গমগম করছে। সমরডংকা বাজতে শুরু করেছে। অশ্বখুরধ্বনি এমন শোনা যাচ্ছে, যেন তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উর্মিমালা ধেয়ে আসছে। ধুলোয় ছেয়ে গেছে আকাশ।

দু' হাজারেরও অধিক ঘোড়া। প্রথমটি এইমাত্র প্রবেশ করলো মাঠে। আরোহী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর দু'পার্শ্বে দু'জন পতাকাবাহী। পিছনে রক্ষী বাহিনী। ঘোড়াগুলোর পিঠে ফুলদার চাদর বিছানো। প্রতিটি ঘোড়ার আরোহীর হাতে একটি করে বর্শা। বর্শার চকমকে ফলার সঙ্গে বাধা রঙিন কাপড়ের ছোট একটি ঝাণ্ডা। প্রত্যেক আরোহীর কোমরে ঝুলছে তরবারী। দুল্‌কি চালে চলছে ঘোড়াগুলো। ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বসে আছে আরোহীরা। চেহারায় তাদের বীরত্বের ছাপ। তাদের ভাবভঙ্গিতে নিস্তব্ধতা নেমে আসে দর্শনার্থীদের মধ্যে। প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সকলের উপর।

দর্শনার্থীদের একদল সম্মুখের বৃত্তের উপর দণ্ডায়মান। তাদের পিছনে একদল ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট। তাদের পিছনে যারা আছে, তারা উটের পিঠে বসা। এক একটি উট ও ঘোড়ায় দু' তিনজন করে লোক বসা।

তাদের সম্মুখে এক স্থানে একটি শামিয়ানা টানানো, যার নীচে রাখা আছে কতগুলো চেয়ার। এখানে বসেছেন উঁচু স্তরের দর্শনার্থীবৃন্দ। বড় বড় ব্যবসায়ীও আছেন এদের মধ্যে। আছেন আইউবী সরকারের পদস্থ অফিসার ও দেশের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ। কায়রোর বিভিন্ন মসজিদের ইমামদেরও দেখা যাচ্ছে এখানে। ইমামগণকে বসান হয়েছে সকলের সামনে। কারণ, সুলতান আইউবী ধর্মীয় নেতৃবর্গ এবং আলেমদের এতই শ্রদ্ধা করেন যে, তিনি তাদের উপস্থিতিতে তাদের অনুমতি ছাড়া বসেনও না।

এক পার্শ্বে উপবিষ্ট সুলতান আইউবীর উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা আল-বার্‌ক। তার-ই পাশে বসা অতিশয় রূপসী এক তরুণী। মেয়েটির সঙ্গে বসা ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক বৃদ্ধ। দেখতে তাকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বলে মনে হয়। আল-বার্‌ক একাধিকবার তাকান মেয়েটির প্রতি। মেয়েটিও একবার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মুখ টিপে হাসে। বাঁকা চোখে দৃষ্টিপাত করে বৃদ্ধের প্রতি, সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় তার মুখের হাসি।

দর্শনার্থীদের সম্মুখে অশ্বারোহীদের মহড়া শেষ হয়ে যায়। আসে উষ্ট্রারোহী বাহিনী। উটগুলোও ঘোড়ার ন্যায় রঙিন চাদর দ্বারা সজ্জিত। প্রত্যেক আরোহীর হাতে একটি করে লম্বা বর্শা, যার ফলার সামান্য নীচে বাধা পতাকার ন্যায় তিন ইঞ্চি চওড়া এবং দু' ফিট লম্বা দু' রঙা কাপড়। প্রত্যেক আরোহীর কাঁধে ঝুলছে একটি করে ধনুক। উটের যিনের সঙ্গে বাধা আছে রঙিন তূনীর। অপূর্ব এক আকর্ষণীয় ঢংয়ে বসে আছে আরোহীরা। অশ্বারোহীদের দৃষ্টিও সম্মুখপানে নিবদ্ধ। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না একজনও। দর্শনার্থীদের উট আর এই বাহিনীর উট দেখতে এক রকম হলেও সামরিক বিন্যাস, ফৌজী চলন ইত্যাদির কারণে এদেরেকে ভিন্ন জগতের ভিন্ন প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছে।

পার্শ্বে উপবিষ্ট রূপসীর প্রতি আবার চোখ ফেলে আল-বার্‌ক। এবার পূর্ণ চোখাচোখি হয়ে যায় দু'জনে। একজনের আখিযুগল আটকে গেছে যেন অপরজনের চেহারায়। যাদুময়ী মেয়েটির দু' চোখে বিদ্যুতের ঝলক অনুভব করে যেন আল-বার্‌ক।

স্বলাজ হাসির রেখা ফুটে উঠে মেয়েটির ওষ্ঠাধরে। হঠাৎ যেন তার সম্বিৎ ফিরে আসে। তাকায় অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট বৃদ্ধের প্রতি। মুহূর্তে তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

ঘরে বউ আছে আল-বার্‌কের। চার সন্তানের বাবা। কিন্তু এ মুহূর্তে বউ-এর কথা মনে নেই লোকটির। দিব্যি ভুলে গেছে সব। মেয়েটি তার এতোই কাছে বসা যে, তার রেশমী ওড়না উড়ে এসে আল-বার্‌কের বুকে এসে ঝাপটা দেয়

কয়েকবার। একবার নিজের হাতে সরিয়ে নিয়ে 'মাফ করবেন' বলে ক্ষমা প্রার্থনাও করে মেয়েটি। আল-বার্‌ক মুখ টিপে হাসে– বলে না কিছু-ই।

উষ্ট্রারোহীদের পিছন দিয়ে আসছে পদাতিক বাহিনী। এদের মধ্যে আছে তীরান্দাজ ও তরবারীধারী ইউনিট। এদের সকলের চলার ঢং এক তালের, একই রকম অস্ত্র এবং একই ধরনের পোশাক দর্শনার্থীদের মধ্যে সেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, যা ছিলো সুলতান আইউবীর কামনা। সৈন্যদের দেখতে শক্ত-সামর্থ, সুঠাম-সুদেহী, উৎফুল্ল ও শান্ত-সুবোধ বলে মনে হচ্ছে।

পদাতিক বাহিনীর পিছনে আসছে মিন্‌জানীক। অনেকগুলো ঘোড়া টেনে নিয়ে আসছে সেগুলো। প্রতিটি মিনজানীক ইউনিটের পিছনে আছে একটি করে ঘোড়াগাড়ী। তাতে রাখা আছে বড় বড় পাথর ও পাতিলের মত বড় বড় বরতন। বরতনগুলো তেলের মতো এক ধরনের তরল পদার্থে ভরা। মিনজানীক দ্বারা নিক্ষেপ করা হয় এগুলো। মিনজানীকের সাহায্যে একটি বরতন ছুঁড়ে মারলে তা দূরে গিয়ে ভেঙ্গে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় এবং তরল পদার্থগুলো চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার উপর নিক্ষেপ করা হয় অগ্নিতীর। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে।

সুলতান আইউবীর নেতৃত্বে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দর্শনার্থীদের সম্মুখ দিয়ে সামনে বেরিয়ে আসে এসব আরোহী ও পদাতিক বাহিনী। রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে আবার মাঠে ফিরে এসেছেন সুলতান। সম্মুখে তার পতাকাবাহীদের ঘোড়া। ডানে-বাঁয়ে ও পিছনে রক্ষীবাহিনী। তাদের পিছনে নায়েব ও সালারদের বাহন।

মাঠে এসেই হঠাৎ থেমে যান সুলতান আইউবী। এক লাফে নেমে পড়েন ঘোড়ার পিঠ থেকে। হাত নেড়ে দর্শনার্থীদের সালাম ও অভিনন্দন জানাতে জানাতে চলে যান শামিয়ানার নীচে। দাঁড়িয়ে যায় সকলে। সুলতান আইউবী সবাইকে সালাম করে বসে পড়েন নির্দিষ্ট আসনে।

আরোহী ও পদাতিক বাহিনী মাঠ পেরিয়ে খানিক দূর অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে যায় টিলার আড়ালে। দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠে প্রবেশ করে এক অশ্বারোহী। এক হাতে তার ঘোড়ার লাগাম, অপর হাতে উটের রশি। ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল রেখে একটি উটও ছুটে আসছে তার পিছনে। মাঠের মধ্যখানে এসে আরোহী হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যায় ঘোড়াটির পিঠে। লাফ দিয়ে চলে যায় উটের পিঠে। দাঁড়িয়ে থাকে সটান। আবার লাফিয়ে চলে আসে গোড়ার পিঠে। সেখান থেকে ঝাপিয়ে পড়ে মাটিতে। ঘোড়া ও উটসহ এগিয়ে যায় কয়েক পা। লাফিয়ে চড়ে বসে ঘোড়ার পিঠে। তার ঘোড়া ও উট ছুটে চলছে সমান তালে। ঘোড়ার পিঠ থেকে চলে যায় উটের পিঠে। ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় একদিকে।

খাদেমুদ্দীন আল-বার্‌ক মাথাটা সামান্য এলিয়ে দেয় বাঁ দিকে। এখন তার মুখ আর মেয়েটির মাথার মাঝে ব্যবধান দু' থেকে তিন ইঞ্চি। তার প্রতি তাকায় মেয়েটি। মুখ টিপে হাসে আল-বার্‌ক। লজ্জা পায় মেয়েটি। বৃদ্ধ তাকায় দু' জনের প্রতি। কপালে ভাজ পড়ে যায় তার।

আচমকা ঘোড়াগাড়িতে করে নিয়ে আসা ডেকচির মত পাত্রগুলো টিলার পিছন থেকে উড়ে এসে নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে মাঠে। একের পর এক পাত্র এসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হচ্ছে। তেল ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অন্তত একশত পাত্র নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার তরল পদার্থগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এমন সময়ে টিলার উপর আত্মপ্রকাশ করে ছয়জন তীরান্দাজ। তারা জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তীর ছুঁড়ে। মাঠের বিক্ষিপ্ত তরল পদার্থের উপর এসে নিক্ষিপ্ত হয় তীরগুলো। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। মাঠের এক হাজার বর্গগজ জায়গা জুড়ে এখন আগুন জ্বলছে।

ঠিক এমন সময়ে একদিক থেকে তীরগতিতে ছুটে আসে চার অশ্বারোহী। কিন্তু কি আশ্চর্য! তারা আগুনের কাছে এসে থামলো না। গতি হ্রাসও করলো না। শাঁ শাঁ করে ঢুকে পড়ল জ্বলন্ত শিখার মধ্যে। নির্বাক অনিমেষ নয়নে তাদের প্রতি তাকিয়ে আছে দর্শনার্থীরা। লোকগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে নিশ্চিত। কিন্তু না, তারা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে দিব্যি দৌড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে যায় অন্যদিক দিয়ে। খুশীতে আত্মহারা হয়ে যায় দর্শনার্থীরা। আনন্দের আতিশয্যে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তারা তাকবীর ধ্বনি তোলে। আগুন ধরে গিয়েছিলো দু' আরোহীর কাপড়ে। তারা ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে পানির উপর লাফিয়ে পড়ে। গড়ানি খায় দু' তিনবার। তাদের কাপড়ের আগুন নিভে যায়।

এই শোরগোল, আনন্দ-উল্লাস এবং অশ্বারোহীদের বীরত্ব প্রদর্শনের দৃশ্যের প্রতি আল-বার্‌কের মন নেই। সে এর থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন। পার্শ্বের রূপসী মেয়েটিকে নিয়ে-ই ঘুরপাক খাচ্ছে তার সব ভাবনা-চিন্তা। সে প্রেম-সাগরে হারিয়ে যায়।

আল-বার্‌কের প্রতি এক নজর তাকিয়ে মুচকি একটি হাসি দিয়ে-ই আবার বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মেয়েটি। এবার কেন যেন উঠে চলে গেলো বৃদ্ধ। মেয়েটি তার গমন পথে তাকিয়ে থাকে। আল-বার্‌কের জানা ছিলো, মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে এসেছে। তাই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে 'তোমার পিতা কোথায় চলে গেলেন?'

'ইনি আমার পিতা নন– স্বামী।' জবাব দেয় মেয়েটি।

'স্বামী? তা এই বিয়ে কি তোমার বাবা-মা দিয়েছেন?' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে আল-বার্ক।

'না, তিনি আমায় কিনে এনেছেন।' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে জবাব দেয় মেয়েটি।

'এখন গেলেন কোথায়?' প্রশ্ন করে আল-বার্ক।

'আমার প্রতি নারাজ হয়ে চলে গেছেন। তার সন্দেহ, আমি আপনার সঙ্গে প্রেম নিবেদন করছি।' জবাব দেয় মেয়েটি।

'আচ্ছা, সত্যিই কি তুমি আমার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছো?' কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চায় আল-বার্ক।

স্বলাজ হাসি ফুটে উঠে মেয়েটির ওষ্ঠাধরে। ফিস্‌ফিস্ করে বলে, বুড়োটাকে আমার আর ভালো লাগে না; এর ব্যাপারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এর থেকে যদি কেউ আমাকে মুক্ত না করে, তবে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোন পথ থাকবে না।

সামরিক মহড়া ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি দর্শনার্থীরা। তারা দেখেছিলো শুধু সুদানী ফৌজ, যারা শ্বেতহস্তী হয়ে বসেছিলো রাজকোষের উপর। তাদের কমাণ্ডাররা বাইরে বের হতো রাজা-বাদশাহদের ন্যায়। সঙ্গে সেনাবহর থাকলে তারা পল্লীবাসীদের জন্য আপদ হয়ে দেখা দিতো। জনগণের গরু-ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। কারো নিকট উন্নত জাতের একটি ঘোড়া দেখলে সেটি কেড়ে নিয়ে যেতো। মানুষ বুঝতো, সরকার সৈন্য পুষে প্রজাদের উপর নিপীড়ন চালানোর-ই জন্য।

কিন্তু সুলতান আইউবীর বাহিনী সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সুলতানের বাহিনীর একটি অংশ মহড়ার মাধ্যমে আজ অনুপম বীরত্ব প্রদর্শন করলো। অপর এক অংশ সুলতানের পরামর্শে একাকার হয়ে গেছে জনতার মধ্যে। উদ্দেশ্য, জনতার সঙ্গে মিশে, কথা বলে এই ধারণা সৃষ্টি করা যে, আমরা তোমাদের ভাই, তোমাদের-ই একজন। তোমাদের কল্যাণে-ই আমাদের আবির্ভাব। জনগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী অসৎ সৈন্যদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন সুলতান আইউবী।

সুলতান আইউবীর সামরিক উপদেষ্টামণ্ডলীর প্রধান, একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব খাদেমুদ্দীন আল-বার্ক এই অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। এদিকের কিছু-ই তার কানে ঢুকছে না। চোখেও পড়ছে না কিছু-ই। পার্শ্বস্থিত মেয়েটি যাদু হয়ে জেঁকে বসেছে তার মাথায়। মেয়েটির প্রেম-সাগরে তলিয়ে গেছে সে। মন দেয়া-নেয়ার খেলা জমে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। মেয়েটিকে একস্থানে এসে মিলিত হওয়ার কথা বলে আল-বার্ক। মেয়েটি বলে, আমি বৃদ্ধের ক্রীতদাসী।

আমি তার হাতে বন্দী হয়ে আছি। সে আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে। মেয়েটি আরো জানায়, বৃদ্ধের ঘরে চারটি স্ত্রী।

নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে যায় আল-বার্ক। প্রেম-পাগল তরুণের ন্যায় মিলনের জন্য মেয়েটিকে এমন সব স্থানে আসতে প্রস্তাব করে, যেখানে বখাটেরা ছাড়া যায় না আর কেউ। একটি জায়গা পছন্দ হয়ে যায় মেয়েটির। শহরের বাইরে পরিত্যক্ত পুরনো এক জীর্ণ ভবন। মেয়েটিকে বৃদ্ধের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেয় আল-বার্ক। সাক্ষাতের দিন-ক্ষণ ঠিক করে আলাদা হয়ে যায় দু'জন।

❖ ❖ ❖

তৃতীয় রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আল-বার্ক। একজন শাসকের শান নিয়ে বের হতো সে। কিন্তু আজ বের হলো চোরের ন্যায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা দেয় একদিকে। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন কায়রো শহর। নীরবতা বিরাজ করছে সর্বত্র। সামরিক মহড়া শেষ হয়ে গেছে দু'দিন হলো। চলে গেছে বহিরাগত দর্শনার্থীরা। অস্থায়ীভাবে নির্মিত পতিতালয়গুলো তুলে দেয়া হয়েছে সরকারী নির্দেশে। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত চালাচ্ছে বহিরাগত কোন মেয়ে বা সন্দেহভাজন শহর কিংবা শহরতলীর কোথাও রয়ে গেলো কিনা। মেলার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। মাত্র দু'দিনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছে চার হাজার যুবক। আরো ভর্তি হবে বলে আশা করছেন সুলতান আইউবী।

শহরের বাইরে চলে যায় আল-বার্ক। সে নির্ধারিত ভবনটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। নীরব-নিস্তব্ধ রজনী। মেয়েটি বলেছিলো, সে বৃদ্ধের কয়েদী। সারাক্ষণ তার চোখে চোখে থাকতে হয়। তবু আল-বার্কের আশা, মেয়েটি আসবে অবশ্য-ই। সম্ভাব্য বিপদের মোকাবেলা করার জন্য তার হাতে আছে খঞ্জর। নারী এমনি এক যাদু, যা একবার কারো উপর সওয়ার হয়ে বসলে আর রক্ষা নেই। নারীর প্রেমেপড়া পুরুষটি পরোয়া করে না কিছুর-ই। তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়।

আল-বার্ক একজন পরিণত বয়সের পুরুষ। কিন্তু এখন সে একটি নির্বোধ আনাড়ী যুবক।

ভবনটির নিকটে চলে আসে আল-বার্ক। সম্মুখে অন্ধকারে আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃত একটি ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে তার। চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ছায়াটি।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয় আল-বার্ক। প্রেমের নেশা তার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে– ডর-ভয়, আত্মমর্যাদাবোধ সব। সে পুরনো পরিত্যক্ত জীর্ণ ভবনটির

সামনে এসে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক ইতিউতি তাকিয়ে ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে-ই ভিতরে প্রবেশ করে। কবরের অন্ধকার বিরাজ করছে ভবনটিতে। সম্মুখে একটি কক্ষ। মাথার উপর দিয়ে ফড় ফড় করে দ্রুতগতিতে উড়ে গেছে কি একটা পাখি। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগে তার গায়ে। পরক্ষণেই চি চি শব্দ শুনতে পায় সে। বুঝা গেলো এগুলো চামচিকা।

এখান থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে যায় আল-বার্‌ক। ঢুকে পড়ে আরেকটি কক্ষে। কারো ক্ষীণ পদশব্দ তার কানে আসে। এখানে কেউ আছে বলে অনুমান করে। কোমর থেকে খঞ্জর বের করে হাতে নেয়। মাথার উপর তার ভীতিকর ফড় ফড় শব্দে চামচিকা উড়ছে। আল-বার্‌ক ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দেয়— 'আসেফা?'

'আরে, আপনি এসেছেন?' খানিকটা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি। কিন্তু কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই ছুটে এসে গা ঘেষে দাঁড়ায় আল-বার্‌কের। লোকটাকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত চাপা কণ্ঠে বলতে শুরু করে— 'শুধু আপনার খাতিরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি। আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। বুড়োকে মদের সঙ্গে বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। জেগে ওঠলে বিপদ হবে।'

'কেন, মদের সঙ্গে বিষ খাওয়াতে পারলে না?' জিজ্ঞেস করে আল-বার্‌ক।

'আমি কখনো কাউকে খুন করিনি। আমি মানুষ হত্যা করতে পারি না। একজন পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম-নিবেদন করার জন্য এমন এক ভয়ঙ্কর স্থানে আসতে হবে, এমনটি ভাবিনি আমি কখনো।' জবাব দেয় মেয়েটি।

মেয়েটিকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে আল-বার্‌ক। ভোগের নেশায় উন্মাতাল তার হৃদয়। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠে পিছনের কক্ষে। যে কক্ষটি অতিক্রম করে আল-বার্‌ক এখানে এসে পৌঁছেছে, তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে দু'টি লণ্ঠন। লাঠির মাথায় তেলভেজা কাপড়ে আগুন জ্বালিয়ে বানানো প্রদীপ। আসেফাকে নিজের পিছনে নিয়ে লুকিয়ে ফেলে আল-বার্‌ক। হাতে তার খঞ্জর। এরা কি এই পরিত্যক্ত ভবনে বসবাসকারী কাল-ভূত, নাকি মেয়েটিকে ধাওয়া করতে তার স্বামী এসে পড়লো? উৎকণ্ঠিত ভাবনার জগত থেকে এখনো ফিরে আসেনি আল-বার্‌ক। হঠাৎ গর্জে উঠে একটি কণ্ঠ, 'দু'টাকে-ই খুন করে ফেলো।'

একেবারে নিকটে চলে আসে লণ্ঠন দু'টো। তার কম্পমান আলোয় চারজন লোক দেখতে পায় আল-বার্‌ক ও আসেফা। একজনের হাতে বর্শা, তিনজনের হাতে তরবারী। এক মাথা মাটিতে গেড়ে লণ্ঠন দু'টোকে দাঁড় করিয়ে রাখে তারা। আলোকিত হয়ে উঠে ভবনটির আঙ্গিনা। আল-বার্‌কের চারপার্শ্বে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে চক্কর দিতে শুরু করে চারজন লোক। আসেফা তার

পিছনে জড়সড় দণ্ডায়মান। পার্শ্বের কক্ষ থেকে আবার গর্জে উঠে একজন– 'পেয়েছিস? জ্যান্ত ছাড়বি না কিন্তু।' এটি মেয়েটির বৃদ্ধ স্বামীর কণ্ঠ।

আল-বার্কের পিছন থেকে সরে সামনে এগিয়ে আসে আসেফা। ক্ষোভ ও ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে বলে— 'সামনে আসো, আগে আমাকে খুন করো। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, অভিসম্পাত দেই। কারো প্ররোচনায় নয়– আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছি।'

সশস্ত্র চার ব্যক্তি আল-বার্ক ও আসেফার চারদিকে দণ্ডায়মান। বর্শাধারী লোকটি ধীরে ধীরে আসেফার প্রতি বর্শা এগিয়ে ধরে এবং আগাটা মেয়েটির পাজরে ঠেকিয়ে বলে— 'মরণের আগে বর্শার আগা কেমন দেখে নাও; কিন্তু এই বেটা তোমার আগে ছট্‌ফট্‌ করে তোমার সামনে মৃত্যুবরণ করবে, যার টানে তুমি এখানে ছুটে এসেছো।'

আসেফা মুখে কোন জবাব না দিয়ে ঝট্‌ করে বর্শাটা ধরে ফেলে এবং ঝটকা এক টান দিয়ে বর্শাটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আল-বার্ক থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ঝাঝাল কণ্ঠে বলে— 'আসো, সাহস থাকলে আমার সামনে আসো। আমার আগে একে তোমরা কিভাবে হত্যা করবে, আমি দেখে ছাড়বো!'

খঞ্জর উঁচিয়ে মেয়েটির সামনে চলে আসে আল-বার্ক। আসেফা যার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়েছিলো, খঞ্জরের আঘাত হানে তার উপর। পিছন দিকে পালিয়ে যায় লোকটি। পার্শ্ব পরিবর্তন করে তার সঙ্গীরা। তরবারী উদ্যত করলেও তারা আল-বার্কের উপর আক্রমণ করে না। অথচ, এ-স্থানে একটা লোককে হত্যা করা ব্যাপার-ই নয়। গর্জন করে চলেছে আসেফা। বারবার এগিয়ে গিয়ে হামলা করে ঠিক, কিন্তু তার প্রতিটি আঘাত-ই ব্যর্থ হচ্ছে। আল-বার্ক খঞ্জর দ্বারা আঘাত হানে একজনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক ছেড়ে দু'জন চলে আসে তার পিছনে। আসেফাও এক লাফে তার পিছনে চলে আসে। সে হাতের বর্শাটি দিয়ে তরবারীর মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু লাফ-ফাল আর তর্জন-গর্জন ছাড়া কিছু-ই করছে না সে।

একধারে দাঁড়িয়ে নিজের লোকদের উত্তেজিত করছে বৃদ্ধ। আল-বার্ক ও আসেফার উপর তারা বারবার আক্রমণ চালাচ্ছে। তাদের উপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে আসেফা। আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করছে আল-বার্ক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়েটির উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও আহত হলো না একজনও। বৃদ্ধের লোকেরা তরবারী চালনায় পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও আসেফা ও আল-বার্ক অক্ষতই রয়ে গেলো। একটি আঁচড় লাগলো

না তাদের গায়ে। হঠাৎ বৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে— 'আক্রমণ থামাও'। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় যুদ্ধ।

'এমন বে-ওফা, অসভ্য মেয়েকে আমি আর ঘরে রাখতে চাই না। ছুঁড়িটা যে এতো দুঃসাহসী, নির্ভীক, তা আগে আমি জানতাম না। এখন জোর করে ঘরে নিয়ে গেলেও সমস্যা; সুযোগ পেলে বেশ্যাটা আমাকে নির্ঘাত মেরেই ফেলবে।' ঝাঝাল কণ্ঠে বললো বৃদ্ধ।

'আমি তোমাকে এর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দেবো; বলো কত দিয়ে কিনেছিলে।' উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো আল-বারক।

ডান হাতটা প্রসারিত করে এগিয়ে আসে বৃদ্ধ। আল-বারকের হাতে হাত মিলিয়ে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলে, মূল্য দিতে হবে না। আমার সম্পদের অভাব নেই। মেয়েটিকে তুমি এমনিতে-ই নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে ওর এত-ই যখন ভালোবাসা, তো ওকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তাছাড়া ও যোদ্ধা বংশের সন্তান, আমি হলাম গিয়ে ব্যবসায়ী, সওদাগর মানুষ। তোমার ঘরে-ই ওকে ভালো মানাবে। তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর সরকারের কর্মকর্তা। আমি সুলতানের অনুগত ও ভক্ত। তোমাকে আমি নারাজ করতে পারি না। আমি মেয়েটিকে তালাক দিয়ে দিলাম এবং তোমার জন্য হালাল করে দিলাম ....। চলো দোস্ত! আমরা যাই।' বলেই তারা লণ্ঠন দু'টো হাতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে আল-বারক। তার পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করে যেন। এমন একটি অভাবিত ঘটনা ঘটে গেলো, তা যেন তার বিশ্বাস-ই হচ্ছে না। একে বৃদ্ধের প্রতারণা বলে সংশয় জাগে তার মনে। আশংকা জাগে, পথে ওঁৎ পেতে বসে থেকে তারা দু'জনকে-ই তারা করে ফেলে কিনা।

একটি বর্শা ছিলো আসেফার হাতে। আল-বারক সেটি নিজের হাতে নিয়ে খানিক অপেক্ষা করে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভবন থেকে। ডানে-বাঁয়ে-পিছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে দু'জন। কিছু একটা শব্দ কানে এলে-ই চকিত নয়নে থমকে দাঁড়ায়। অন্ধকারে চারদিক ইতিউতি দেখে নিয়ে আবার শুরু করে পথ চলা। শহরে প্রবেশ করার পর তারা দেহে জীবন ফিরে আসে। আসেফা আল-বারকের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি সত্যি-ই কি আমাকে বিশ্বাস করেন?' জবাবে মুখে কিছু না বলে আল-বারক বুকের সঙ্গে চেপে ধরে মেয়েটিকে। আবেগের আতিশয্যে কোন শব্দ বের হচ্ছে না তার মুখ থেকে। একটি অচেনা মেয়ের প্রেম অতীত জীবনের সকল অর্জন ছিনিয়ে নিয়েছে আল-বারকের। আল-বারকের স্ত্রী বয়সে তার সমান। এতকাল মন

উজাড় করে ভালবাসা দিয়ে এসেছে সে তাকে। কিন্তু আসেফাকে পেয়ে এখন তার মনে হচ্ছে, স্ত্রীর কোন মূল্য-ই নেই তার কাছে।

সে যুগে নারী বেচাকেনা হত। একত্রে চারটি বউ রাখাকে ন্যায্য অধিকার মনে করতো পুরুষরা। বিত্তশালীরা তো বিবাহ ছাড়াই দু'চারটি সুন্দরী মেয়ে ঘরে তুলতো। এই নারী-ই ধ্বংস করেছিলো মুসলিম আমীর-শাসকদের। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য খুঁজে খুঁজে সুন্দরী মেয়েদের সংগ্রহ করে স্বামীকে উপহার দিতো স্ত্রীরা।

আসেফাকে নিয়ে আল-বার্‌ক যখন ঘরে প্রবেশ করে, তখন ঘরের সকলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সকালে জাগ্রত হয়ে স্ত্রী যখন স্বামীর খাটে অপরিচিতা এক সুন্দরী তরুণীকে শুয়ে থাকতে দেখে, তখন সে এতটুকু অনুভবও করেনি যে, স্বামী-সোহাগ তার শেষ হয়ে গেছে। উল্টো বরং সে এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, যা হোক আমার স্বামী এমন একটি রূপসী মেয়ে পেয়ে গেছেন! নতুন শয্যা-সঙ্গীনী জুটে যাওয়ায় আমার কর্তব্য অনেকখানি লাঘব হয়ে যাবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মুসলমানদেরকে নারী থেকে এবং নারীকে মুসলমানদের কবল থেকে মুক্ত করতে চান। পুরুষদের নারী-লোলুপতা দেখে তিনি 'এক স্বামী এক স্ত্রী'র বিধান চালু করতে চাইছেন। কিন্তু বাঁধ সেঁধেছে তাঁর-ই আমীর-উজীরগণ। ঘরে তাদের একাধিক নারী। তারা-ই নারীর প্রধান খরিদ্দার। খোলা বাজারে নারী বেচা-কেনা, সুন্দরী মেয়েদের অপহরণ ঘটনা ঘটছে তাদের-ই কারণে। আমীর-শাসকদের নারী-পূজার ফলে-ই ইহুদী-খৃষ্টানরা নারীর মাধ্যমে সালতানাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাবার সুযোগ পাচ্ছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ভাবছেন এই নারীরা-ই একদিন পুরুষদের পাশাপাশি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো; জিহাদের ময়দানে ছিলো তারা মিল্লাতের আধা শক্তি। এখন কিনা সেই নারীরা-ই পুরুষদের বিনোদন ও বিলাস উপকরণে পরিণত। এতে একটি জাতির অর্ধেক সামরিক শক্তি-ই যে নিঃশেষ হয়েছে, তা-ই নয়– নারী এখন এমন একটি নেশায় পরিণত হয়েছে, যা জাতির বীর পুরুষদেরকে কাপুরুষে পরিণত করেছে। এসব ভাবনা অস্থির করে তুলেছে সুলতান আইউবীকে।

নারীর ইজ্জত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন সুলতান আইউবী। এ লক্ষ্যে তিনি একটি পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন। তাহলো অবিবাহিতা মেয়েদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেনা-বাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া। তাঁর আশা, এ পন্থা অবলম্বন করলে বিলাসপ্রিয় আমীর-উজীরদের হেরেম শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য তাঁর সালতানাতের খেলাফত ও ইমারাত হাতে নেয়া

একান্ত প্রয়োজন। এ এক কঠিন পদক্ষেপ। সুলতান আইউবীর দুশমনদের মধ্যে আপনদের সংখ্যা-ই বেশী। তিনি জানতেন, তাঁর জাতির মধ্যে ঈমান-বিক্রেতাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে-ই চলেছে। কিন্তু তাঁর একান্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রশাসনের পদস্থ এক কর্মকর্তা খাদেমুদ্দীন আল-বার্‌কও যে একটি রূপসী রক্ষিতাকে ঘরে তুলেছে এবং মেয়েটির প্রেম-নেশায় নিজের পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে বসেছে, তা এখনো তিনি জানেন না।

❖ ❖ ❖

মহড়ায় সুলতান আইউবীর সামরিক শক্তি ও বাহিনীর বীরত্ব দেখে মিসরের মানুষ অতিশয় আনন্দিত। তারা এতে দারুণ প্রভাবিত হয়েছে। সুলতান আইউবী ভাষণ-বক্তৃতায় তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি সেদিনকার এই সমাবেশে বক্তৃতা দেয়া আবশ্যক মনে করলেন। তিনি বললেন, আমার এই বাহিনী জাতির মর্যাদার মোহাফেজ, ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী। খৃষ্টানদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি মিসরবাসীদের উদ্দেশে বলেন, আরব বিশ্বের মুসলিম আমীর ও শাসকদের বিলাসপ্রিয়তার কারণে খৃষ্টানরা সেখানকার মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে রেখেছে। পথে পথে মুসলিম কাফেলা লুট করছে। তারা অপহরণ করে সম্ভ্রমহানী করছে মুসলিম মেয়েদের। ভাষণে জনগণকে জাতীয় চেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুলতান আইউবী বললেন, আপনারা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে আপনাদের মা-বোন-কন্যাদের ইজ্জত ও ইসলামের মর্যাদা সংরক্ষণ করুন।

সুলতান আইউবীর সেই বক্তব্য এতো-ই জ্বালাময়ী ছিলো যে, তা শ্রোতাদেরকে দারুণ উদ্দীপ্ত করে তোলে। সেদিন থেকে-ই যুবকরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে শুরু করে।

দশদিনে ভর্তি হওয়া যুবকের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় হাজারে। এদের অন্তত দেড় হাজার যুবক নিজ নিজ উট সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ঘোড়া ও খচ্চর নিয়ে আসে প্রায় এক হাজার। সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে বাহনের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দেন এবং সেনা কর্মকর্তারা তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করে দেন।

মহড়ার তিনদিন পর।

সুলতান আইউবীর সেনাবাহিনীতে তিনটি অপরাধ বেড়ে চলেছে। চৌর্যবৃত্তি, জুয়াবাজী ও রাতে অনুপস্থিতি। অপরাধগুলো এর আগেও ছিলো; কিন্তু ছিলো অনুল্লেখযোগ্য। সেনা মহড়ার পর এগুলো মহামারীর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে।

এ তিনটি অপরাধের মূলে ছিলো জুয়াবাজী। চুরির ব্যাপকতা এত বেশী ছিলো যে, এক সিপাহী অপর সিপাহীর ব্যক্তিগত জিনিস চুরি করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে ফেলতো। কিন্তু এক রাতে ঘটে যায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। হঠাৎ উধাও হয়ে যায় ফৌজের তিনটি ঘোড়া। অথচ সিপাহীদের সকলেই উপস্থিত। উচ্চ পর্যায়ে রিপোর্ট পৌঁছে। কর্মকর্তারা সিপাহীদের সতর্ক করেন, শাস্তির ভয় দেখান ও আল্লাহকে ভয় করে চলার উপদেশ দেন। কিন্তু তবু অপরাধ তিনটির প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়ে-ই চলেছে।

এক রাতে ধৃত হয় একজন সিপাহী। সে কোথাও থেকে ক্যাম্পে ফিরছিলো। এর আগে রাতে অনুপস্থিত থাকা সিপাহীরা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতো এবং তেমনিভাবে-ই ফিরে আসতো। কিন্তু আজ ধরা পড়ে গেলো একজন। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছিলো লোকটি। তাকে দেখে হাঁক দেয় প্রহরী। সিপাহী থেমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

কাছে গিয়ে প্রহরী দেখে, লোকটির সারা গায়ে রক্ত, যেন রক্ত দিয়ে গোসল করে এসেছে। তুলে তাকে কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। কিন্তু রক্ষা করা গেলো না তাকে। মৃত্যুর পূর্বে সে বলেছিলো, নিজের এক সিপাহী সঙ্গীকে সে হত্যা করে এসেছে। ক্যাম্প থেকে আধা ক্রোশ দূরে একটি তাঁবুতে পড়ে আছে তার লাশ। তার বর্ণনা মতে সেখানে তিনটি তাঁবু আছে। অধিবাসীরা যাযাবর। তাদের কাছে আছে অনেক রূপসী তরুণী। অনেক সিপাহী সেখানে রাতে যাওয়া-আসা করে।

তাঁবুর যাযাবর অধিবাসী মেয়েরা শুধু দেহ ব্যবসায়ী-ই নয়– তাদের প্রতিটি মেয়ে আপন আপন খদ্দেরের মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো যে, আমার জীবন তোমার জন্য উৎসর্গিত। বিয়ে করে আমি তোমার স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাতে চাই। পরে তদন্ত করে জানা গেছে, তারা তাদের খদ্দের সিপাহীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত ছিলো। তার-ই ফলে এই দু' সিপাহী যাযাবরদের তাঁবুতে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে একজন ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অপরজন আহত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রাণ হারায়।

যাযাবরের তাঁবুতে নিহত সিপাহীর লাশ আনার জন্য কয়েকজন লোক প্রেরণ করা হয়। একজন কমাণ্ডারও আছে তাদের সাথে। ক্যাম্পে মৃত সিপাহীর দেয়া নির্দেশনা মোতাবেক তারা এক স্থানে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু তাঁবু নেই। পড়ে আছে শুধু একটি লাশ। আলামতে বুঝা যাচ্ছে, এখানে তাঁবু ছিলো; তুলে নেয়া হয়েছে। রাতের বেলা পালিয়ে যাওয়া যাযাবরদের খুঁজে বের করা সম্ভব ছিলো না। তারা সিপাহীর লাশ তুলে নিয়ে ফিরে আসে।

সুলতান আইউবীকে এ দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেয়া হয়। রিপোর্টে এ-ও বলা হয় যে, সেনাবাহিনীর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। চুরি হয়েছে তিনটি ঘোড়া। সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন, সিপাহী বেশে ব্যারাকে গুপ্তচর ঢুকিয়ে তথ্য নাও, এসব অপরাধ বাড়লো কেন। আল-বার্কের বাহিনীকেও সুলতান আইউবী এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন।

এই 'কেন'র জবাব নগরীতে-ই বিদ্যমান। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছার সাধ্য নেই আলী বিন সুফিয়ানের গুপ্তচরদের। এটি দুর্গম একটি ভবন। একটি মিসরী পরিবার বাস করে এখানে। এই ভবন ও ভবনের অধিবাসীরা নগরীতে বেশ খ্যাতিমান। বিপুল পরিমাণ দান-খয়রাত বণ্টন হয় এখানে। গরীব-অসহায় মানুষ এখান থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। মহড়ার সময় এরা সৈন্যদের জন্য দু' থলে স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলো সুলতান আইউবীকে। এটি একটি ব্যবসায়ী পরিবার। সুলতান আইউবীর আগমনের আগে এ ভবনটি ছিলো সুদানী বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের মেহমানখানা। সুলতান আইউবী এসে সুদানীদের নির্মূল করে দেয়ার পর এরা সুলতানের অফাদারী মেনে নেয়।

সুলতান আইউবী যেদিন আল-বার্ক ও আলী বিন সুফিয়ানকে সেনাবাহিনীর অপরাধ প্রবণতার রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ দেন, সেদিন এই ভবনটির একটি কক্ষে বসা ছিলো দশ-বারোজন লোক। কক্ষে মদের আসর চলছিলো। এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করে এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধকে দেখে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় সকলে। সঙ্গে ছিলো তার অতিশয় সুন্দরী একটি মেয়ে, যার মুখমণ্ডলের অর্ধেকটা নেকাবে ঢাকা। তারা কক্ষে প্রবেশ করামাত্র দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটি তার মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলে। সে বৃদ্ধের সঙ্গে এক পাশে বসে পড়ে।

'সেনাবাহিনীতে জুয়াবাজী ও অপকর্ম বেড়ে যাওয়ার সংবাদ এই গতকাল-ই সুলতান আইউবীর নিকট পৌঁছেছে। আমাদের আজকের এই বৈঠক অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান আইউবী সিপাহীদের বেশে সেনাবাহিনীতে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের এই গুপ্তচরবৃত্তিকে ব্যর্থ করতে হবে। আমি যে তাজা সংবাদটি নিয়ে এসেছি, তা বড়-ই আশাব্যঞ্জক। এক মেয়েকে কেন্দ্র করে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে দু'জন সিপাহী একে অপরকে হত্যা করেছে। এটি আমাদের সাফল্যের সূচনা।' বললো বৃদ্ধ।

'তিন মাসে মাত্র দু'জন মুসলমান সিপাহী খুন হয়েছে। সাফল্যের এই গতি বড়-ই ধীর। প্রকৃত সফল তো তখন হবো, যখন সুলতান আইউবীর কোন নায়েব সালার তার সালারকে হত্যা করবে।' বৃদ্ধের কথা কেটে বললো আরেকজন।

'আমি তো বরং কামিয়াবী তাকে বলবো, যখন কোন সালার কিংবা নায়েব সালার সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করবে। আমি জানি, কোন বাহিনীর এক হাজার সিপাহী খুন হলেও তেমন কিছু যায় আসে না। আমাদের টার্গেট আইউবী। আইউবীকে হত্যা করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। গত বছরের ঘটনা দু'টোর কথা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। সমুদ্রতীরে আইউবীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া তীরটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলো। রোম থেকে আমাদের বাহিনী আসলো, কিন্তু তারা সকলেই ধরা পড়লো। এতে বুঝা যায়, আপনারা সুলতান আইউবীকে হত্যা করা যতো সহজ মনে করছেন, বিষয়টা ততো সহজ নয়। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে যে, আইউবী নিহত হলে তার স্থলে যিনি আসবেন, তিনি আরো কঠোর ও কট্টর মুসলমান হবেন। তাই আমার প্রস্তাব, তার বাহিনীকে সেই লোভনীয় ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো, যে পথে ক্রুশের পূঁজারীরা নিক্ষেপ করেছে বাগদাদ ও দামেশ্‌কের আমীর-শাসকদের।' বললো বৃদ্ধ।

'ক্রুশের অনুসারী ও সুদানী বাহিনী পরাজিত হলো এক বছর কেটে গেছে। এই এক বছরে আপনি কী কী কাজ করেছেন? আপনি বড় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। দু'জন লোককে যে করে হোক হত্যা করতে-ই হবে। সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান।' বললো একজন।

'আলী বিন সুফিয়ানকে যদি হত্যা করা যায়, তাহলে আইউবী এমনিতে-ই অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে।' বললো আরেকজন।

'আমি সেই চোখগুলোকে হাত করে ফেলেছি, যারা সুলতান আইউবীর বুকের প্রতিটি গোপন রহস্য স্পষ্ট দেখতে পায়।' বলে বৃদ্ধ তার সঙ্গে আসা মেয়েটির পিঠে হাত রেখে বললো— 'এই সেই চোখ। দেখে নাও, এই চোখ দু'টোতে কেমন যাদু! তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর পদস্থ এক কর্মকর্তা খাদেমুদ্দীন আল-বার্‌কের নাম অবশ্যই শুনেছো। কেউ হয়তো তাকে দেখেছেনও। সালাহুদ্দীন আইউবীর একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দু'জন। আলী ও আল-বার্‌ক। আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করা বোকামী হবে। আমি আল-বার্‌ককে যেভাবে কব্জা করেছি, আলীকেও সেভাবে হাত করতে হবে।

'কী বললেন, আল-বার্‌ক আপনার কব্জায় এসে গেছে?' উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে একজন।

'হ্যাঁ'– মেয়েটির রেশমী চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে বৃদ্ধ বললো– 'আমি তাকে এই শিকলে আটক করেছি। আজ বিশেষ করে এ সুসংবাদটি শুনানোর জন্যই আপনাদের এখানে তলব করেছি। আমাদের দ্রুত এ বৈঠক মুলতবী করতে হবে। কারণ, এভাবে একত্রে এক স্থানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা ঠিক নয়। এ মেয়েটিকে

বোধ হয় আপনারা সকলেই চিনবেন। এ যে এতো বিচক্ষণতার সাথে নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবে, আমি তা কল্পনাও করিনি। বয়সে কচি হলে কি হবে, মেয়েটা কাজে বড় পাকা। গত একটি বছর আমি এমন একটি সুযোগের সন্ধান করে ফিরছিলাম, যাতে আলী ও আল্-বার্ককে— অন্তত একজনকে ফাঁদে ফেলতে পারি। তাদের সঙ্গে আমরা কখনো সাক্ষাৎ করিনি। তার কারণ, আমি তাদের কাছে পরিচিত হতে চাইনি। সুলতান আইউবী সামরিক কর্মকর্তাদের শহর থেকে দূরে রাখেন। অবশেষে তিনি সামরিক মহড়া ও মেলার ঘোষণা দেন। আমি জানতে পারলাম, তিনি সেনা কমাণ্ডার ও সালারদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন মেলায় এসে তারা আম-জনতার সঙ্গে বসে, তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং ভীতি ছড়ানোর পরিবর্তে জনমনে আস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আলী বিন সুফিয়ানকে কোথাও পেলাম না। এই মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। খুঁজে পেলাম আল-বার্ককে। তার এক পাশে দু'টি শূন্য চেয়ার পেলাম। কাছেরটিতে মেয়েটিকে বসিয়ে অপরটিতে আমি বসে পড়লাম। একে আট মাস ধরে আমি ওস্তাদী কায়দা শিখিয়ে আসছি। আমাকে নিজের বৃদ্ধ স্বামী এবং নিজেকে খরিদকৃত মজলুম নারী পরিচয় দিয়ে আল-বার্কের ন্যায় ঈমানদার লোকটাকে নিজের রূপের ফাঁদে বন্দি করে মেয়েটি। অন্যত্র সাক্ষাতের সময় ও স্থান ঠিক করে নেয় দু'জনে। পতিত জীর্ণ ভবনটিতে নিয়ে এসে তার সঙ্গে কি ড্রামা খেলতে হবে, তা শিখিয়ে দিলাম। মেয়েটি যথাসময়ে ভবনটিতে চলে যায়। আল-বার্কও চলে আসে। চারজন লোক নিয়ে আমি পূর্ব থেকেই সেখানে লুকিয়ে ছিলাম। সেই চারজনের দু'জন এখানে উপস্থিত আছে। আপনারা সকলে হয়তো তাদেরকে চিনেন না। তারা আমাদের দলের লোক। মেয়েটি আল-বার্কের কাছে প্রমাণ করে যে, তার খাতিরে সে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। আমাদের চার সঙ্গী আর-বার্ক ও মেয়েটির উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে বসে। মেয়েটি বর্শা দ্বারা আক্রমণের মোকাবেলা করে। নাটকটিকে এমন সুনিপুণভাবে মঞ্চস্থ করা হলো যে, আল-বার্কের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগলো না। অভাগার মাথায় এ বুঝটুকুও আসলো না যে, তরবারী ও বর্শার এমন ঘোরতর লড়াই হলো, অথচ একটা লোকের গায়েও সামান্য আঁচড় লাগলো না; এমনকি তার নিজের গায়েও একটি খোঁচা লাগলো না! আমি এই বলে নাটকটির ইতি টানলাম যে, মেয়েটি এত দুঃসাহসী আমি আগে জানতাম না। এমন সাহসী মেয়ে কোন বীর পুরুষের পাশেই মানাবে ভালো। এই বলে সন্তুষ্টচিত্তে মেয়েটিকে আল-বার্কের হাতে তুলে দিলাম।'

'এমন পরিণত বয়সের একজন অভিজ্ঞ শাসক এতো সহজে আমার ফাঁদে আটকে গেলো, আমি ভেবে বিস্মিত হই। আমি তাকে সুরায় অভ্যস্ত করে তুলেছি, যা পূর্বে কখনো সে পান করেনি। তার প্রথমা স্ত্রী আমার সঙ্গে একই ঘরে বাস করে। তার ছেলে-মেয়েও আছে। কিন্তু আমাকে পেয়ে লোকটা সবাইকে ভুলে গেছে।' বললো মেয়েটি।

মেয়েটি কী কী পদ্ধতিতে সুলতান আইউবীর এমন একজন নির্ভরযোগ্য ও ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিত্বের বিবেক-বুদ্ধিকে নিজের মুঠিতে নিয়ে রেখেছে, সে সভাসদদের সামনে তার বিবরণ তুলে ধরে।

'এই তিন মাসে মেয়েটি আমাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কয়েকটি মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে। সুলতান আইউবী বিশাল সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই বাহিনীর অর্ধেক থাকবে মিসরে। বাকি অর্ধেককে তিনি নিজের কমাণ্ডে খৃষ্টান রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য নিয়ে যাবেন। দৃষ্টি তাঁর জেরুজালেমের উপর। কিন্তু আমার মেয়েটি আল-বার্ক থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে, তাহলো, সুলতান সর্বপ্রথম নিজের মুসলিম প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আপনজনদের ঐক্যবদ্ধ করবেন। কিন্তু ক্রুশের অনুসারীরা তাদের ঐক্যকে সেই পদ্ধতিতে বিনষ্ট করে দিয়েছে, যে পদ্ধতিতে আমরা আল-বার্ককে নিজেদের কব্জায় এনেছি।' বললো বৃদ্ধ।

'তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি, আল-বার্ক এখন আমাদের-ই লোক?' জানতে চাইল একজন।

'না। আল-বার্ক এখনো একনিষ্ঠভাবে-ই আইউবীর ওফাদার। পাশাপাশি ততটুকু ওফাদার আমাদের এই মেয়েটির। মেয়েটি বড় বিচক্ষণতা ও আবেগের সাথে নিজেকে এমনভাবে সুলতান আইউবী, জাতি ও ইসলামের জন্য উৎসর্গিত বলে প্রকাশ করে যে, আল-বার্ক একে স্বজাতির একটি জানবাজ কন্যা মনে করে। এর রূপ-যৌবন ও প্রেম-ভালবাসার ক্রিয়া-ই আলাদা। আল-বার্ককে আমরা আমাদের দলে ভেড়াতে পারবো না। তার প্রয়োজন-ই বা কি। সে আমাদের হাতের পুতুল হয়েই তো কাজ করছে।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

'সুলতান আইউবী আর কী করতে চান?' জিজ্ঞেস করে দলের এক সদস্য।

'সুলতান আইউবী সালতানাতে ইসলামিয়ার স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ক্রুশের সাম্রাজ্যে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করার পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। আমাদের যেসব গুপ্তচর সমুদ্রের ওপার থেকে এসেছিলো, তাদেরকে গ্রেফতার ও ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে বিশাল এক গ্রুপ তৈরি করেছেন। আল-বার্ক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিনি জানবাজদের একটি

আলাদা বাহিনী গঠন করেছেন। তার পরিকল্পনা, তাদেরকে বিভিন্ন খৃষ্টরাজ্যে প্রেরণ করে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা চালাবেন। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সালাহুদ্দীন আইউবীর পরিকল্পনা বড় ভয়াবহ। ক্রুসেড বিরোধী সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে-ই তিনি সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছিলেন এবং সেনাবাহিনীতে সাত হাজার যুবক ভর্তি করেছেন। এখনো ভর্তি হচ্ছে। যারা ভর্তি হচ্ছে, তাদের মধ্যে সুদানীও রয়েছে। আমি উপর থেকে যে নির্দেশনা পেয়েছি, তাহলো, আইউবীর বাহিনীতে পাপের বীজ বপণ করতে হবে। সৈন্যদের মনে নারী ও জুয়ার আসক্তি ঢুকিয়ে দিতে হবে।' জবাব দেয় বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ আরো জানায়, সুলতান আইউবীর সামরিক মহড়া সমাপ্ত হওয়ার পর পর সে সেনাদের মধ্যে নিজের লোক ঢুকিয়ে রেখেছে। তারা বড় বিচক্ষণতার সাথে সৈন্যদের মধ্যে জুয়া খেলা শুরু করিয়ে দিয়েছে। জুয়া আর নারী এমন এক বস্তু, যা মানুষকে চুরি ও খুন-খারাবিতে লিপ্ত করে। বৃদ্ধ আরো জানায়, বেশ্যা মেয়েদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমি আইউবীর সেনা ক্যাম্পগুলোর আশপাশে ছড়িয়ে দিয়েছি। তারা এতই বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে যে, তারা যে পেশাদার পতিতা, তা কাউকে বুঝতে-ই দেয় না। সুলতান আইউবীর সৈন্যদেরকে পাপের পথে নিক্ষিপ্ত করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করছে। বৃদ্ধ জানায়, ইতিমধ্যে আমার এই অভিযানের ফলও ফলতে শুরু করেছে। এই একেবারে তাজা খবর, দু'জন সিপাহী রাতের আঁধারে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে একই সময়ে এক মেয়ের তাঁবুতে ঢুকে। মেয়েটির দখল নিয়ে তারা বিবাদে লিপ্ত হয়। সৈনিক মানুষ তো! এক কথা দু' কথার পর যুদ্ধ বেঁধে যায় দু'জনের মধ্যে। একজন খুন হয়ে যায় ঘটনাস্থলে-ই। অপরজনের ব্যাপারে শুনেছি, সে রক্তাক্ত অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে মারা গেছে। এ রিপোর্ট চলে যায় সুলতান আইউবীর কাছে। তিনি আলী বিন সুফিয়ান ও আল-বারককে ডেকে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গুপ্তচর ঢুকিয়ে এই চুরি, জুয়াবাজি ও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ উদ্ঘাটনের নির্দেশ দেন। তাই আমাদের যে মেয়েগুলো এ কাজে নিয়োজিত আছে, আপনারা তাদের বলে দেবেন, যেন তারা ক্যাম্পের নিকটে না যায়।

বৈঠকে বৃদ্ধ আরো জানায়, আসেফা পাঁচ-ছয়দিন পর পর নতুন তথ্য জানাবার জন্য তার নিকট আসে। যে রাতে তার বাইরে বেরুবার প্রয়োজন পড়ে, সে রাতে আল-বারককে মদের সঙ্গে এক প্রকার নেশাকর পাউডার মিশিয়ে

খাইয়ে দেয়। তার ক্রিয়ায় লোকটা ভোর পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। বৈঠকে এ তথ্যও প্রকাশ করা হয় যে, মিশরের শহর-নগর ও গ্রাম-গঞ্জে গোপন বেশ্যালয় ও জুয়ার আড্ডা প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়েছে। তার ফলাফল বেশ আশাব্যঞ্জক। প্রশিক্ষিত সুন্দরী মেয়েরা সুশীল-সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদেরকে পাপের পথে নিক্ষেপ করে চলেছে। এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে, মুসলিম মেয়েদের মধ্যেও কিভাবে এই অশ্লীলতা ছড়ানো যায়।

খৃষ্টান গুপ্তচরদের গোপন এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়। তারা সকলে এক সঙ্গে বেরোয়নি। একজন বের হওয়ার দশ-পনের মিনিট পর বের হয় দ্বিতীয়জন। এভাবে একে একে সকলে চলে যায় আপন আপন ঠিকানায়। চলে যায় বৃদ্ধও। থেকে যায় শুধু আসেফা ও আরেকজন। অবশেষে আসেফাও মুখটা নেকাবে ঢেকে বেরিয়ে পড়ে লোকটার সঙ্গে।

আল-বার্কের ঘরে আসেফা এখনো এক রহস্যময়ী নারী। অন্যায় না হলেও আল-বার্ক কাউকে জানতে দেয়নি যে, সে আরেকটি মেয়েকে বৌ বানিয়ে ঘরে তুলেছে। এতকাল এক স্ত্রী নিয়ে ঘর করে চল্লিশ বছর বয়সে একটি সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করার কথা শুনলে বন্ধুরা ঠাট্টা করবে, এই তার ভয়। কিন্তু সে এ রহস্য বেশীদিন গোপন রাখতে পারেনি। শহর এবং সেনা ক্যাম্পগুলোর আশপাশে আলী বিন সুফিয়ান যে গুপ্তচরদের ছড়িয়ে রেখেছিলেন, তাদের মাধ্যমে তিনি রিপোর্ট পান, সামরিক মহড়ার পর থেকে শহরে জুয়া ও অপকর্ম বেড়ে চলেছে। একদিন এক গুপ্তচর আলী বিন সুফিয়ানকে রিপোর্ট দেয়, গত তিন মাসে সে চারবার দেখেছে, রাতে যখন সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন খাদেমুদ্দীন আল-বার্কের ঘর থেকে কালো চাদরে আবৃতা এক মহিলা বের হয়। ঘর থেকে বের হয়ে খানিক দূরে গেলে একজন পুরুষ তার সঙ্গ নেয়। গুপ্তচর জানায়, প্রথম দু'বার সে এতটুকু-ই দেখেছে। তৃতীয়বার সে মহিলার পিছু নেয়। দেখে, মহিলাটি লোকটির সঙ্গে একটি ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হয়ে লোকটির সঙ্গে ফিরে যায়।

গুপ্তচর জানায়, গতরাতেও সে মহিলাটিকে আল-বার্কের ঘর থেকে বের হয়ে উক্ত লোকটির সঙ্গে যেতে দেখে তাদের পিছু নেয়। কিছুদূর গিয়ে তারা আগের ঘরটিতে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসে অন্য একজনের সাথে। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা প্রবেশ করে শহরের অপর একটি বিশাল

ভবনে। গুপ্তচর ভবনটির বেশ দূরে একস্থানে অবস্থান নেয়। দীর্ঘসময় পর পনের-বিশ মিনিট অন্তর অন্তর ভবন থেকে একে একে বের হয় এগারজন লোক। সবশেষে সঙ্গী পুরুষটির সঙ্গে মহিলাটিও বের হয়। গুপ্তচর অন্ধকারে তাদের পিছু নেয়। আল-বার্‌কের ঘরের সামান্য দূর থেকে লোকটি চলে যায় অন্যদিকে। মহিলা ঢুকে পড়ে আল-বার্‌কের ঘরে।

আল-বার্‌কের ন্যায় উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তার বাসগৃহ সম্পর্কে রিপোর্ট করার সাহস একজন সাধারণ গুপ্তচরের থাকার কথা নয়। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ানের নীতি অত্যন্ত কঠোর। তাঁর গুপ্তচর ও সংবাদদাতাদের বলে রাখা ছিলো, স্বয়ং সুলতান আইউবীর কোন আচরণ-গতিবিধিতেও যদি সন্দেহ দেখা দেয়, তারও রিপোর্ট করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো পদমর্যাদার তোয়াক্কা করা যাবে না। যখন-ই যার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেবে– হোক তা তুচ্ছ– সঙ্গে সঙ্গে তা আলী বিন সুফিয়ানকে অবহিত করতে হবে।

এই গুপ্তচর চার চারটিবার যা দেখেছে, আলী বিন সুফিয়ানের জন্য তা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আল-বার্‌কের স্ত্রীকে ভাল করে-ই জানেন। মহিলা এমন নন যে, রাতের বেলা পরপুরুষের সঙ্গে ঘর থেকে বের হবেন। আল-বার্‌কের কোন যুবতী মেয়েও তো নেই! তাছাড়া আর-বার্‌ক নতুন কোন যুবতীকে বিয়ে করে ঘরে তুললে সে খবর তো তারা জানতেন!

বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবনায় পড়ে যান আলী বিন সুফিয়ান। তিনি ভাবেন, আল-বার্‌ক আমার বন্ধু মানুষ। তার ঘরে নতুন করে কিছু একটা ঘটে থাকলে তা আমার জানবার কথা। তবে কি আল-বার্‌ক কোন একটা নারীর খপ্পরে পড়ে গেলো? রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করা যায় কিভাবে?

মাথায় একটা বুদ্ধি আসে আলী বিন সুফিয়ানের। গোয়েন্দা বিভাগের একটি মেয়েকে নির্যাতিতা নারীর বেশে আল-বার্‌কের ঘরে প্রেরণ করেন। তাকে বলে দেন, তুমি গিয়ে বলবে, আমার স্বামী মারা গেছেন। ছেলে-সন্তান কেউ নেই। আমাকে সাহায্য করুন।

আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশনা মোতাবেক মেয়েটি আল-বার্‌কের ঘরে যায়। আল-বার্‌ক তখন ঘরে ছিলো না। মেয়েটি কৌশল করে ঘরের সর্বত্র ঘুরে-ফিরে দেখে। সে এক নবাগতা সুন্দরী তরুণীকে দেখতে পায়। মেয়েটি আল-বারককের প্রথমা স্ত্রীর কাছে যায়। তার কাছে নিজের ফরিয়াদ পেশ করে।

বলে, আপনি দয়া করে আল-বার্কের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করুন। কথায় কথায় সে জিজ্ঞেস করে বসে, আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে? আল-বার্কের স্ত্রী জবাব দেয়— 'ও আমার মেয়ে নয়– আমার স্বামীর নতুন বউ। তিন মাস হলো, তিনি একে বিয়ে করেছেন।

আলী বিন সুফিয়ানের জন্য এ তথ্য ছিলো বিস্ময়কর। তার মনে এ সন্দেহ-ই জাগ্রত হয়েছিলো যে, রাতের অন্ধকারে বের হওয়া মেয়েটি আল-বার্কের স্ত্রী হতে পারে না। গুপ্তচর মেয়েটির দেয়া তথ্যের পর অপর এক মহিলার মাধ্যমে আলী বিন সুফিয়ান আল-বার্কের প্রথমা স্ত্রীর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, আমি বাইরে কোথাও আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। তবে আল-বার্ক যেন জানতে না পারে। বার্তায় তিনি একথাও বলেন, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমার অনেক জরুরী কথা আছে। আলী বিন সুফিয়ান সাক্ষাতের স্থান এবং সময়ও নির্ধারণ করে দেন।

আল-বার্ক অফিসের কাজে ব্যস্ত। তার প্রথমা স্ত্রী নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হন। মহিলাকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন আলী বিন সুফিয়ান। তিনি বললেন— 'আমি জানতে পারলাম, আপনার স্বামী নাকি আরেকটি বিয়ে করেছে? ' মহিলা বললেন— 'আল্লাহর শোকর, আমার স্বামী মাত্র দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন– তৃতীয় বা চতুর্থ বিয়ে করেননি।'

কথা প্রসঙ্গে আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন— 'তা নতুন বউটা কেমন হলো?'

'অত্যন্ত সুন্দরী।' জবাব দেন মহিলা।

'ভদ্রও তো, না? তার প্রতি আপনার কোন ধরনের সন্দেহ নেই তো?' জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

জবাবে মহিলা কিছু-ই বললেন না। নীরবে কিছুক্ষণ ভাবনায় পড়ে থাকেন। আলী বিন সুফিয়ান জবাবের অপেক্ষা না করে বললেন— 'আচ্ছা, আমি যদি বলি, মেয়েটি মাঝে-মধ্যে রাতের আঁধারে বাইরে কোথাও চলে যায়, তাহলে রাগ করবেন না তো?'

মহিলা স্মিত হেসে বললেন— 'আমি নিজে-ই অস্থিরচিত্তে ভাবছিলাম, কথাটা কাকে বলবো। আমার স্বামী মেয়েটির গোলাম হয়ে গেছেন। আমার সঙ্গে তো তিনি এখন কথাও বলেন না। অতি আদরের এই বউটির বিরুদ্ধে যদি কিছু বলতে

যাই, তাহলে নির্ঘাত আমাকে তিনি ঘর থেকে বের করে দেবেন। তিনি ভাববেন, হিংসাবশত আমি তার বদনাম করছি। মেয়েটি আসলেই ভালো নয়। আমার ঘরে ইতিপূর্বে কখনো মদের ঘ্রাণও আসেনি। আর এখন পিপার পর পিপা শূন্য হয়ে যায়।'

'মদ? আল-বার্ক মদও পান করতে শুরু করেছে?' হঠাৎ শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করেন আলী বিন সুফিয়ান।

'শুধু পানই করেন না- মাতাল-অচেতনও হয়ে যান। আমি ছয়বার মেয়েটিকে রাতের বেলা বাইরে যেতে দেখেছি। ফিরেছে অনেক বিলম্বে। আমি এ-ও দেখেছি যে, যে রাতে মেয়েটির বাইরে যেতে হয়, সে রাতে আল-বার্ক অজ্ঞানের মত পড়ে থাকেন। সকালে জাগ্রত হন অনেক বিলম্বে। মেয়েটি বড় বদমাশ, লোকটার সঙ্গে ও প্রতারণা করছে।' বললেন মহিলা।

'না, মেয়েটি বদমাশ নয়- গুপ্তচর। আর সে ধোঁকা দিচ্ছে আল-বার্ককে নয়- গোটা জাতিকে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'কী বললেন? গুপ্তচর? আমার ঘরে শত্রুর গোয়েন্দা?' অকস্মাৎ চমকে উঠেন মহিলা। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড় কর বললেন— 'আপনি জানেন, আমি শহীদ পিতার কন্যা। আমার স্বামী আল-বার্ক ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। নিজের জীবনটা উৎসর্গ করে রেখেছিলেন ইসলামের জন্য। সন্তানদেরকে আমি গঠন করছি জিহাদের জন্য। আর এখন আপনি কিনা বলছেন, আমার সন্তানদের পিতা একজন শত্রু গোয়েন্দা মেয়ের কব্জায় বন্দী! আমি আমার সন্তানদের পিতাকে ত্যাগ করতে পারি- জাতি ও ইসলামকে কোরবান হতে দিতে পারি না। যে করে হোক, দু'জনকে-ই আমি খুন করে ফেলবো।'

'আলী বিন সুফিয়ান মহিলাকে বড় কষ্টে শান্ত করেন। বললেন, মেয়েটি যে গুপ্তচর, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। দেখতে হবে, আল-বার্ক গুপ্তচরদের দলে ভিড়েই গেলো, নাকি তাকে মদপান করিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান আল-বার্কের স্ত্রীকে এ-ও জানান যে, আমরা গুপ্তচরদের হত্যা করি না- গ্রেফতার করে তাদের গ্যাং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি।

আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে শান্ত হয়ে আল-বার্কের স্ত্রী চলে যান। কিন্তু তার ভাব-গতিতে মনে হচ্ছিলো, ঈমানী চেতনাসমৃদ্ধ মহিলা ফুঁসে উঠতে পারেন যে কোন মুহূর্তে। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন তিনি।

❖❖❖

খাদেমুদ্দীন আল-বার্ক আলী বিন সুফিয়ানের কেবল সহকর্মী-ই নয়— অন্তরঙ্গ বন্ধুও বটে। বয়সেও দু'জন সমান। রণাঙ্গনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইও করেছেন দু'জনে। সে সুলতান আইউবীর প্রবীণ সহচর। তথাপি সে তার দ্বিতীয় বিয়ের কথা আলী বিন সুফিয়ান থেকে গোপন রেখেছে। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর আলী বিন সুফিয়ান এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে কোন আলাপ করেননি। আল-বার্কের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য সুকৌশলে তৎপরতা চালান। তিনি আল-বার্কের ঘর এবং মেয়েটি রাতের অন্ধকারে যে বাড়িতে যাওয়া-আসা করে, দু'য়ের মাঝে গুপ্তচর বসিয়ে দেন।

আল-বার্কের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানের কথা হলো দু'দিন হয়ে গেছে। এ সময়ে আসেফা ঘর থেকে বের হয়নি। রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে আলীর গোয়েন্দারা।

তৃতীয় রাতের দ্বি-প্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। ঘুমিয়ে আছেন আলী বিন সুফিয়ান। হঠাৎ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে এক চাকর। ঘুম থেকে ডেকে তোলে তাঁকে। বলে— 'ওমর এসেছে! তাকে বড় ভয়ার্ত দেখাচ্ছে!'

ধনুক থেকে বের হওয়া তীরের ন্যায় দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন আলী বিন সুফিয়ান। দু'-তিন লাফে বারান্দা অতিক্রম করে দেউড়ী পার হয়ে বাইরে চলে আসেন। বাইরে দণ্ডায়মান ওমর বললো— 'দ্রুত দশ-বারজন অশ্বারোহী প্রস্তুত করুন! নিজের ঘোড়াও হাজির করুন! তারপর বলছি, কী ঘটেছে।'

চৌদ্দজন সশস্ত্র আরোহী, নিজের ঘোড়া ও তরবারী প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে আলী ওমরকে জিজ্ঞেস করেন— 'বলো, ব্যাপার কী?'

আসেফার গতিবিধি অনুসরণ করার জন্য নিয়োজিত ছিলো ওমর ও আজর নামের দুই গোয়েন্দা। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েটি কোথাও যেতে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দেবে।

বড় ভয়ানক সংবাদ নিয়ে এসেছে ওমর। সে জানায়, এই সামান্য আগে আল-বার্কের ঘর থেকে আপাদমস্তক কালো চাদরে ঢাকা একটি মেয়ে বের হয়েছে। পঞ্চাশ-ষাট গজ পথ অতিক্রম করার পর সেই ঘর থেকে বের হয় একই রকম পোশাকে আরেকজন নারী। দ্রুত অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় মহিলা প্রথম মহিলার

পিছনে চলে যায়। খানিকটা দূরে থাকতে-ই প্রথম মহিলা দাঁড়িয়ে যায়। গুপ্তচর দু'জন লুকানো ছিলো আড়ালে। তাদের দেখতে পায়নি কেউ। মহিলাদের অনুসরণও করছিলো অতি সন্তর্পণে। মুখোমুখি হলো মহিলাদ্বয়। কি যেন কথা হলো দু'জনের মধ্যে। হঠাৎ হাতে তালি বাজায় তাদের একজন। কাছাকাছি একস্থান থেকে বেরিয়ে আসে এক ব্যক্তি। সে দ্বিতীয় মহিলাকে আটক করার চেষ্টা করে। মহিলা কি একটি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো তার উপর। মহিলার উপরও পাল্টা আঘাত হানে লোকটি।

কণ্ঠস্বর শোনা গেলো প্রথম মহিলার– 'একে তুলে নিয়ে চলো'। দ্বিতীয় মহিলা আঘাত হানে তার উপর। তার চীৎকারের শব্দ ভেসে আসে। পুরুষ লোকটির আঘাত প্রতিহত করে দ্বিতীয় মহিলা। আরো একটি আঘাত হানে প্রথম মহিলার উপর। আহত হয়ে পড়ে মহিলাদের দু'জনই। আলী বিন সুফিয়ানকে সংবাদ দেয়ার জন্য দৌড়ে যায় ওমর। আজর লুকিয়ে থাকে সেখানে-ই। এরা যায় কোথায়, দেখবার অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকে সে।

এরূপ বিশেষ সময়ের জন্য অতি দ্রুতগামী ও অভিজ্ঞ আরোহীদের একটি বাহিনী গঠন করে রেখেছিলেন আলী বিন সুফিয়ান। রাতে ঘুমায় তারা আস্তাবলে– ঘোড়ার কাছে। যিন-হাতিয়ার প্রস্তুত থাকে সব সময়। প্রয়োজন হলে রাতেও যেনো তারা কয়েক মিনিটে প্রস্তুত হয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যেতে পারে, তার প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। বাহিনীটি এতো-ই তৎপর যে, সংবাদ পেয়ে আলী বিন সুফিয়ান পোশাক পরিবর্তন ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে না করতে-ই তারা এসে উপস্থিত।

আলী বিন সুফিয়ানের নেতৃত্ব ও ওমরের রাহ্বরীতে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছে বাহিনীটি। দু'জন আরোহীর হাতে লাঠির মাথায় বাঁধা তেল-ভেজা কাপড়ের মশাল। ঘটনাস্থলে পড়ে আছে দু'টি মানব-দেহ। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দেখলেন আলী বিন সুফিয়ান। একজন আল্-বার্কের প্রথমা স্ত্রী, অপরজন ওমরের সহকর্মী আজর। দু'জন-ই জীবিত এবং রক্তরঞ্জিত।

আজর জানায়, অপর দু'জন এই মহিলাকে ফেলে চলে গেলে আমি এগিয়ে আসি। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন পরপর তিনটি আঘাত হানে আমার উপর। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। আক্রমণকারী পালিয়ে যায়। অপর মহিলা আল-বার্কের ঘরের দিকে যায়নি, গেছে বরাবরের মতো ঐ ভবনটির দিকে। সেই ভবনটি জানা আছে ওমরের।

আলী বিন সুফিয়ান দু'জন আরোহীকে বললেন, তোমরা জখমীদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করো। অবশিষ্টদেরকে ওমরের দিক-নির্দেশনায় সেই ভবনটির দিকে নিয়ে যান, আসেফা যেখানে যাওয়া-আসা করতো।

পুরনো আমলের বিশাল এক বাড়ি। সঙ্গে সংযুক্ত আরো কয়েকটি ভবন। পিছনের দিক থেকে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা গেলো। আলী বিন সুফিয়ান তার সৈন্যদেরকে ভবনটির দু'দিক থেকে পিছনে পাঠিয়ে দেন। দু'জনকে দাঁড় করিয়ে রাখেন সম্মুখের ফটকে। বলে দেন, ভেতর থেকে কেউ বেরুবার চেষ্টা করলে তাকে ধরে ফেলবে। পালাবার চেষ্টা করলে পেছন থেকে তীর ছুঁড়ে শেষ করে দেবে।

চক্কর কেটে আলী বিন সুফিয়ানের সৈন্যরা ভবনের পিছনে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে তারা একাধিক ধাবমান ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পায়। আলী বিন সুফিয়ান এক আরোহীকে বললেন— 'জল্‌দি যাও, কমাণ্ডারকে বলো, দ্রুত ভবনটিকে ঘিরে ফেলে যেন ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং ভিতরের সবাইকে গ্রেফতার করে।'

আরোহী ক্যাম্পের দিকে ছুটে যায়।

আলী বিন সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে তাঁর বাহিনীকে আদেশ করেন— 'ঘোড়া ছুটাও-ধাওয়া করো।' নিজেও ঘোড়া হাঁকান আলী বিন সুফিয়ান। উন্নত জাতের বাছাই করা ঘোড়া তাঁর। বাতাসের গতিতে ছুটে চলেন তিনি। নগর এলাকা পেরিয়ে-ই সামনে খোলা ময়দান।

অন্ধকারে ঘোড়া দেখা যায় না। ধাবমান অশ্বের শব্দের অনুসরণ করা হচ্ছে শুধু। নগর ছেড়ে খোলা মাঠে এসে পড়ে পলায়নকারীরা। এবার আত্মগোপন করা কঠিন হয়ে পড়ে তাদের জন্য। বিস্তৃত দিগন্তের দৃশ্যপটে এবার ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে তাদের।

তারা চারজন। দু' পক্ষের মাঝে এখনো অন্তত একশত গজের ব্যবধান। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশে ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে-ই তীর ছুঁড়ে দু' আরোহী। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আক্রমণ। বড় চতুর মনে হলো ওদের। যাচ্ছিলো একত্রিতভাবে পাশাপাশি। এবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের ঘোড়া। ধেয়ে চলেছে অবিরাম। আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীও এগিয়ে চলছে তীব্রগতিতে।

ধীরে ধীরে দু' পক্ষের মাঝের দূরত্ব কমে আসতে থাকে। পলায়নকারীদের ঘোড়াও পরস্পর আরো বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সামনে ঘন সন্নিবিষ্ট একটি খেজুর বাগান। এখানে উপনীত হয়ে তাদের ঘোড়াগুলো একের থেকে অপরটি আরো দূরে সরে যায়। দু'টি ডানে আর দু'টি বাঁয়ে কেটে পড়ে। স্থানটি বেশ উঁচু। উপরে অদৃশ্য হয়ে যায় ঘোড়াগুলো।

আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীও উঁচুতে আরোহণ করে। কিন্তু পলায়নরত ছায়ামূর্তিগুলো এবার অনেক ব্যবধানে চলে যায় তাদের থেকে। চারজন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, ওরা তার বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করতে চায়। উচ্চকণ্ঠে হাঁক দেন তিনি। বলেন— 'বিভক্ত হয়ে তোমরা ওদের ধাওয়া করো। আরো দ্রুত ঘোড়া ছুটাও। ব্যবধান কমিয়ে ফেলো। ধনুকে তীর সংযোজন করো।'

চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনী। কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তাতে তীর সংযোজন করে। পিছু নেয় পলায়নকারী চারটি ঘোড়ার। পলায়নকারীদের ঘোড়ার গতি বেড়ে যায় আরো। বেড়ে যায় আলী বিন সুফিয়ানের বাহিনীর ঘোড়ার গতিও। হঠাৎ উনিশটি ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনির শব্দ ভেদ করে কানে ভেসে এলো ধনুক থেকে ছুটে যাওয়া একটি তীরের শাঁ শাঁ শব্দ। সঙ্গে একজনের চীৎকার ধ্বনি— 'একটা শেষ করেছি– ঘোড়া কাবু হয়ে গেছে।'

এদিকে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে যে দু'জন আরোহী আছে, তারাও তীর ছুঁড়ে। অন্ধকারে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, হচ্ছেও। তবু তারা একটি ঘোড়াকে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোড়াটি চক্কর কেটে চলে আসে পিছনে। একজন বর্শার আঘাত হানে ঘোড়াটির ঘাড়ে। পেটে বর্শা ঢুকিয়ে দেয় আরেকজন। অত্যন্ত শক্ত-সামর্থ ঘোড়া। দু'টি আঘাত খাওয়ার পরও দাঁড়িয়ে আছে। আরোহীদের জীবিত ধরতে হবে। আলীর এক সৈনিক হাত বাড়িয়ে এক আরোহীর ঘাড় ধরে ফেলে। তার ঘোড়া আহত। ঘোড়া থেমে যায়। ঘোড়ার আরোহী দু'জন। একজন পুরুষ, একটি মেয়ে। মেয়েটি বসেছে পুরুষের সামনে। তাকে অচেতন বলে মনে হলো।

অন্ধকার রাত। এখন আর কোন ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায় না। এখন কানে আসছে শুধু কতিপয় মানুষের কথা বলার শব্দ আর দুল্‌কি চালে চলন্ত কয়েকটি ঘোড়ার আওয়াজ। আরোহীরা একে অপরকে ডাকাডাকি করছে। তাদের আওয়াজে বুঝা যাচ্ছে, তারা পলায়নপর লোকগুলোকে ধরে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান সবাইকে একত্রিত করেন। পলায়নপর লোকগুলো এখন তার হাতে বন্দী। তাদের দু'টি ঘোড়া আহত। সেগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যমের হাতে।

পলায়নপর লোকের সংখ্যা পাঁচজন। চারজন পুরুষ, একটি মেয়ে। মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। পুরুষদের একজন বললো, আমাদের সঙ্গে তোমরা যেমন ইচ্ছা আচরণ করতে পারো। কিন্তু এই মেয়েটি আহত। আমরা আশা করি তোমরা একে বিরক্ত করবে না।

একটি ঘোড়ার যিনের সঙ্গে মশাল বাঁধা আছে। সেটি খুলে নিয়ে জ্বালানো হলো। মশালের আলোকে মেয়েটিকে নিরীক্ষা করে দেখা হলো। অতিশয় রূপসী এক যুবতী। গায়ের পোশাক রক্তে রঞ্জিত। কাঁধে ও ঘাড়ের পার্শ্বে গভীর ক্ষত। সীমাহীন রক্তক্ষরণে মুখমণ্ডল লাশের ন্যায় সাদা। চক্ষুদ্বয় মুদিত। আলী বিন সুফিয়ান জখমের গর্তে এক খণ্ড কাপড় ঢুকিয়ে আরেকটি কাপড় দ্বারা বেঁধে দেন। তারপর তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে এক সৈনিককে বললেন, একে জলদি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। কিন্তু 'জলদি' যাওয়া কিভাবে। শহর এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। একজন বৃদ্ধও আছে কয়েদীদের মধ্যে।

❖ ❖ ❖

বন্দীদের নিয়ে আলী বিন সুফিয়ান যখন কায়রো পৌঁছেন, তখন রাত পেরিয়ে ভোর হয়েছে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী রাতের অঘটনের খবর পেয়ে গেছেন আগেই। আলী বিন সুফিয়ান হাসপাতালে যান। ডাক্তারগণ আহত বন্দী মেয়েটির ব্যাণ্ডেজ-চিকিৎসায় ব্যস্ত। তারা মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। এই একটু আগে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে মেয়েটি।

আল-বারকের প্রথমা স্ত্রী ও আজরের জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু অবস্থা তাদের আশাব্যঞ্জক নয়। সুলতান আইউবীও হাসপাতালে উপস্থিত। তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন— 'আমি অনেকক্ষণ যাবত এখানে আছি। আল-বারককে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে সে আমাকে এক অদ্ভুত কথা শোনালো। বললো, আল-বারক অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। কক্ষে তার মদের পেয়ালা-পিপা। লোকটা মদপান করতে শুরু করলো? স্ত্রীটা যে তার ঘরের বাইরে আহত হয়ে পড়ে আছে, সে খবরটা পর্যন্ত তার নেই। তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি এখনও কথা বলিনি– ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে।'

একজন নয়– আল-বার্‌কের দু' স্ত্রী-ই আহত। এই যে মেয়েটিকে আমরা মরুভূমি থেকে ধরে এনেছি, ও আল-বার্‌কের দ্বিতীয়া স্ত্রী। আমরা একটি মূল্যবান শিকার ধরে এনেছি।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সূর্যোদয়ের পর ঘুম ভাঙ্গে আল-বার্‌কের। চাকরের মুখে সংবাদ পেয়ে সে হাসপাতালে ছুটে আসে। দু' স্ত্রী-ই তার রক্তাক্ত পড়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। চারজন গুপ্তচর দেখানো হয় তাকে। চারজনের মধ্যে বৃদ্ধকে দেখে অবাক্ হয়ে যায় আল-বার্‌ক। তার জানা মতে লোকটা তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামী।

কেইসটা নিজের হাতে তুলে নেন সুলতান আইউবী। অত্যন্ত মারাত্মক কেইস, যার সঙ্গে জড়িত প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের এমন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, সুলতান আইউবীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা, গোপন রহস্য সব-ই যার জানা।

জ্ঞান ফিরে আসে জখমীদের। জবানবন্দী নেয়া হয় আল-বার্‌কের প্রথমা স্ত্রীর। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে কথা বলে ক্ষুব্ধ মনে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। তিনি জানান, ঘরে ফিরে গিয়ে আমি আসেফার গতিবিধির উপর গভীর নজর রাখতে শুরু করি। রাতে না ঘুমিয়ে পাহারা দিতে থাকি। এক সুযোগে আসেফার শয়নকক্ষের দরজায় একটুখানি ছিদ্র করি প্রথম দু' রাতে শুধু এতটুকু-ই দেখলাম যে, মেয়েটি আল-বারক্‌কে মদপান করাচ্ছে এবং বেহায়াপনা-উলঙ্গপনার চূড়ান্ত ঘটাচ্ছে। সুলতান আইউবী সম্পর্কে মেয়েটি এমন ধারায় কথা বলছে, যেন তিনি তার পীর, মুরশিদ। খৃষ্টানদের নিন্দাবাদ করছে। কথা বলছে সুলতান আইউবীর সামরিক পরিকল্পনা বিষয়ে। সুলতান আইউবী কী করবেন এবং কী ভাবছেন, অবলীলায় মেয়েটিকে বলে যাচ্ছে আল-বার্‌ক।

দু'টি রাত আমি এ পর্যন্ত দেখলাম ও শুনলাম। তৃতীয় রাতে মঞ্চস্থ হলো সেই নাটকটি, অধীর চিত্তে আমি যার অপেক্ষায় ছিলাম। আসেফা আল-বার্‌ককে মদপান করায় এবং সম্পূর্ণরূপে পশুতে পরিণত করে তোলে। দু'টি শূন্য পেয়ালা হাতে নিয়ে আসেফা এই বলে অন্য কক্ষে চলে যায় যে, 'অপেক্ষা করুন, আরো আনছি।' ফিরে আসে সুরাভর্তি আরো দু'টি পেয়ালা নিয়ে। একটি তুলে দেয় আল-বার্‌কের হাতে আর অপরটি লাগায় নিজের মুখে। তৃতীয় পেয়ালাটি গলাধঃকরণ করে আল-বার্‌ক মুদিত-নয়নে শুয়ে পড়ে, যেন হঠাৎ রাজ্যের ঘুম এসে তাকে চেপে ধরেছে।

আসেফা শোশক পরিধান করে। আলতো পরশে গায়ে হাত বুলিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে আল-বারককে। কিন্তু লোকটার কোন সাড়া-শব্দ নেই। আসেফা হাতে ধরে নাড়া দেয় তাকে। কিন্তু, না, তার বিন্দুমাত্র হুশ নেই। মেয়েটি মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডার খাইয়ে আল-বারককে সম্পূর্ণ অচেতন করে ফেলেছে।

আসেফা গায়ে একটি কালো চাদর জড়িয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেয়। তখন মধ্যরাত। আসেফা কক্ষের বাতি নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। দাউ দাউ করে যেন আমার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে। নিজের কক্ষে প্রবেশ করে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নেই। হাতে খঞ্জর তুলে নেই। বের হতে গিয়ে দেখি, আসেফা ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে এক চাকরানীর সাথে। বুঝলাম, এই চাকরানীটা তার সহযোগী।

আসেফা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। চাকরানী চলে যায় নিজ কক্ষে। বেরিয়ে পড়ি আমিও। দ্রুত হেঁটে পিছু নিলাম আসেফার। বাইরে ঘোর অন্ধকার। পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। আমি আসেফার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে চলছি। মেয়েটি কোথায় যায়, তা দেখা আমার উদ্দেশ্য। এক পর্যায়ে বোধ হয় আসেফা আমার পদশব্দ শুনতে পায়। সে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অন্ধকারে আমি তাকে ভালোভাবে দেখতে পাইনি। এসে পড়ি আসেফার একেবারে সন্নিকটে। হঠাৎ কী করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। অলক্ষ্যে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে— 'যাচ্ছো কোথায়, আসেফা?'

মেয়েটির নিরাপত্তার জন্য চুপিসারে এগিয়ে চলছিলো এক ব্যক্তি। তা আল-বারকের প্রথমা স্ত্রীর জানা ছিলো না। আসেফা হাততালি দেয় এবং মুখে হাসি টেনে এনে আল-বারকের প্রথমা স্ত্রীকে বলে, তা আপনি কি আমার পিছু পিছু আসলেন, নাকি কোথাও যাচ্ছেন? এরই মধ্যে পিছন থেকে ছুটে এসে মহিলার বাহু চেপে ধরে একজন। বন্ধন শক্ত হওয়ার আগেই মহিলা ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় লোকটার কবল থেকে। লোকটি মহিলার আঘাত প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত করে তার উপর। খঞ্জর বিদ্ধ হয় মহিলার পাজরে। অমনি সরে যায় পিছনে। আহত মহিলা আক্রমণ করে আসেফার উপর। খঞ্জর বিদ্ধ হয় মেয়েটির ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানটিতে। চীৎকার করে উঠে আসেফা।

আসেফা মাটিতে পড়ে যায়। বসে পড়ে আল-বারকের প্রথমা স্ত্রীও। দু'জন-ই আহত, রক্তাক্ত। কাতরাচ্ছে তারা। ক্ষণিক পর লোকটি এগিয়ে এসে আসেফাকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

আলী বিন সুফিয়ানের দু' গুপ্তচর ওমর ও আজর ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করছিলো চুপি চুপি। অপর মহিলাটি কে, তা তাদের জানা ছিলো না। যে লোকটি আসেফাকে তুলে নিয়ে গেলো, ওমর পিছু নেয় তার। দেখবে, লোকটি যায় কোথায়। আসেফা বরাবর যে ভবনটিতে যাওয়া-আসা করতো, সেখানে-ই নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। তৎক্ষণাৎ আলী বিন সুফিয়ানকে সংবাদ দেয়ার জন্য ছুটে যায় ওমর। আজর বসে থাকে সেখানে-ই। আল-বারকের আহত প্রথমা স্ত্রী-ও পড়ে আছেন ঘটনাস্থলে। অন্য কেউ নেই সেখানে। আজর পা টিপে টিপে মহিলার নিকট গিয়ে এসে বসে পড়ে একস্থানে। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন খঞ্জরের আঘাত হানে তার উপর। একে একে তিনটি আঘাত হেনে পালিয়ে যায় লোকটি। আজর চৈতন্য হারিয়ে পড়ে থাকে সেখানে।

সন্ধ্যা নাগাদ অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে আল-বারকের প্রথমা স্ত্রী ও আজরের। প্রাণপণ চেষ্টা করলেন ডাক্তার-কবিরাজগণ। কিন্তু বাঁচিয়ে রাখা গেলো না একজনকেও। আল-বারকের স্ত্রী আলী বিন সুফিয়ানকে বলেছিলেন— 'আমি আমার স্বামীকে কোরবান করতে পারি, কিন্তু জাতি ও দেশের ইজ্জত কোরবান হতে দিতে পারি না।'

অবশেষে দেশ ও জাতির জন্য নিজের জীবনটা কোরবান করে তিনি জান্নাতে চলে গেলেন।

সুলতান আইউবীর কারাগারে বন্দী করে রাখা হলো খাদেমুদ্দীন আল-বারককে। আল-বারক শতভাবে বুঝাবার চেষ্টা করে, এ অপরাধ সে জেনে-শুনে করেনি। সে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে বোকা বনে গিয়েছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে সে মদ ও সুন্দরী নারীর নেশায় পড়ে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অনেক গোপন তথ্য-পরিকল্পনা দুশমনের হাতে তুলে দিয়েছে। সুলতান আইউবী হত্যার শাস্তি ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু মদপান, বিলাসিতা এবং দুশমনকে গোপন তথ্য দেয়ার অপরাধ তিনি মার্জনা করতে পারেন না।

সেদিন আসেফার নিকট থেকে কোন জবানবন্দী নেয়া হলো না। জখম অপেক্ষা পরিণাম-চিন্তায়-ই সে বেশী শঙ্কিত। মেয়েটি সৈনিক নয়-গুপ্তচর। সে শাহজাদীর রূপ ধারণ করে শাহজাদাদের তথ্য নেয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এমন একটি পরিণতি তাকে বরণ করতে হবে, তা ভাবেনি কখনো। মেয়েটির সবচেয়ে বড় ভয়, সে মুসলমানের কয়েদী; আর তার জানামতে মুসলমান মানেই হিংস্র, জংলী, বর্বর। এখন যে তার সব শেষ হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

একটি আশঙ্কা তার এ-ও ছিলো যে, মুসলমানরা তার জখমের চিকিৎসা করাবে না। কক্ষে বসে বসে ভয়-পাওয়া শিশুটির ন্যায় অঝোরে কাঁদছে মেয়েটি। আলী বিন সুফিয়ান তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন, তোমার সঙ্গে আমরা সেই আচরণ-ই করবো, যা আমরা একজন আহত মুসলমান নারীর সঙ্গে করে থাকি। কিন্তু তবু তার ভয় কাটছে না। সে বার বার সুলতান আইউবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করছে। বিষয়টি অবহিত করা হয় সুলতান আইউবীকে।

সুলতান আইউবী মেয়েটির কাছে যান। তার মাথায় হাত রেখে বললেন— 'এ মুহূর্তে আমি তোমাকে নিজের কন্যা মনে করি'।

'আমি শুনেছি, সুলতান আইউবী তরবারীর নয়– হৃদয়ের রাজা। আপনি এতো-ই শক্তিধর বাদশাহ যে, আপনাকে পরাজিত করার জন্য খৃষ্টানদের সব রাজা একজোট হয়েছে। সেই খৃষ্টানদের হয়ে আজ আমি আপনার হাতে বন্দী। দুশমনকে কেউ কখনো ক্ষমা করে না। আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন না জানি। তবে আমি ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাই না। আপনার লোকদের বলুন, এক্ষুনি যেনো তারা আমাকে একটু বিষ এনে দেন; আপনি আমাকে শান্তিতে মরতে দিন।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো আসেফা।

'তুমি বললে সারাক্ষণ আমি তোমার কাছে বসে থাকবো। আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করবো না। তুমি আরো সুস্থ হও। ডাক্তার বলেছে, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। আমার যদি তোমাকে নির্যাতন করার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে সে অবস্থায়-ই তোমাকে বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখতাম; তোমার কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিতাম। চীৎকার করে করে তুমি সব অপরাধের কথা স্বীকার করতে, একজন একজন করে সঙ্গীদের নাম-ঠিকানা বলে দিতে। কিন্তু কোন নারীর সঙ্গে আমরা এমন আচরণ করি না। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।' বললেন সুলতান আইউবী।

'সুস্থ হয়ে গেলে আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন?' জিজ্ঞেস করে আসেফা।

'তুমি যেসবের আশঙ্কা করছো, তার কিছু-ই ঘটবে না। তুমি একটি যুবতী-রূপসী –এখানকার কেউ এ দৃষ্টিতে তোমার প্রতি তাকাবে না। এমন অমূলক আশঙ্কা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। মুসলমান নারীর অসম্মান করতে জানে না। তোমার সঙ্গে আমরা সেই আচরণ-ই করবো, যা ইসলামী বিধানে লেখা আছে।' বললেন সুলতান আইউবী।

আসেফা যে ভবনে যাওয়া-আসা করতো, আহত হওয়ার পর যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, সে ঘরে তল্লাশী নেয়া হলো। ভবনটির কোন মালিক নেই। গুপ্তচরদের আখড়া এটি। ভিতরেই ঘোড়ার আস্তাবল। অনুসন্ধান করে ভেতরে পাঁচজন লোক পাওয়া গেলো। তাদের গ্রেফতার করা হলো। এই পাঁচজন এবং ধাওয়া করে যে চারজনকে ধরে আনা হয়েছিলো, জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তাদেরকেও। কিন্তু তারা অপরাধের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলো। অবশেষে তাদেরকে এমন একটি পাতাল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে গেলে পাথরেরও জবান খুলে যায়। বৃদ্ধ স্বীকার করলো, মেয়েটিকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে সে আল-বারককে ঘায়েল করেছিলো। নাটকটি আনুপূর্বিক বিবৃত করলো বুড়ো। অন্যরাও ফাঁস করে দেয় অনেক তথ্য। সেই ভবনটির রহস্যও উন্মোচিত হয়ে যায়, যাকে শহরের মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। অনেকগুলো সুন্দরী মেয়েও রাখা ছিলো সে ঘরে, যাদেরকে তারা দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো। এক. গুপ্তচরবৃত্তির জন্য, দুই. শাসক শ্রেণীর উচ্চ পরিবারের মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য। গুপ্তচর ও সন্ত্রাসীদের আখড়া সে ভবনটি।

গ্রেফতারকৃত খৃষ্টান গুপ্তচররা আরো জানায়, সুলতান আইউবীর বাহিনীর মধ্যে তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরও ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা সৈন্যদের মধ্যে জুয়াবাজীর অভ্যাস ছড়িয়ে দিয়েছে। এই জুয়া খেলার জন্য এখন একে অপরের অর্থ-সম্পদ চুরি করা শুরু করেছে আইউবীর সৈন্যরা। শহরে তারা ছড়িয়ে দিয়েছে পাঁচ শ'রও অধিক বেশ্যা নারী। তারা ফাঁদে ফেলে ফেলে মুসলিম যুব সমাজকে বিলাসিতা ও বিপথগামীতার অন্ধকার পথে নিয়ে যাচ্ছে। চালু করা হয়েছে গোপন জুয়ার আসর।

গুপ্তচররা আরো জানায়, তারা-ই অপসারিত সুদানীদেরকে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে চলেছে। তাদের দেয়া সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, সুলতান আইউবী সরকারের উচ্চপদস্থ ছয়জন অফিসার তলে তলে আইউবীর বিরুদ্ধে কাজ করছে।

আসেফা খৃষ্টান মেয়ে। প্রাপ্ত তথ্যমতে তার নাম ফেলিমঙ্গো। বাড়ি গ্রীস। তের বছর বয়স থেকে তাকে এ কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাকে মিসরের ভাষাও শেখানো হয়েছে। মুসলমানদের ঈমান-আমান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চরিত্র ধ্বংস করার জন্য খৃষ্টানরা তার মতো এমন আরো কয়েক হাজার রূপসী মেয়েকে ট্রেনিং দিয়েছে। এখন তারা সুলতান আইউবীর মিসরে কর্তব্য পালন করছে।

মেয়েটিও কোন কথা গোপন রাখেনি। পনের দিনের মাথায় তার জখম শুকিয়ে গেছে। তাকে যখন বলা হলো, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে, তখন সে বললো— 'আমি আনন্দের সাথে এই শাস্তি বরণ করে নিচ্ছি। আমি ক্রুশের মিশন সম্পন্ন করেছি।'

এক সময়ে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হয় মেয়েটিকে।

ফেলিমঙ্গোর সঙ্গীদের প্রয়োজন রয়ে গেছে এখনো। তাদের চিহ্নিত করা আরো কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলো। তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিলো কয়েকজন। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো তাদের প্রত্যেককে। একশত বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হলো আল-বারককে। কিন্তু এ শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মরে গেলো সে-ও। তার সন্তানদেরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বে নিয়ে এলেন সুলতান আইউবী। সরকারী খরচে চাকরানী ও গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে দেয়া হলো পিতৃ-মাতৃহারা এই ছেলে-মেয়েগুলোর জন্য। আমরা তাদেরকে ঈমান-বিক্রেতা আল-বারকের সন্তান বলবো না— বলবো, এরা এক বীরাঙ্গনা শহীদ জননীর সন্তান।

# অপহরণ

১১৭১ সালের জুন মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী নিজ কক্ষে উপবিষ্ট। অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে খলীফা আল-আজেদের দূত। সালাম দিয়ে বলে, খলীফা আপনাকে স্মরণ করেছেন। বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠে সুলতান আইউবীর চেহারায়। ভ্রু-কুঞ্চিত করে দূতকে বললেন— 'খলীফাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, জরুরী কোন কাজ থাকলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান; অন্যথায় নয়। এ মুহূর্তে আমার এতটুকু অবসর নেই। তাঁকে আরো বলবে, আমার সামনে যে কাজ পড়ে আছে, তা হুজুরের দরবারে হাজেরী দেয়া অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।'

দূত ফিরে যায়। মাথা নুইয়ে কক্ষে পায়চারী করতে শুরু করেন সুলতান আইউবী।

ফাতেমী খেলাফতের যুগ। আল-আজেদ মিসরে এ খেলাফতের খলীফা। সে যুগের খলীফারা হতেন রাজা। জুমার খুতবায় আল্লাহ ও রাসূলের নামের পরে খলীফার নামও উচ্চারণ করতে হতো। বিলাসিতা ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ ছিলো না। নুরুদ্দীন জঙ্গী আর সুলতান আইউবী যদি না থাকতেন, কিংবা তাঁরাও যদি অপরাপর আমীর-উজীরদের ন্যায় আয়েশী ও ঈমান-বিক্রেতা হতেন, তাহলে সে যুগের খলীফারা ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিক্রি করে খেয়ে-ই ফেলেছিলেন।

আল-আজেদও তেমনি এক খলীফা। মিসরের গভর্নর হয়ে আগমন করার পর তিনি সুলতান আইউবীকে প্রথম প্রথম বেশ ক'বার দরবারে ডেকে নিয়েছিলেন। সুলতান আইউবী বুঝে ফেলেছিলেন, খলীফা তাকে অযথা বারবার তলব করার উদ্দেশ্য, তাকে এ কথা বুঝানো যে, মিসরের সম্রাট, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আইউবী নয়– তিনি।

খলীফা সুলতান আইউবীকে বেশ শ্রদ্ধা করতেন। তাকে ডেকে নিয়ে নিজের কাছে বসাতেন। কিন্তু তার ভাবগতিক ছিলো রাজকীয়। কথা বলার ভঙ্গি ছিলো তাঁর শাসক-সুলভ। সুলতান আইউবীকে তিনি যতবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন,

ডেকে পাঠিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অকারণে এবং অনর্থক খোশগল্প করে কোন কাজ ছাড়াই বিদায় দিয়েছেন। এ কারণে রোম উপসাগরে ক্রুসেডারদের পরাজিত করে এবং সুদানী সৈন্যদের বিদ্রোহ দমন করে সুলতান আইউবী খলীফাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেন।

খলীফার মহলের জাঁকজমক আগুন ধরিয়ে রেখেছিলো সুলতানের বুকে। সোনার তৈরি পাত্রে পানাহার করেন তিনি। মদের পিপা-পেয়ালা তাঁর হীরা-খচিত। সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ তাঁর হেরেম। আরবী, মিসরী, মারাকেশী, সুদানী ও তুর্কী ছাড়াও ইহুদী-খৃষ্টান মেয়েও আছে তাঁর রংমহলে। এ সেই জাতির খলীফা, যে জাতির দায়িত্ব ছিলো বিশ্বময় আল্লাহ'র বাণী প্রচার করা, যে জাতি বিশ্ব কুফরী শক্তির ভয়াবহ সামরিক প্রতিরোধের মুখোমুখি।

খলীফার আরো কয়েকটি বিষয় শূলের ন্যায় বিদ্ধ করছিলো সুলতানকে। প্রথমত খলীফার ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ছিলো সুদানী, হাবশী ও কাবায়েলী। তাদের আনুগত্য ছিলো সংশয়পূর্ণ। দ্বিতীয়ত বিদ্রোহী ও ক্ষমতাচ্যুত সুদানী ফৌজের কমাণ্ডার ও নায়েব সালার ছিলো দরবারে খেলাফতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি– খলীফার ডান হাত।

সালাহুদ্দীন আইউবীর পরামর্শে আলী বিন সুফিয়ান চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের বেশে খলীফার মহলে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেন। হেরেমের দু'টি মেয়েকেও হাত করে তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাদের রিপোর্ট মোতাবেক খলীফা ছিলেন সুদানী কমাণ্ডারদের দ্বারা প্রভাবিত।

খলীফা ষাট-পয়ষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ। তবুও সুন্দরী মেয়েদের নাচ-গান ছাড়া রাত কাটে না তার। তার এই চারিত্রিক দুর্বলতা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতিপক্ষের মোক্ষম সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগাতো তারা।

১১৭১ সালের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ মাস। খলীফা আল-আজেদের হেরেমে আগমন ঘটে নতুন একটি মেয়ের। অস্বাভাবিক সুন্দরী এক তরুণী। আরবী পোশাক পরিহিত জনাচারেক লোক এসে উপহার হিসেবে মেয়েটিকে খলীফার হাতে তুলে দিয়ে যায়। দিয়ে যায় আরো মূল্যবান বেশ কিছু উপঢৌকনও।

মেয়েটির নাম উম্মে আরারাহ। রূপের ফাঁদে ফেলে অল্প ক'দিনে-ই খলীফাকে বশ করে ফেলে নবাগতা এই মেয়েটি। মহলের মেয়ে গুপ্তচর মারফত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন আলী বিন সুফিয়ান।

কসরে খেলাফতের এই কাণ্ড-কীর্তি সবই সুলতান আইউবীর জানা। কিন্তু খলীফার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার শক্তি তাঁর এখনো হয়নি। পূর্বেকার গভর্নর ও আমীরগণ চলতেন খলীফার সামনে মাথা নত করে। তাদের সেই চাটুকারিতার ফলে মিসর আজ বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ। তাদের আমলে খেলাফত ছিলো বটে, তবে ইসলামের পতাকা ছিলো অবনমিত। সেনাবাহিনী ছিলো ইসলামী সাম্রাজ্যের। কিন্তু সুদানী সেনাপতি রাজ্য শাসনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন নিজের হাতে। তার সম্পর্ক ছিলো খৃষ্টানদের সঙ্গে। তার-ই সক্রিয় সহযোগিতায় কায়রো ও ইস্কান্দারিয়ায় খৃষ্টানরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিলো। এই বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ছিলো অসংখ্য গুপ্তচর।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী সুদানী সৈন্যদের দমন করেছিলেন ঠিক; কিন্তু বেশ ক'জন সেনাপতি রয়ে গেছে এখনো। যে কোন সময় তারা বিপদ হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কসরে খেলাফতে তাদের বেশ প্রভাব।

খেলাফতের বিলাসপূর্ণ এই গদির উপর এখনই হাত দিতে চাইছেন না সুলতান। কারণ, কিছু লোক এখনো খেলাফতের ব্যাপারে আবেগপ্রবণ। কতিপয় তো খলীফার সক্রিয় সহযোগী। তন্মধ্যে চাটুকারদের সংখ্যাই অধিক। এই চাটুকারদের মধ্যে উচ্চপদস্থ এমন কর্মকর্তাও আছেন, যাদের স্বপ্ন ছিলো মিসরের গভর্ণর হওয়া। কিন্তু সেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত এখন সুলতান আইউবী।

খৃষ্টান গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেশ। গাদ্দারদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিলে খৃষ্টানদের পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল। তাই সুলতান আইউবী খেলাফতের মদদপুষ্ট শাসকবর্গকে এখন-ই শত্রুতে পরিণত করতে চাইছেন না।

কিন্তু ১১৭১ সালের জুনের একদিন খলীফা তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি যেতে পারবেন না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। সুলতান কক্ষে পায়চারী করছেন। দারোয়ানকে ডেকে বললেন— 'আলী বিন সুফিয়ান, বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ, ঈসা এলাহকারী ফকীহ ও আন্-নাসেরকে এক্ষুনি আমার কাছে আসতে বলো।'

❖ ❖ ❖

এই ব্যক্তিগণ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর খাস উপদেষ্টা ও বিশ্বস্ত। সুলতান আইউবী তাদের উদ্দেশে বললেন— 'এইমাত্র খলীফার দূত আমাকে

নিতে এসে গেলো। আমি যেতে পারবো না বলে জানিয়ে দিয়েছি। খেলাফতের ব্যাপারে আমি কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাই। এর প্রথম ধাপে আমি জুমার খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিতে চাই। এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।'

'এ পদক্ষেপ নেয়ার সময় এখনো আসেনি। খলীফাকে মানুষ এখনো পয়গম্বর মনে করে। এতে জনমত আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

'এখনো মানুষ তাকে পয়গম্বর মনে করে। ক'দিন পর খোদা ভাবতে শুরু করবে। খুতবায় আল্লাহ-রাসূলের নামের পাশে তার নাম উচ্চারণ করে আমরা-ই তো তাকে পয়গম্বর ও খোদার আসনে বসিয়েছি। কি ঈসা ফকীহ! আপনার পরামর্শ বলুন।' বললেন আইউবী।

'আপনার মতের সঙ্গে আমিও একমত। কোন মুসলমান জুমার খুতবায় আল্লাহ-রাসূলের পাশাপাশি অন্য কোন মানুষের নাম সহ্য করতে পারে না। তা-ও আবার এমন মানুষ, যিনি মদ-নারীসহ সব রকম পাপে নিমজ্জিত। শত শত বছর ধরে খলীফাকে পয়গম্বরের মর্যাদা দিয়ে আসা হচ্ছে বলে চিরদিন তা বহাল রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে আমি এমন-ই বুঝি। তবে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এ পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা আমি বলতে পারবো না। বললেন ঈসা এলাহকারী ফকীহ।

'প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত তীব্র। আর হবে আমাদের বিপক্ষে। তথাপি আমার পরামর্শ, হয়তো এই কু-প্রথার অবসান ঘটাতে হবে কিংবা খলীফাকে খাঁটি মুসলমান বানিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত করতে হবে। তবে আমার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি সম্ভব হবে না।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'জনমত সম্পর্কে আমার চেয়ে আর কে ভালো জানবে? জনগণ খলীফা আল-আজেদ নামের সঙ্গে নয়- সালাহুদ্দীন আইউবী নামের সাথে পরিচিত। আমার গোয়েন্দা বিভাগের নির্ভরযোগ্য রিপোর্টে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনার দু' বছরের শাসনামলে জনগণ এমন বহু সমস্যার সমাধান পেয়েছে, যার কল্পনাও তারা কখনো করেনি। দেশে উন্নত কোন হাসপাতাল ছিলো না। চিকিৎসার অভাবে সাধারণ রোগেও মানুষ মারা যেতো। এখন উন্নতমানের সরকারী হাসপাতাল আছে। স্থানে স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। আগে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক-ছিনতাইয়ের কারণে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে ব্যবসা করতে পারতো না। এখন তারও অবসান ঘটেছে।

অপরাধ প্রবণতা আগের তুলনায় এখন অনেক কম। মানুষ এখন তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য সরাসরি আপনার শরণাপন্ন হতে পারছে। জানাতে পারছে তাদের আর্জি-ফরিয়াদ। আপনার গভর্নর হয়ে মিসর আগমনের আগে মানুষ সরকারী কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর নামে সন্ত্রস্ত থাকতো সব সময়। আপনি তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন। মানুষ এখন নিজেদেরকে দেশ ও জাতির অংশ ভাবতে শিখেছে। খেলাফত থেকে তারা অবিচার আর নির্দয়তা ছাড়া আর কিছু-ই পায়নি। আপনি তাদেরকে সুবিচার উপহার দিয়েছেন, দিয়েছেন নাগরিক অধিকার। আমি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, জাতি খেলাফতের নয়- ইমারাতের সিদ্ধান্ত-ই মেনে নেবে।'

সুলতান আইউবী বললেন- 'জাতিকে আমি সুবিচার দিতে পেরেছি কি পারিনি, তাদের অধিকার তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারলাম কি পারলাম না, তা আমি বলতে চাই না। আমি শুধু এটুকু জানি যে, দেশের ঈমানদার জনসাধারণের ঘাড়ে কোন বাজে প্রথা চাঁপিয়ে রাখা যায় না। শিরক-কুফরী থেকে আমি জাতিকে মুক্তি দিতে চাই। দ্বীন-ধর্মের অঙ্গ বলে পরিচিত এসব কু-প্রথাকে আমি ছিন্নভিন্ন করে অতীতের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে চাই। ঐ প্রথা যদি বহাল থেকে যায়, তাহলে বিচিত্র কি যে, কাল-পরশু আমিও নিজের নাম খুতবায় শামিল করে নেবো! বাতি থেকে বাতি জ্বলে। শিরকের এই বাতি আমি নিভিয়ে ফেলতে চাচ্ছি। কসরে খেলাফত পাপের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। সুদানী বাহিনী যে রাতে মিসর আক্রমণ করেছিলো, সে রাতেও খলীফা মদ পান করে হেরেমের মেঝে বুঁদ হয়ে পড়ে ছিলো। আমার কৌশল যদি ব্যর্থ হতো, তাহলে সেদিন-ই মিসরের বুক থেকে ইসলামের পতাকা হারিয়ে যেতো। সে রাতে আল্লাহ'র সৈনিকরা যখন ইসলাম ও দেশের জন্য শহীদ হচ্ছিলো, খলীফা তখন মদ খেয়ে পড়ে ছিলো মাতাল হয়ে।

সুদানীদের হামলা প্রতিহত করে আমি যখন তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে গেলাম, তিনি তখন মাতাল ষাড়ের ন্যায় ঢুলু ঢুলু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'শাবাশ! শুনে আমি বেশ খুশী হলাম। বিশেষ দূত মারফত আমি তোমার পিতার কাছে এর মোকারকবাদ ও পুরস্কার প্রেরণ করছি।' তখন আমি তাকে বলেছিলাম- 'খলীফাতুল মুসলিমীন! আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। এ কর্তব্য আমি পালন করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে- পিতার মনোরঞ্জনের জন্য নয়।'

খলীফা বললেন— 'সালাহুদ্দীন! বয়সে তুমি এখনো নবীন; কিন্তু কাজ করে দেখালে বিজ্ঞ প্রবীণের মতো!'

খলীফা আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছিলেন, যেন আমি তার গোলাম। তা ছাড়া এই ধর্মহারা লোকটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য এক শ্বেত হস্তিতে পরিণত হয়ে বসেছে।

পকেট থেকে একখানা পত্র বের করে সুলতান সবাইকে দেখালেন এবং বললেন, ছয়-সাত দিন হলো নুরুদ্দীন জঙ্গী আমাকে এ পত্রখানা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন–

'খেলাফত তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। দুই অধীন খলীফার উপর বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রভাব শেষ হয়ে গেছে। আপনি লক্ষ্য রাখবেন, পাছে মিসরের খলীফা স্বাধীন শাসক হয়ে না বসেন। প্রয়োজনে তিনি সুদানী ও ক্রুসেডারদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতেও কুণ্ঠিত হবেন না। আমি ভাবছি, খেলাফত থাকবে শুধু বাগদাদে। খলীফা থাকবেন স্রেফ একজন। 'অধীন খলীফা'র প্রথা বিলুপ্ত করা হবে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে রেখেছে। মিসরের খলীফার রাজত্বকে যদি আপনি তার মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাবো। সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ, মিসরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অনুকূল নয়। মিসরে আরো একটি বিদ্রোহ ঘটতে যাচ্ছে। আপনি সুদানীদের উপর কড়া নজর রাখুন।'

পত্রটি পাঠ করে সুলতান আইউবী বললেন, আমাদের খেলাফত যে সাদা হাতী, তাতে সন্দেহ কি? আপনারা দেখছেন না, খলীফা আল-আজেদ যখন পরিভ্রমণে বের হন, তখন অর্ধেক সৈন্যকে তার নিরাপত্তার নামে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়? খলীফার চলার পথে গালিচা বিছিয়ে দেয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হয়। যুবতী মেয়েদেরকে খলীফার গায়ে ফুলের পাপড়ি ছিটাতে বাধ্য করা হয়।

ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা, সম্প্রসারণ এবং জাতির উন্নয়নে যে অর্থ ব্যয় হতে পারতো, সে অর্থ ব্যয় করছেন তিনি নিতান্ত বিনোদনমূলক পরিভ্রমণে। আমাদের আর সময় নষ্ট করা যাবে না। মিসরী জনগণ, এদেশের খৃষ্টসমাজ এবং অপরাপর সংখ্যালঘুদের কাছে আমাদের প্রমাণ দিতে হবে, ইসলাম রাজ-রাজড়াদের ধর্ম নয়। ইসলাম আরব মরুভূমির রাখাল-কিষাণ ও

উষ্ট্রচালকদের সাচ্চা ধর্ম। ইসলাম মানবজাতিকে মানবতার মর্যাদাদানকারী অনুপম জীবন-ব্যবস্থা।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ বললেন— 'খলীফার বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে গেলে আপনার নামে এই অপবাদ রটানো হতে পারে যে, খলীফাকে অপসারিত করে আপনি তার মসনদ দখল করতে চাচ্ছেন। সত্যের বিরোধিতা চীরদিন হয়েছে এবং হতে থাকবে।'

সুলতান আইউবী বললেন— 'আজ মিথ্যা ও বাতিলের শিকড় এতো শক্ত হওয়ার কারণ, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচারণের ভয়ে মানুষ সত্য বলা ছেড়ে দিয়েছে। সত্যের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে।'

আমাদের শাসকরা জনসাধারণকে অনাহারে রেখে, তাদের উপর জবরদস্তি শাসন চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে গোলামীর শৃংখলে বেঁধে রেখেছেন, যে শৃংখল ভেঙ্গে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন আমাদের রাসূল (সাঃ)। আমাদের রাজা-বাদশাহগণ এতো-ই অধঃপাতে নেমে গেছেন যে, নিজেদের ভোগ-বিলাসের স্বার্থে তারা খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতছেন, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছেন। আর এ সুযোগে খৃষ্টানরা ধীরে ধীরে ইসলামী সাম্রাজ্যকে হাত করে চলেছে। শুনুন শাদ্দাদ! আপনি বলেছেন, জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে, তাই না? সাহস নিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠুন। এসব বিরোধিতাকে ভয় করলে আমাদের চলবে না।'

সুলতান আইউবীর নায়েব সালার আন-নাসের বললেন, বিরুদ্ধাচারণকে আমরা ভয় করি না শ্রদ্ধেয় আমীর! আপনি আমাদেরকে রণাঙ্গনে দেখেছেন। শত্রুর বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়েও আমরা নির্ভীকচিত্তে লড়াই করেছি। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়েও জীবনপণ লড়েছি। সংখ্যায় যখন আমরা নিতান্ত নগণ্য ছিলাম, শত্রু বাহিনীর সয়লাব প্রতিরোধ তখনও করেছি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আপনাকে আপনার-ই বলা একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনি একবার বলেছিলেন, 'যে আক্রমণ বাইরে থেকে আসে, আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারি। কিন্তু আক্রমণ যখন হয় ভেতর থেকে আর আক্রমণকারীরা হয় নিজেদের-ই লোক, তখন আমরা থমকে যাই, কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি, হায়! একি হলো আল্লাহ?' মোহতারাম আমীরে মেসের! দেশের শাসনকর্তা-ই যখন দেশের শত্রু হয়ে যাবে, আপনার তরবারী তখন কোষের ভিতরে-ই ছট্‌ফট্‌ করতে থাকবে।'

সুলতান আইউবী বললেন— 'আপনি ঠিক ই বলেছেন, নাসের! তরবারী আমার খাপের মধ্যে-ই তড়পাচ্ছে! স্বদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে বেরুতে চাইছে না আমার শাণিত অসি। দেশের শাসকবর্গ জনগণের মর্যাদার প্রতীক। শাসকমণ্ডলীকে আমি বরাবরই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কিন্তু ভেবে দেখুন, তারা সেই মর্যাদা রক্ষা করছে কতটুকু? শুধু খলীফা আল-আজেদের কথা-ই বলছি না। আলী বিন সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করুন। তার গোয়েন্দা বিভাগ মসুল, হাল্‌ব, দামেশ্‌ক ও মক্কা-মদীনা থেকে যে রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, তা হলো বিলাসপ্রিয়তার কারণে যে যেখানকার গভর্নর বা শাসক, সে-ই সেখানকার সার্বভৌম ক্ষমতাধর হয়ে বসেছে। সালতানাতে ইসলামিয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। খেলাফত এতো-ই দুর্বল যে, শাসক-গভর্নর এখন ব্যক্তিগত রাজনীতি চর্চার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমি জানি, জাতির এই বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে যদি আমরা একত্রিত করতে যাই, তাহলে তা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আমাদের সামনে সমস্যার পাহাড় এসে দাঁড়াবে। কিন্তু নির্ভয়ে আমি কাজ করতে চাই। আশা করি, আপনারাও সাহসিকতার সঙ্গে আমাকে সহযোগিতা দিয়ে যাবেন। সালতানাতে ইসলামিয়ার এই ধস আমাদের ঠেকাতেই হবে। আপনারা যে যা পরামর্শ দিয়েছেন, আমি তার মূল্যায়ন করবো। তবে এখন থেকে আমি খলীফার ডাকে তখন-ই সাড়া দেবো, যখন জরুরী কোন কাজ থাকবে। কি কাজে ডেকে পাঠালেন, খলীফাকে আগে-ই আমাকে তা অবহিত করতে হবে। অন্যথায় তাঁর ডাকে একটি মুহূর্তও আমি নষ্ট করতে চাই না। আর আপাতত আমি জুমার খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিচ্ছি।'

উপস্থিত সকলে সুলতান আইউবীর এ সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং তার বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দেন।

❖ ❖ ❖

খলীফা আল-আজেদ তার খাস কামরায় উপবিষ্ট। দূত ফিরে এসে জানায়, সুলতান আইউবী বলেছেন, কোন জরুরী কাজ থাকলে তিনি আসতে পারবেন। অন্যথায় তিনি বেজায় ব্যস্ত।

শুনে খলীফা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। দূতকে বললেন, রজবকে আসতে বলো।

রজব খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর কমাণ্ডার। নায়েব সালারের সমান তার মর্যাদা। এক সময় ছিলো মিসরের সেনাবাহিনীর অফিসার। খলীফার বডিগার্ড-এর কমাণ্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর সে কসরে খেলাফত ও খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীতে দেখে দেখে সুদানী হাবশীদের নিয়োগ দান করে। রজব আইউবী বিরোধী এবং খলীফার চাটুকারদের অন্যতম।

খলীফার খাস কামরায় উম্মে আরারাও উপস্থিত। দূতের রিপোর্ট শুনে সে বলে ওঠলো, সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার একজন নওকর বৈ নয়। অথচ আপনি তাকে মাথায় তুলে রেখেছেন। লোকটাকে আপনি বরখাস্ত করছেন না কেন?

'কারণ, তার ফল ভাল হবে না। সেনাবাহিনীর কমাণ্ড তার হাতে। ইচ্ছে করলে এ বাহিনীকে সে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।' কম্পিত কণ্ঠে বললেন খলীফা।

ইত্যবসরে এসে উপস্থিত হয় রজব। মাথা ঝুঁকিয়ে খলীফাকে সালাম করে। রাগে কাঁপছেন খলীফা। ক্রুদ্ধ ও কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমি পূর্ব থেকেই জানতাম, কমবখ্‌ত একটা অহংকারী ও অবাধ্য লোক। সালাহুদ্দীন আইউবীর কথা বলছি ......। দূত মারফত লোকটাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে এই বলে আমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো যে, কোন জরুরী কাজ থাকলে আসব; অন্যথায় আপনার আহ্বান আমার নিকট অর্থহীন। কারণ, আমার সামনে জরুরী কাজ পড়ে আছে।

রাগের মাথায় বলতে বলতে হেঁচকি উঠে যায় খলীফার। তারপর প্রবল বেগে কাশি। দু' হাতে বুক চেপে ধরেন তিনি। চেহারার রং যেন হলুদ হয়ে গেছে তাঁর। এমনি অবস্থায় তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন— 'বদমাশ্‌টা এতটুকুও বুঝলো না যে, আমি একে তো বৃদ্ধ, তার উপর হৃদরোগের রুগী; অপ্রীতিকর সংবাদ আমাকে ক্ষতি করতে পারে। আমি এখানে শরীর-স্বাস্থ্যের চিন্তায় অস্থির আর ও কিনা দেখাচ্ছে তার কাজের গরজ!'

'তাকে আপনি কেন ডেকেছিলেন? আমাকে আদেশ করুন।' বললো রজব।

ডেকেছিলাম তাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে, তার মাথার উপর একজন শাসকও আছেন। তুমি-ই তো বোধ হয় আমাকে বলেছিলে, সালাহুদ্দীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে যাচ্ছে। আমি বার বার তাকে এখানে ডেকে আনতে চাই, তাকে আদেশ করতে চাই, যেন সে আমার অনুগত থাকে। ডেকে পাঠাতে হলে জরুরী কোন কাজ থাকতে হবে, এমন তো কথা নেই!' বুকের উপর হাত রেখে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন খলীফা।

উম্মে আরারাহ খলীফার ঠোঁটের সঙ্গে মদের পেয়ালা ধরে বললো— 'আপনাকে শতবার বলেছি, মাথায় রাগ তুলবেন না। কতবার বলেছি, গোস্বা আপনার জন্য ক্ষতিকর!'

মদের পেয়ালা শূন্য হয়ে গেলে মেয়েটি একটি সোনার কৌটা থেকে এক চিমটি তামাকচূর্ণ নিয়ে খলীফার মুখে দেয় এবং পানি পান করিয়ে দেয়। খলীফা মেয়েটির বিক্ষিপ্ত রেশমী চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বললেন— 'তুমি না হলে আমার উপায় কি হতো, বলো তো? সকলের দৃষ্টি এখন আমার সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি। আমার ব্যক্তিসত্ত্বার উপর কারো এক বিন্দু নজর নেই। আমার একজন স্ত্রীর পর্যন্ত আমার প্রতি এতটুকু আন্তরিকতা নেই। এ মুহূর্তে তুমি আমার একমাত্র ভরসা। তুমি না হলে আমার উপায় ছিলো না।' খলীফা উম্মে আরারাহকে টেনে কাছে এনে গা ঘেঁষে বসিয়ে তার সরু কটি বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরেন।

'খলীফাতুল মুসলিমীন! আপনি বড় কোমল-হৃদয় ও মহৎ মানুষ। সে কারণেই সালাহুদ্দীন আইউবী এমন গোস্তাখী করতে পারলো। আপনি ভুলে গেছেন, সালাহুদ্দীন আরব বংশোদ্ভুত লোক নয়, আপনার বংশের লোক নয়। সে কুর্দী। আমি ভেবে অবাক্ হই, এতো বড় স্পর্ধা তাকে কে দিলো! তার গুণ তো শুধু এটুকুই যে, লোকটা একজন দক্ষ সৈনিক; রণাঙ্গনের শাহ্সাওয়ার। লড়তেও জানে, লড়াতেও জানে। কিন্তু এই গুণ এতো গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মিসরের গভর্নরী তার হাতে তুলে দিতে হবে! সুদানের এতো বিশাল, এতো সুদক্ষ বাহিনীটিকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিলো, যেভাবে শিশুরা তাদের হাতের খেলনা ভেঙ্গে নষ্ট করে দেয়। মহামান্য খলীফা! আপনি একটু চিন্তা করুন, এখানে যখন সুদানী সেনারা ছিলো, নাজি এবং ঈদরৌসের ন্যায় সালারগণ ছিলো, তখন মানুষ আপনার কুকুরের সামনেও মাথা নত করতো। সুদানী বাহিনীর সালার আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আপনার দ্বারে সারাক্ষণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। আর এখন? এখন ডেকে পাঠালে একজন অধীন পর্যন্ত আপনার আহ্বান মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করে।' বললো রজব।

'রজব! সব দোষ তোমার।' হঠাৎ গর্জে উঠে বললেন খলীফা।

অকস্মাৎ পাংশু হয়ে যায় রজবের মুখ। ভয়ার্ত বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকে খলীফার প্রতি। খলীফার বন্ধন ছাড়িয়ে চকিতে সরে পড়ে উম্মে আরারাহ। খলীফা পুনরায় তাকে কাছে টেনে পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চিবুক টিপে সস্নেহে বলেন— 'কী, ভয় পেয়েছো বুঝি? আমি রজবকে বলতে

চাচ্ছি, আজ দু' বছর পর সে আমার কানে দিচ্ছে, আমার পুরনো বাহিনী ও তার সালার ভালো ছিলো; সালাহুদ্দীনের তৈরি বাহিনী খেলাফতের পক্ষে কল্যাণকর নয়! কেন রজব! একথা কি তুমি আগেও জানতে? জানলে বললে না কেন? আজ যখন মিসরের গভর্নর তার খুঁটি শক্ত করে ফেলেছে, এখন কিনা তুমি আমাকে বলছো, সে খেলাফতের অবাধ্য!'

'বিষয়টা আমি পূর্ব থকে-ই জানতাম। কিন্তু হুজুরের তিরস্কারের ভয়ে কখনো বলিনি। সুলতান আইউবীকে নির্বাচন করেছে বাগদাদের খেলাফত। আমি ভেবেছিলাম, কাজটা আপনার পরামর্শেই হয়ে থাকবে। খেলাফতের মনোনয়নের বিরুদ্ধে মুখ খোলার দুঃসাহস আমি দেখাতে পারি না। আজ আমীরে মেসেরের গোস্তাখী আর আপনার মনোঃকষ্ট আমাকে মুখ খুলতে বাধ্য করেছে। এর আগেও একাধিকবার আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে হুজুরের সঙ্গে গোস্তাখী করতে দেখেছি। বিপদ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি।' বললো রজব।

খলীফার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ উম্মে আরারাহ খলীফার হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে শিশুর ন্যায় খেলছে। এবার দু' হাতে খলীফার চিবুক স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করে— 'মনটা এবার ঠিক হয়েছে?'

খলীফা তার চিবুক টেনে দিয়ে পুলকভরা কণ্ঠে বললেন— 'ঔষধ-পথ্যে ততোটা কাজ হয় না, যতটুকু কাজ হয় তোমার ভালোবাসায়। আল্লাহ তোমাকে যে রূপ দিয়েছেন, তা-ই আমার সব রোগের মহৌষধ।' খলীফা উম্মে আরারা'র মাথা নিজের বুকের উপর রেখে রজবকে বললেন— 'কিয়ামতের দিন যখন আমাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে, তখন আমি আল্লাহকে বলবো, আমি হুর চাই না– আমার উম্মে আরারাকে এনে দাও।'

'উম্মে আরারাহ শুধু রূপসী-ই নয়– বড় বিচক্ষণও বটে। হুজুরের হেরেম ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিলো। উম্মে আরারাহ এসে সব কুচক্রীর মুখে ঠুলি পরিয়েছে। এখন আপনার কসরে খেলাফতে আপনার স্বার্থ বিরোধী কোন আচরণ করার সাধ্য কারও নেই।' বললো রজব।

উম্মে আরারা'র প্রেম-পরশে নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন খলীফা। নিশ্চল মূর্তির মতো উদাস বসে আছেন তিনি। রজবের এইসব কথার একটি শব্দও যেন কানে গেলো না তাঁর। তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে উম্মে আরারাহ। বলে— 'রজব সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রসঙ্গে কথা বলছিলো। আপনি মনোযোগ সহকারে তার বক্তব্য শুনুন এবং আইউবীকে বাগে আনার চেষ্টা করুন।'

সম্বিৎ ফিরে পান খলীফা। বলেন— 'এ্যা, কি যেন বলছিলে রজব।'

'বলছিলাম, আমি এ কারণে এতদিন মুখ বন্ধ রেখেছি যে, আমীরে মেসেরের বিরুদ্ধে কথা বললে আপনি তা মেনে নেবেন না। আর যা হোক, সালাহুদ্দীন আইউবী একজন দক্ষ সেনানায়ক তো বটে!' বললো রজব।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর এই একটি গুণই আমার নিকট পছন্দনীয় যে, যুদ্ধের ময়দানে সে ইসলামের পতাকাকে পদানত হতে দেয় না। তার মত সেনানায়কদের-ই আমার বড় প্রয়োজন, যারা রণাঙ্গনে খেলাফতে ইসলামিয়ার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে।' বললেন খলীফা।

'গোস্তাখী মাফ করবেন খলীফাতুল মুসলিমীন! সালাহুদ্দীন আইউবী খেলাফতে ইসলামিয়ার মর্যাদার জন্য লড়াই করে না, লড়াই করে নিজের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। আপনি ফৌজের সালার থেকে নিয়ে একজন সাধারণ সিপাহীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন; সালাহুদ্দীন আইউবী তাদের এই দীক্ষা প্রদান করেছে যে, লড়াই করে এমন একটি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে, যার কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, সে এমন একটি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে, যার সম্রাট হবে সে নিজে। তার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন নুরুদ্দীন জঙ্গী। আইউবীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি দু' হাজার অশ্বারোহী এবং সমসংখ্যক পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করেছেন। আপনি-ই বলুন, তিনি কি এ সৈন্য মিসরের খলীফার অনুমতি নিয়ে প্রেরণ করেছেন? খেলাফতের কোন দূত কি আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছিলো যে, মিসরে অতিরিক্ত সৈন্যের প্রয়োজন আছে কি-না? যা কিছু হয়েছে, খেলাফতকে উপেক্ষা করেই হয়েছে।' বললো রজব।

'তুমি ঠিকই বলছো রজব! এ ব্যাপারে আমাকে কিছু-ই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আর ওদিক থেকে আসা বাহিনীটিকে তো ফেরতও পাঠান হয়নি!' বললেন খলীফা।

'ফেরত এ জন্যে দেয়া হয়নি যে, তাদের পাঠানোই হয়েছিলো মিসরে আইউবীর হাতকে শক্ত করার জন্য। মিসরের পুরাতন বাহিনীকে কিষাণ আর ভিখারীতে পরিণত করার জন্য নুরুদ্দীন জঙ্গী এ বাহিনী প্রেরণ করেছেন। নাজি, ঈদরৌস, ককেশ, আবদে ইয়ায্দান, আবু আজর এবং এদের ন্যায় আরো আটজন সালার এখন কোথায়? হুজুর হয়তো কখনো ভেবে দেখেননি, এদের প্রত্যেককে সালাহুদ্দীন আইউবী গুপ্তভাবে খুন করিয়েছে। তাদের একটি মাত্র অপরাধ ছিলো, তারা ছিলেন রণনায়ক হিসেবে আইউবী অপেক্ষা যোগ্য।

আইউবী প্রচার করেছেন, গাদ্দারী ও বিদ্রোহের অপরাধে খলীফা তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।' বললো রজব।

'মিথ্যে– নির্জলা মিথ্যে। সালাহুদ্দীন আমাকে বলেছিলো ঠিক যে, এরা বিশ্বাসঘাতক। আমি তাকে বলেছিলাম, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করো, আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করো।' ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন খলীফা।

'আর মোকদ্দমা না চালিয়ে তিনি নিজেই সেই রায় প্রদান করেন, খেলাফতের মোহর ছাড়া যার কোন কার্যকারিতা নেই। ঐ হতভাগা সালারদের অপরাধ ছিলো, তারা খৃষ্টান সম্রাটদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো খৃষ্টানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেশ ও দশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। বললে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, খৃষ্টানরা আমাদেরকে শত্রু মনে করে না। নুরুদ্দীন জঙ্গী আর শেরকোহ'র আক্রমণ-আশঙ্কায়-ই কেবল তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে আছে। এখন শেরকোহ নেই ঠিক, কিন্তু তার স্থান দখল করেছে সালাহুদ্দীন আইউবী। এ লোকটি মূলত শেরকোহ'র-ই হাতে গড়া। শেরকোহ তার সারাটা জীবন খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করে, ইসলামের দুশমন সৃষ্টি এবং দুশমনের সংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি করেছে। সালাহুদ্দীনের স্থলে অন্য কেউ যদি মিসরের গভর্নর হতো, তাহলে খৃষ্টান সম্রাটগণ আজ আপনার দরবারে বন্ধুরূপে আগমন করতেন। হত্যা-লুণ্ঠন হতো না, আমাদেরকে এতগুলো প্রবীণ ও সুদক্ষ সেনানায়ক হারাতে হতো না।' বললো রজব।

'কিন্তু রজব! খৃষ্টানরা যে রোম উপসাগর থেকে আক্রমণ করলো?' বললেন খলীফা।

'এর জন্যেও আইউবী-ই দায়ী। তিনি-ই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন, যা প্রতিহত করার জন্যে খৃষ্টানরা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। সমস্যা যেহেতু তার-ই সৃষ্টি, তাই আক্রমণ যে হবে, তা পূর্ব থেকে-ই তার জানা ছিলো। সেজন্য তিনি আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। অন্যথায় তিনি কি করে জানলেন যে, রোম উপসাগর থেকে খৃষ্টানরা আক্রমণ করবে? তিনি তো অন্তর্যামী নন! এটি ছিলো তার সাজানো নাটক, যে খেলায় এতীম হলো হাজার হাজার শিশু, বিধবা হলো অসংখ্য নারী। আর তার এ কাজে আমার উপস্থিতিতে আপনি তাকে বাহ্‌বা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি সুদানী ফৌজকে– যারা ছিলো আপনার একান্ত অনুগত– সামরিক মহড়ার নাম করে রাতের বেলা বাইরে নিয়ে যান এবং অন্ধকারে তাদের উপর তার নতুন বাহিনীকে লেলিয়ে দেন। পরে প্রচার করেন

যে, নাজির ফৌজ বিদ্রোহ করেছিলো; তাই তাদের এই পরিণতি বরণ করতে হয়। আপনি এতো সরল-সহজ মানুষ যে, আইউবীর এই চাল আর প্রতারণা বুঝে উঠতে পারলেন না!' বললো রজব।

উম্মে আরারাহ খলীফার বুকে মাথা রেখে এমন কিছু অশ্লীল আচরণ করে যে, খলীফার তীব্র মদের নেশা জেগে ওঠে। খলীফা এখন মেয়েটির হাতের খেলনা। রজবের কোন কথা-ই যেন শুনতে পাচ্ছেন না তিনি। রূপসী কন্যা উম্মে আরারাকে নিয়েই ঘুরপাক খাচ্ছে খলীফার সব ভাবনা।

এই ফাঁকে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি নিতান্ত অমূলক আরেকটি আঘাত হানে রজব। বলে— 'আইউবী আরো একটি প্রতারণামূলক আচরণ শুরু করেছেন। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ধরে এনে তিনি তাদের উপভোগ করেন। কয়েকদিন আমোদ-ফুর্তি করে এই বলে তাদের খুন করান যে, এরা খৃষ্টানদের গুপ্তচর। দেশবাসীর মনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য তিনি সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে রেখেছেন, খৃষ্টানরা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাদের মেয়েদেরকে মিসর প্রেরণ করেছে। খৃষ্টানরা কুলটা নারীদের লেলিয়ে দিয়ে এই জাতির চরিত্র নষ্ট করছে। আমি তো এদেশের-ই নাগরিক। দেশে কী ঘটছে সবই আমার জানা। দেশের পতিতালয়গুলোতে যারা বেশ্যাবৃত্তি করছে, তারা মিসর ও সুদানী নারী। দু' চারজন খৃষ্টান থাকলেও তারা গুপ্তচর নয়, এটা তাদের পেশা।'

'হেরেমের তিন-চারটি মেয়েও আমাকে জানিয়েছে, সালাহুদ্দীন আইউবী ডেকে নিয়ে তাদের সম্ভ্রমহানি করেছে।' বললো উম্মে আরারাহ।

শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন খলীফা। বললেন— 'আমার হেরেমের মেয়ে? তুমি এতোদিন আমাকে বলোনি কেন?'

'বলিনি তার কারণ, এই অসুস্থ অবস্থায় আপনি সে দুঃসংবাদ সহ্য করতে পারতেন না। এখন আমার অলক্ষ্যে কথাটা মুখ থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে গেলো। হেরেমে আমি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি যে, এখন আর কোন মেয়ে কারো আহ্বানে মনে চাইলে-ই বাইরে যেতে পারবে না।' জবাব দেয় উম্মে আরারাহ।

'এক্ষুনি ডেকে এনে ওকে আমি বেত্রাঘাত করবো। আমি এর প্রতিশোধ নেবো!' বললেন খলীফা।

'প্রতিশোধ নিতে হবে অন্যভাবে। বর্তমানে দেশের জনসাধারণ আইউবীর পক্ষে। এভাবে সরাসরি প্রতিশোধ নিতে গেলে মানুষ আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠবে।' বললো রজব।

'তবে কি আমাকে এই অপমান চোখ বুজে সহ্য করতে হবে?' বললেন খলীফা।

'না। আপনার অনুমতি ও সহযোগিতা পেলে আমি সালাহুদ্দীন আইউবীকে এমনভাবে গায়েব করে ফেলতে পারি, যেভাবে গুম করেছিলেন তিনি আমাদের প্রবীণ সালারদের।' বললো রজব।

'এ কাজ তুমি কীভাবে করবে?' জিজ্ঞেস করেন খলীফা।'

'এ কাজ আমি হাশীশীদের দ্বারা করাবো। তবে তারা বিপুল অর্থ দাবি করছে।' বললো রজব।

'টাকা যতো প্রয়োজন আমি দেবো। তুমি আয়োজন সম্পন্ন করো।' বললেন খলীফা।

❖ ❖ ❖

দু'দিন পর জুমার নামায। ঈসা এলাহকারী কায়রোর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীবকে বলে দিয়েছেন, যেন তিনি জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ না করেন।

তুরস্কের অধিবাসী এ খতীবের নাম ইতিহাসে উল্লেখিত হয়নি। সাধারণ্যে তিনি 'আমীরুল ওলামা' উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি নিজেও বেশ ক'বার খুতবা থেকে এ বিদআত তুলে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে, সালাহুদ্দীন আইউবী এ খতীবের-ই পরামর্শে খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দেয়ার নির্দেশ জারি করেছিলেন। তবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর কথোপকথনের যে সব দলীল-দস্তাবেজ পাওয়া যায়, তাতে প্রমাণিত হয়, এ সাহসী পদক্ষেপের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি-ই।

শুক্রবার দিন। খতীব আমীরুল ওলামা খুতবা পাঠ করলেন; কিন্তু খলীফার নাম উল্লেখ করলেন না। মসজিদের মধ্যম সারিতে উপবিষ্ট সুলতান আইউবী। খানিক দূরে অপর এক সারিতে বসা আছেন আলী বিন সুফিয়ান। জনগণের প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করার জন্য জনতার মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছেন সুলতান আইউবীর অপরাপর উপদেষ্টামণ্ডলী ও বিশ্বস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। আলী বিন সুফিয়ানের বিপুলসংখ্যক গোয়েন্দা সদস্যও মসজিদে উপস্থিত। খুতবা থেকে খলীফার নাম মুছে ফেলা একটি শক্ত পদক্ষেপ-ই নয়, খেলাফতের আইনে গুরুতর অপরাধও বটে। সুলতান আইউবীর নির্দেশে সে অপরাধ-ই সংঘটিত হলো আজ। খলীফা আল-আজেদ ব্যতীত খেলাফতের বহু কর্মকর্তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করলেন সে অপরাধ কম।

নামায শেষ হলো। মুসল্লীরা যার যার মতো চলে গেলো। উঠে দাঁড়ালেন সুলতান আইউবী। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন খতীবের কাছে। সালাম-মোসাফাহার পর বললেন— 'আল্লাহ আপনার সহায় হোন মহামান্য ইমাম!'

খতীব আমীরুল ওলামা বললেন— 'এ নির্দেশ জারি করে আপনি জান্নাতে নিজের ঠিকানা করে নিলেন।'

মসজিদ থেকে বেরুতে উদ্যত হন আইউবী। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান। আবার খতীবের নিকট গিয়ে বললেন— 'খলীফার পক্ষ থেকে যদি আপনার ডাক আসে, তাহলে সরাসরি তার কাছে না গিয়ে আপনি আমার কাছে চলে আসবেন। আমি আপনাকে খলীফার নিকট নিয়ে যাবো।'

'মোহতারাম আমীরে মেসের! যদি গোস্তাখী মনে না করেন, আমি বলবো– মিথ্যা ও শেরেকের বিরুদ্ধে কাজ করা ও সত্য বলা যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে সে অপরাধের শাস্তি আমি একাই ভোগ করবো। এর জন্য আমি আপনাকে কষ্ট দিতে যাবো না। খলীফা যদি আমাকে তলব করেন, আমি একা-ই গিয়ে তার কাঠগড়ায় হাজির হবো। মূলত আপনার নির্দেশে নয়– আল্লাহর হুকুমে আমি খুতবা থেকে খলীফার নাম বাদ দিয়েছি। আল্লাহ আমার সহায় হোন।' বললেন খতীব।

সন্ধ্যার পর।

আলী বিন সুফিয়ান, বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর নিকট থেকে দিনের রিপোর্ট শুনছেন সালাহুদ্দীন আইউবী। আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে শহরময় গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। নামাযের পর ঘুরে ঘুরে তারা সর্বসাধারণের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে। আলী বিন সুফিয়ান আইউবীকে জানান, এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি যে, কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বলেছে, আজ খুতবায় খলীফার নাম নেয়া হয়নি। জনগণের মুখ থেকে কথা নেয়ার জন্য এক গোয়েন্দা কয়েক স্থানে এমনও বলেছে, জামে মসজিদের খতীব আজ জুমার খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারণ করেননি; কাজটা বোধ হয় তিনি ভাল করলেন না।' প্রত্যুত্তরে অনেকে এমন ভাব প্রকাশ করেছে, যেন খুতবায় আজ খলীফার নাম উচ্চারণ করা হলো কিনা, তা তারা বলতেই পারে না। যেন খলীফার নাম উল্লেখ করা না করা তাদের নিকট তেমন কোন ঘটনা-ই নয়। বেশ ক'জন মানুষ এমনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, 'এতে কি আর আসে যায়! খলীফা আল্লাহ-রাসূল তো আর নন!' এসব রিপোর্টে সুলতান আইউবী আশ্বস্ত হন যে, তাঁকে জনগণের

যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা দেখানো হয়েছিলো, বাস্তবে কোথাও তার প্রতিফলন ঘটেনি।

সে বৈঠকেই সুলতান আইউবী নুরুদ্দীন জঙ্গীর নামে পয়গাম লিখেন। তাতে তিনি লিখেন— 'জুমার খুতবা থেকে আমি খলীফার নাম তুলে দিয়েছি। জনসাধারণের পক্ষ থেকে অনুকূল প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। আপনিও খুতবা থেকে কেন্দ্রীয় খেলাফতের আলোচনা তুলে দিন।'

এ মর্মে দীর্ঘ এক পত্র লিখে সুলতান আইউবী নির্দেশ জারি করেন, আগামীকাল সকাল সকাল দূতকে রওনা করাও। তারপর আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'খলীফার মহলে গুপ্তচরদের আরো সতর্ক থাকতে বলুন। সেখানে সামান্যতম সন্দেহজনক আচরণ দেখা মাত্র যেন সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাদেরকে অবহিত করে।'

❖ ❖ ❖

সুলতান আইউবী রজবকে ভাল করেই জানতেন। তিনি জানতেন, রজব খলীফার আজ্ঞাবহ নায়েব সালার। তাই তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'রজবের পিছনে একজন লোক সর্বক্ষণ ছায়ার মতো লাগিয়ে রাখুন।'

রাতের বেলা। রজব মহলে নেই। সুলতান আইউবীকে হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করতে বাইরে চলে গেছে সে। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র হাশীশীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে রজব।

আমোদে মেতে উঠেছেন খলীফা। প্রতিদিনকার ন্যায় আজও তিনি বহির্জগত সম্পর্কে উদাসীন। উম্মে আরারা'র যাদুময়ী রূপ-দেহে মাতোয়ারা তিনি। জুমার খুতবা থেকে নাম উঠে যাওয়ার সংবাদ এ যাবত কেউ তাকে দেয়নি। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার প্রস্তুতি চলছে, সে আনন্দেই তিনি আত্মহারা।

তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়ানোর জন্য উম্মে আরারাহ অতিরিক্ত মদ পান করায় তাকে। মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডারও খাইয়ে দেয়। বৃদ্ধের জ্বালাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সব সময় এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে উম্মে আরারাহ। বৃদ্ধকে শুইয়ে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় মেয়েটি। হাঁটা দেয় নিজের কক্ষের প্রতি। রাতে চুপিসারে এ কক্ষে-ই তার কাছে আসা-যাওয়া করে রজব।

উম্মে আরারাহ কক্ষে প্রবেশ করছে। তার এক পা কক্ষের ভিতরে, এক পা বাইরে। এমন সময় পিছন থেকে কে একজন একটি কম্বল ছুড়ে মারে তার গায়ে।

মুখ থেকে তার একটি শব্দ বের হতে না হতে-ই দৌড়ে এসে লোকটি আরেকখণ্ড কাপড় দ্বারা বেঁধে ফেলে তার মুখ। মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটা দেয় লোকটি।

তারা ছিলো দু'জন। মহলের আঁকা-বাঁকা গোপন পথ সবই যেন তাদের চেনা। অন্ধকার সিঁড়িতে নেমে পড়ে তারা। উপরে লম্বা রশি বেঁধে রেখেছিলো আগেই। সেই রশি ধরে ধরে ঘোর অন্ধকারে চোরা পথ বেয়ে মেয়েটিকে কাঁধে করে নেমে পড়ে একজন। অপরজন হাঁটছে তার পিছনে। মহল থেকে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় দু'টি লোক।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে চারটি ঘোড়া। ঘোড়াগুলোর নিকটে সতর্ক বসে আছে আরো দু'জন লোক। আঁধার চিরে সঙ্গীদের আসতে দেখে তারা। আরো দেখে, কাঁধে করে কম্বল পেঁচানো কি যেন নিয়ে আসছে একজন।

চারটি ঘোড়ায় চড়ে বসে চার সঙ্গী। একজন মেয়েটিকে কম্বল মোড়ানো অবস্থায়-ই নিজের সামনে বসিয়ে দেয়। একজন বলে— 'ঘোড়াগুলোকে এখনই দ্রুত ছুটানো যাবে না। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে প্রহরীরা সতর্ক হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করে চারটি ঘোড়া। বেরিয়ে যায় শহর থেকে।

❖ ❖ ❖

'এটি সালাহুদ্দীন আইউবীর-ই কাজ।'

'মিসরের গভর্নর ছাড়া এ দুঃসাহস আর কেউ দেখাতে পারে না।'

'তিনি ছাড়া এ-কাজ আর করতে-ই বা পারে কে?'

উম্মে আরারাহ্ অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজমহলে। সকলের মুখে এক-ই কথা, সালাহুদ্দীন আইউবী ছাড়া আর কেউ এ-কাজ করাতে পারে না।

ফিরে এসেছে রজব। মহলের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজ নেয় সে। রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের গালাগাল করছে কমাণ্ডারগণ। স্বয়ং কমাণ্ডারগণ সিপাহীদের ন্যায় থর্ থর্ করে কাঁপছে।

মহলের একটি মেয়ে অপহরণ মামুলী ঘটনা নয়। তা-ও আবার সেই মেয়ে, খলীফা যাকে মহলের হীরক মনে করেন।

মহলের পিছনের গোপন পথে একটি রশি ঝুলছে দেখা গেলো। মাটিতে পায়ের ছাপ, যা একটু দূরে গিয়ে ঘোড়ার খুরের চিহ্নে মিলিয়ে গেছে। এতে

প্রমাণ পাওয়া গেলো, মেয়েটিকে রশি বেয়ে নীচে নামানো হয়েছে। কেউ কেউ এমন সন্দেহও ব্যক্ত করেছে যে, মেয়েটি হয়তো স্বেচ্ছায় কারো সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। খলীফা উড়িয়ে দেন এ সংশয়। বলেন, অসম্ভব, উম্মে আরারাহ স্বেচ্ছায় কারো হাত ধরে উধাও হতে পারে না। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো।'

'এ সালাহুদ্দীন আইউবীর কাজ। কসরে খেলাফতের সকলের মুখে এই একই কথা, আইউবী ছাড়া এ কাজ করার সাহস আর কেউ করতে পারে না।' খলীফার উদ্দেশে বললো রজব।

কথাটা রজব-ই সকলের কানে দিয়েছিলো। উম্মে আরারা'র নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ শোনামাত্র সে মহলময় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের নিকট মেয়েটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলো আর বলেছিলো, 'সুলতান আইউবী-ই এ-কাজ করেছে।' রজবের উস্কানিতে মহলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে সাধারণ কর্মচারীদের পর্যন্ত সকলে এই একই কথা আওড়াতে শুরু করে। আর যখন কথাটা খলীফার কানে দেয়া হলো, তখন তিনি একটুও ভাববার প্রয়োজনবোধ করলেন না, এ অভিযোগ ভিত্তিহীন হতে পারে। তাকে আগেই জানানো হয়েছিলো, সুলতান আইউবী নারী-লোলুপ পুরুষ। তিনি মহলের মেয়েদের নিয়ে নিয়ে নষ্ট করছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে খলীফা দূতকে ডেকে পাঠান। দূত আসলে তাকে তিনি বললেন, 'মিসরের গভর্নরের নিকট যাও। গিয়ে বলো, যেনো গোপনে তিনি মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিয়ে যান। তাহলে আমি এর প্রতিশোধ নেবো না।'

খলীফা আল-আজেদ যখন দূতকে এ পয়গাম প্রদান করছিলেন, ঠিক তখন কায়রো থেকে দশ মাইল দূরে তিনজন উষ্ট্রারোহী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিলো শহর অভিমুখে। এরা মিসরী ফৌজের টহলসেনা। তারা ডিউটি শেষ করে শহরে ফিরছিলো। তাদের সম্মুখে মাটি ও পাথরের বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল। তারা একটি উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করছিলো।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের এক আর্ত-চীৎকার ভেসে আসে তাদের কানে। সাথে পুরুষালী কণ্ঠও শুনতে পায়। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে, কোন এক হতভাগী নারীর উপর নির্যাতন চলছে। দাঁড়িয়ে যায় তারা। উটের পিঠ থেকে নীচে নামে একজন। একজন টিলার উপরে উঠে চীৎকার-ধ্বনির দিক অনুসরণ করে উৎকীর্ণ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে যায়। দেখে, টিলার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে চারটি ঘোড়া। চারজন মানুষও আছে সেখানে। সকলে সুদানী হাবশী। দৌড়ে

পালাবার চেষ্টা করছে অপরূপ এক যুবতী। এক হাবশী ধরে ফেলে তাকে। দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তুলে আনে মেয়েটিকে। সঙ্গীদের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে তার সামনে হাটু গেড়ে বসে পড়ে লোকটি। দু' হাত নিজের বুকে চেপে ধরে বলে— 'তুমি পবিত্র মেয়ে। অযথা নিজেকে কষ্টে ফেলে আমাদের গোনাহগার করো না। অন্যথায় দেবতাদের রোষানল আমাদের পুড়ে ছারখার করে দেবে কিংবা পাথরে পরিণত করবে।'

'আমি মুসলিম! আমি তোমাদের দেবতাদের অভিসম্পাত করি। আমাকে ছেড়ে দাও। অন্যথায় আমি খলীফার কুকুর দিয়ে তোমাদের টুকরো টুকরো করাবো।' চীৎকার করে বললো মেয়েটি।

'তোমার মালিকানা এখন খলীফার হাতে নয়। আকাশের বিজলী, সাপের বিষ আর সিংহের শক্তি যে দেবতার হাতে, তোমার মালিক এখন তিনি। তিনি তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছেন। এখন যে-ই তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশি তাকে-ই ভস্ম করে ফেলবে।' বললো একজন।

হাবশীদের একজন আরেকজনকে বললো— 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, এখানে থেমো না। কিন্তু তোমার কিনা বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন। ওকে বাঁধা অবস্থায় লাগাতার এগিয়ে চললে সন্ধ্যার আগে আগেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারতাম।'

'কেন, ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছো না? তাছাড়া সারাটা রাত গেলো আমরা এক তিল ঘুমুতে পারিনি। আমাদেরও তো একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। যাক, চলো, একে আবার বেঁধে রওনা হই।' বললো দ্বিতীয়জন।

উম্মে আরারাকে ঝাপটে ধরে রাখে একজন। হঠাৎ পিছন দিক থেকে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় তার পিঠে। উম্মে আরারাকে জড়িয়ে ধরা হাত শিথিল হয়ে আসে তার। ঝাপটা দিয়ে বন্ধন-মুক্ত হয়ে পালাতে উদ্ধত হয় মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন ঝাপটে ধরে টেনে ঘোড়ার আড়ালে নিয়ে যায় তাকে। শাঁ করে ছুটে আসে আরেকটি তীর। বিদ্ধ হয় অপর একজনের ঘাড়ে। ছট্‌ফট্‌ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে-ও। উম্মে আরারাকে ঝাপটে ধরে রাখা লোকটি ঘোড়ার বাগ ধরে উম্মে আরারাহ এবং ঘোড়াটিকে নিয়ে নেমে পড়ে নিম্নভূমিতে। চার হাবশীর অপরজনও দৌড়ে নেমে পড়ে নীচে।

উষ্ট্রারোহী সাথীদের যে লোকটি টিলার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছিলো, সে-ই নিক্ষেপ করে তীর দু'টি। সে জানায়, দেবতার কথা শুনে প্রথমে আমি ভয় পেয়ে

গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে যখন শুনলাম, মেয়েটি বলছে, আমি মুসলমান; তোমাদের দেবতাকে আমি অভিসম্পাত করি; তখন আমার ঈমান জেগে উঠে। মেয়েটি যখন খলীফার নাম উল্লেখ করে, তখন আমি বুঝলাম, এ তো হেরেমের মেয়ে। তা ছাড়া মেয়েটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও গঠন-আকৃতিতে পরিষ্কার বুঝা গেলো, এ কোন সাধারণ মেয়ে নয়। নিশ্চয় মেয়েটিকে অপহরণ করা হয়েছে এবং সুদান নিয়ে গিয়ে তাকে বিক্রি করে ফেলা হবে। সান্ত্রীর জানা ছিলো, অল্প ক'দিন পর সুদানী হাবশীদের মেলা বসছে। সুন্দরী মেয়েদের বেচা-কেনা হয় সে মেলায়।

সুলতান আইউবী সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেন তারা নারীর ইজ্জতের হেফাজত করে। একজন নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে প্রয়োজনে এক ডজন মানুষ হত্যা করার অনুমতিও দেয়া ছিলো তাদের। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে সান্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, যে করে হোক মেয়েটিকে উদ্ধার করতেই হবে। দু'টি তীর নিক্ষেপ করে দু' হাবশীকে খুন করে ফেলে সে।

মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যায় দুই হাবশী। সান্ত্রীর তীরের আঘাতে নিহত দু'জনের ঘোড়া দু'টোও নিয়ে যায় তারা। ফেলে যায় শুধু দু'টি লাশ।

সান্ত্রীদের সকলেই উষ্ট্রারোহী। একটি ঘোড়াও নেই তাদের কাছে। উটে চড়ে অশ্বারোহীদের ধাওয়া করা বৃথা। অগত্যা লাশ দু'টো উটের পিঠে তুলে নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা হয় তারা।

অপহৃতা মেয়েটি কে এবং লাশ দু'টো কাদের, তা অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলো সান্ত্রীরা। তাই হেরেমের একটি মেয়েকে কারা অপহরণ করলো, তার প্রমাণের জন্য লাশ দু'টো নিয়ে যাওয়া আবশ্যক মনে করে তারা।

কক্ষে অস্থিরচিত্তে পায়চারী করছেন সুলতান আইউবী। রাগে-ক্ষোভে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন যেন তিনি। তার নায়েব-উপদেষ্টাবৃন্দও কক্ষে উপস্থিত। নতমুখে বসে আছেন সবাই।

সুলতান আইউবী বরাবর-ই সহনশীল মানুষ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে-ই কাজ করেন তিনি। তিনি কখনো আবেগপ্রবণ হন না। রাগের মাথায় কিছু বলেনও না, করেনও না। যত প্রতিকূল পরিস্থিতির-ই শিকার হন না কেন, সর্বাবস্থায় ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা-ই তার অভ্যাস। প্রবল থেকে প্রবলতর রাগ-ও তিনি হজম করে ফেলেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, যে

পরিস্থিতিতে প্রবল প্রতাপশালী যোদ্ধাও অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শত্রুর বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ হয়েও ঠাণ্ডা মাথায় তিনি লড়াই করেছেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, যখন বাহিনীসহ তিনি শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ, সাহস হারিয়ে ফেলেছে তার সৈন্যরা, খাবার নেই, পানি নেই। সৈন্যদের তূনীরে একটি তীরও নেই। তার বাহিনী অপেক্ষা করছে, কখন তিনি আত্মসমর্পণ করে তাদের এ কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন, তাদের জীবন রক্ষা করবেন। কিন্তু সুলতান আইউবী নিজের সাহস অটুট রেখে শুধু লড়াই-ই অব্যাহত রাখেননি, তার সৈন্যদের মধ্যেও নবজীবন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু আজ? আজ তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। রাগে-ক্ষোভে দু' চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে যেনো তাঁর। চেহারায় ক্ষোভ ও যন্ত্রণার ছাপ। ফলে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না কেউ। মাথা নুইয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে নীরবে বসে আছে সকলে।

'এই আজ-ই আমি প্রথমবার আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।' পায়চারী করতে করতে বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'খলীফার এ 'পয়গাম'কে মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলা কি সম্ভব নয়?' সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞেস করলেন নায়েব সালার আন-নাসের।

'আমি সে চেষ্টা-ই করছি। কিন্তু অভিযোগের ধরণটা দেখো। আমি কিনা খলীফার হেরেমের একটি মেয়েকে অপহরণ করিয়েছি। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে অপমান করতে লোকটা কোন পন্থা-ই বাদ রাখলো না। সবশেষে কিনা আমার নামে হেরেমের মেয়ে অপহরণ করানোর অবপাদ! 'পয়গাম'– বরং হুঁশিয়ারী পাঠালেন দূতের মুখে। তা না করে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে সরাসরি কথা বলতেন।' বললেন সুলতান আইউবী।

'তারপরও আপনাকে আমি পরামর্শ দেবো, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন, মনের উত্তেজনা দূর করুন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ।

সুলতান আইউবী বললেন— 'আচ্ছা, সত্যি-ই কি হেরেমের কোন মেয়ে অপহৃতা হয়েছে? আমার তো মনে হচ্ছে, সংবাদটা মিথ্যে। এতক্ষণে হয়তো খলীফা জেনে ফেলেছেন, আমি জুমার খোতবা থেকে তার নাম তুলে দিয়েছি। তার-ই প্রতিশোধ স্বরূপ বোধ হয় তিনি আমার উপর অপবাদ আরোপ করেছেন যে, আমি তাঁর হেরেমের একটি মেয়েকে অপহরণ করিয়েছি।' ঈসা এলাহকারীকে উদ্দেশ করে সুলতান বললেন— 'আজই আপনি মিসরের সব

মসজিদে এই নির্দেশনামা জারি করে দিন, আগামীতে যেন কোন ইমাম জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ না করেন।

'আপনি খলীফার নিকট চলে যান; তার সঙ্গে কথা বলুন। তাকে বলুন, খলীফা জাতির মর্যাদার প্রতীক বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ-নিষেধ এখন অচল। বিশেষত যখন সারাদেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, তখন তো খলীফার আইন মান্য করার জন্য কেউ-ই প্রস্তুত নয়। শত্রুর আশঙ্কা বাইরে থেকে যেমন, ভিতর থেকেও তেমনি। আমি তো আপনাকে এদ্দুর পরামর্শও দেবো যে, আপনি খলীফার রক্ষী বাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে দিন। সুদানী হাবশীদের বাদ দিয়ে মিসরী সৈন্য নিয়োগ করুন এবং খলীফার মহলের বরাদ্দ হ্রাস করুন। এসব পদক্ষেপের পরিণাম আমার জানা আছে। পরিস্থিতির মোকাবেলা আমাদের করতে-ই হবে। তবু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' আন-নাসের বললেন।

'আল্লাহ এ অপমান থেকেও আমাকে রক্ষা করবেন।' বললেন সুলতান।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। আলোচনা বন্ধ করে সকলে তাকায় তার প্রতি। সালাম দিয়ে বলে— 'মরুভূমির টহল বাহিনীর কমাণ্ডার এসেছেন। সঙ্গে তার তিনজন সিপাহী। তিনি দু' জন সুদানীর লাশ নিয়ে এসেছেন।'

দারোয়ানের এই আকস্মিক প্রবেশে বিরক্তি বোধ করে সকলে। কারণ, সুলতান আইউবী তখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন। দারোয়ানের অনুপ্রবেশে ছেদ পড়ে সেই আলোচনায়। কিন্তু সুলতান আইউবী দারোয়ানকে বললেন— 'তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' সুলতান আইউবী আগেই দারোয়ানকে বলে রেখেছিলেন, কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অবহিত করা হয়। রাতে ঘুম থেকে জাগানোর প্রয়োজন হলেও অশংকোচে যেন তাঁকে জাগিয়ে তোলে।

ভেতরে প্রবেশ করে কমাণ্ডার। ধুলো-মলিন তার চেহারা। দেখে পরিশ্রান্ত মনে হলো তাকে। সুলতান আইউবী তাকে বসতে বলে দাওরায়ানকে বললেন, এর আহারের ব্যবস্থা করো। কমাণ্ডার জানালেন, একটি অপহৃতা মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য আমরা চারজন সুদানী হাবশীর দু'জনকে তীরের আঘাতে হত্যা করেছি। অপর দু'জন মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। নিহত দু'জনের লাশ আমরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কমাণ্ডার আরো জানায়, মেয়েটি যাযাবর কিংবা সাধারণ ঘরানার কন্যা নয়। দেখে তাকে রাজকন্যা বলে মনে হলো। কথা প্রসঙ্গে নিজেকে খলীফার মালিকানাধীন বলে দাবি করতেও শুনেছি।

'মনে হয় আল্লাহ আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।' বলেই বসা থেকে উঠে সুলতান কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। কক্ষে উপবিষ্ট সকলে তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে আসেন।

কক্ষের বাইরে মাটিতে পড়ে আছে দু'টি লাশ। একটি উপুড় হয়ে। পিঠে বিদ্ধ একটি তীর। অপর লাশের ঘাড়ে একটি তীর গাঁথা। পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সিপাহী। মিসরের গভর্নর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীকে এই প্রথমবার দেখলো তারা। পরিচয় পেয়ে সালাম করে পিছনে সরে যায়। সুলতান আইউবী তাদের সালামের জবাব দেন এবং হাত মিলিয়ে বলেন, 'এ শিকার তোমরা কোথা থেকে মেরে আনলে?' যে সান্ত্রী টিলায় দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ে এদেরকে হত্যা করেছিলো, সে সুলতান আইউবীকে পুরো ঘটনার বিবরণ দেয়।

উপদেষ্টাদের প্রতি তাকিয়ে সুলতান আইউবী বললেন— 'আমার মনে হয়, মেয়েটি খলীফার সেই রক্ষিতা-ই হবে। আপনারা কী বলেন?'

'আমারও তা-ই মনে হয়। এদের খঞ্জরগুলো দেখুন—' বলেই আলী বিন সুফিয়ান নিহতদের খঞ্জর দু'টো আইউবীকে দেখান। সান্ত্রী যখন সুলতানকে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিলো, তখন আলী বিন সুফিয়ান লাশ দু'টোর সুরতহাল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পরনে সুদানের কাবায়েলী পোশাক। পোশাকের ভেতরে কটিবন্ধ, যাতে বাঁধা আছে একটি করে খঞ্জর। এগুলো খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ ধরনের খঞ্জর। খঞ্জরের হাতলে কসরে খেলাফতের মোহর অঙ্কিত।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন— 'এরা যদি খঞ্জরগুলো চুরি করে না থাকে, তাহলে এরা কসরে খেলাফতের নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাহী। আপাতত আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের সান্ত্রীরা যে মেয়ের ঘটনা জানালো, সে হেরেমের-ই অপহৃতা মেয়ে, যার অপহরণকারীরা খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।'

'লাশগুলো তুলে খলীফার কাছে নিয়ে চলো।' বললেন সুলতান আইউবী।

আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার, এরা প্রকৃত-ই খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য কিনা। বলেই আলী বিন সুফিয়ান সেখান থেকে চলে যান।

বেশীক্ষণ অতিবাহিত হয়নি। কসরে খেলাফতের এক কমাণ্ডার এসে পড়ে আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে। লাশ দু'টো দেখান হলো তাকে। দেখেই সে লাশ

দু'টো চিনে ফেলে এবং বলে— 'এরা তো খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাহী। গত তিনদিন ধরে এরা ছুটিতে ছিলো। সাত দিনের ছুটি নিয়েছিলো।'

'আরো কোন সিপাহী ছুটিতে আছে কি?' জিজ্ঞেস করেন আইউবী।

'আছে আরো দু'জন।'

'তারা কি এদের সাথে এক সঙ্গে ছুটি নিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, চারজন একত্রে-ই ছুটি নিয়েছিলো।'

জবাব দিয়ে কমাণ্ডার আরো এমনি এক তথ্য প্রকাশ করে, যা চমকিত করে তোলে সকলকে। কমাণ্ডার বলে— 'এরা সুদানের এমন একটি গোত্রের লোক, যারা রক্তপায়ী বলে খ্যাত। ফেরআউনী আমলের কিছু জঘন্য প্রথা এখনো তাদের সমাজে প্রচলিত। প্রতি তিন বছর অন্তর তারা একটি উৎসব পালন করে। উৎসব হয় মেলার মতো। তিন দিন তিন রাত চলে এই মেলা। দিনগুলো তারা এমনভাবে ঠিক করে, যাতে চতুর্থ রাতে পূর্ণিমা থাকে। এ গোত্রের বাইরের অনেক লোকও মেলায় অংশ নেয়। তারা আসে শুধু আমোদ করার জন্য। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের বেচা-কেনার জন্য রীতিমত হাট বসে মেলায়। এই মেলা বসার অন্তত একমাস পূর্ব থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকা, বরং কায়রোতে পর্যন্ত যাদের ঘরে যুবতী মেয়ে আছে, তারা সতর্ক হয়ে যায়। কেউ মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেয় না। যাযাবর পরিবারগুলো পর্যন্ত এ সময়ে এ এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এই একমাস চতুর্দিকে মেয়ে অপহরণ হয় আর এ মেলায় বিক্রি হয়। চার সুদানী ফৌজ-ও এ মেলা উপলক্ষ্যে ছুটিতে গিয়েছিলো। আর মাত্র তিনদিন পর মেলা শুরু হচ্ছে।'

'আচ্ছা, তাদের ব্যাপারে কি একথা বলা যায় যে, তারাই খলীফার হেরেমের মেয়েটিকে অহপরণ করেছে?' জিজ্ঞেস করলেন আলী বিন সুফিয়ান।

একথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি, এ দিনগুলোতে উক্ত গোত্রের লোকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মেয়ে অপহরণ করার চেষ্টা করে। তারা এতো-ই রক্তপায়ী যে, যদি কোন মেয়ের অভিভাবক মেলায় গিয়ে নিজ কন্যার সন্ধান পায় এবং তাকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তবে নির্ঘাত তাকে জীবন হারাতে হয়। মেয়েদের খদ্দেরদের মধ্যে মিসরের আমীর-উজীর-হাকীমও থাকেন। মেলায় এমন একটি অস্থায়ী পতিতালয় স্থাপন করা হয়, যেখানে সর্বক্ষণ মদ-জুয়া আর নারী নিয়ে আমোদ চলে। এ উৎসব-অনুষ্ঠানের শেষ রাতটি হয়

অত্যন্ত রহস্যময়। কোন একটি গোপন স্থানে একটি অস্বাভাবিক সুন্দরী যুবতী মেয়েকে বলী দেয়া হয়। কোন্ স্থানে কিভাবে এই নারী-বলী হয়, তা নির্দিষ্ট ক'জন ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। হাবশীদের এক ধর্মগুরু– যাকে তারা খোদা বলেও বিশ্বাস করে– এ কাজ সম্পাদন করে। তার সঙ্গে থাকে স্বল্পসংখ্যক পুরুষ আর চার-পাঁচটি মেয়ে। বলী দেয়া মেয়ের কর্তিত মাথা ও রক্ত প্রদর্শন করা হয় সর্বসাধারণকে। কর্তিত মস্তক দেখে গোত্রের মানুষ মাতালের ন্যায় নাচতে-গাইতে ও মদপান করতে শুরু করে।

অপহরণ ঘটনার তথ্য উদ্ধার করার জন্য খলীফা নিরাপত্তা বাহিনীর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তথ্য বের করার জন্য সেই ভোর থেকে সমগ্র বাহিনীকে প্রখর রোদে দাঁড় করিয়ে রাখেন তিনি। কমাণ্ডারদের পর্যন্ত এক তিল দানা-পানি মুখে দিতে দেননি সারা দিন। রজব বার বার আসছে আর ঘোষণা করছে— 'মহলের নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া মেয়ে অপহরণ করা যেতে পারে না। যে-ই এ অপহরণে সাহায্য করেছো, সামনে এসে হাজির হও। অন্যথায় সকলকে এভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় মেরে ফেলা হবে। যদি মেয়েটি স্বেচ্ছায়ও পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও তো কেউ না কেউ দেখে থাকবে নিশ্চয়। বলো, কে তার অপহরণে সাহায্য করেছ!' কিন্তু না, এতোসব হুমকি-ধমকিতে কোন-ই ক্রিয়া হচ্ছে না। সকলের মুখে একই কথা, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমি নির্দোষ।

খলীফা রজবকে এক পা দাঁড়াতে দিচ্ছেন না। তাকে তিনি বলেছিলেন— 'উম্মে আরারার জন্য আমার আফসোস নেই। আমার পেরেশানীর কারণ হলো, যে বা যারা এত কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মহলের একটি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে পারে, তারা আমাকে অনায়াসে হত্যাও তো করতে পারে! তুমি বলেছিলে, এ ঘটনা সালাহুদ্দীন ঘটিয়েছে; আমি তার প্রমাণ চাই।'

কিন্তু রজব প্রমাণ দেবে কোত্থেকে? প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর নিকট আবার ছুটে যায় সে। রাগে পাগলের মতো হয়ে গেছে লোকটি। সৈন্যদের উদ্দেশে পূর্বের বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করে। ঠিক এ সময়ে মহলের দরজায় দণ্ডায়মান সান্ত্রীরা দরজা খুলে দেয় এবং চেচিয়ে উঠে বলে— 'ঐ তো আমীরে মেসের আসছেন।"

প্রধান ফটকে প্রবেশ করে সুলতান আইউবীর অশ্ব। সামনে তাঁর দু'জন রক্ষীর ঘোড়া। আটজন আরোহী পিছনে। একজন ডানে আর একজন বাঁয়ে। সকলের পিছনে সুলতান আইউবীর একজন উপদেষ্টা আর গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান।

সুলতান আইউবীর এই বহরের পেছনে চার চাকাবিশিষ্ট একটি গাড়ী। দু'টি ঘোড়া টেনে এনেছে গাড়ীটি। গাড়ীতে পড়ে আছে দু'টি লাশ। একটি চীৎ হয়ে আর অপরটি উপুড় হয়ে। লাশ দু'টির গায়ে বিদ্ধ দু'টি তীর। লাশের সঙ্গে আছে তিনজন সিপাহী।

সংবাদ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন খলীফা। সুলতান আইউবী ও তাঁর সঙ্গীগণ নেমে পড়েন ঘোড়া থেকে। সুলতান খলীফাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সালাম করেন, মোসাফাহা করেন ও হাতে চুমো খান। তারপর কোন ভূমিকা ছাড়া-ই বলে ওঠেন–

'আপনার হেরেমের মেয়েকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আপনি পয়গাম পাঠিয়েছেন। সে পয়গাম আমি পেয়েছি। আমি আপনার দুই নিরাপত্তা কর্মীর লাশ নিয়ে এসেছি। এই লাশ দু'টো-ই আমাকে নির্দোষ প্রমাণিত করবে। আর হুজুরের খেদমতে আমি এই আরজি পেশ করার আবশ্যক মনে করছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবী আপনার ফৌজের সিপাহী নয়। আপনি যে খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সালাহুদ্দীন সে খেলাফতের-ই প্রেরিত গভর্নর।'

সালাহুদ্দীন আইউবীর ভাব-গতিক বুঝে ফেলেন খলীফা। পাপের ভারে কুঁকিয়ে ওঠে এই ফাতেমী খলীফার হৃদয়। সুলতান আইউবীর প্রভাব আর মহান ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তর করার সৎ সাহস নেই তার। সুলতানের কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'আমি তোমাকে আপন পুত্র অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি। ভেতরে এসে বসো সালাহুদ্দীন!'

'আমি এখনো একজন আসামী। এক্ষুনি আমার প্রমাণ দিতে হবে, হেরেমের মেয়ে অপহরণে আমার কোন হাত নেই। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন, তিনি দু'টি লাশ প্রেরণ করেছেন। এই দু'টো লাশ কথা বলবে না ঠিক, কিন্তু তাদের নীরবতা, তাদের গায়ে বিদ্ধ হয়ে থাকা তীর-ই সাক্ষ্য দেবে, সালাহুদ্দীন কসরে খেলাফতে সংঘটিত এ অপরাধের সাথে জড়িত নয়। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত না করা পর্যন্ত আমি ভেতরে যাবো না, আসুন।' বলেই সালাহুদ্দীন

আইউবী লাশের গাড়ীর দিকে হাঁটা দেন। খলীফাও তার পিছনে পিছনে রওনা হন।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে চার থেকে সাড়ে চার শত নিরাপত্তা বাহিনী। সুলতান আইউবী গাড়ীর লাশ দু'টো উঠিয়ে তাদের কাছে নিয়ে রাখেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলেন— 'আট আটজন করে সিপাহী সামনে এগিয়ে আসো এবং লাশ দু'টো দেখে বলো, এরা কারা?'

প্রথমে আসে কমাণ্ডার ও প্লাটুন দায়িত্বশীলগণ। লাশ দু'টো দেখেই তারা নাম উল্লেখ করে বলে— 'এরা তো আমাদের বাহিনীর সিপাহী ছিলো!' তারপর আসে অপর আটজন। তারাও লাশ সনাক্ত করে বলে, এরা আমাদের সহকর্মী সিপাহী। এভাবে আটজন আটজন করে সকল কমাণ্ডার-সিপাহী এসে দেখে লাশ দু'টোর পরিচয় প্রদান করে।

'সালাহুদ্দীন! আমি মেনে নিলাম, এ দু'টো লাশ কসরে খেলাফতের দুই নিরাপত্তা কর্মীর। কিন্তু আমি শুনতে চাই, এদের হত্যা করলো কে?' বললেন খলীফা।

টহল বাহিনীর যে সান্ত্রী এদের হত্যা করেছিলো, সালাহুদ্দীন আইউবী তাকে সামনে ডেকে এনে বললেন, সমবেত মজলিসে তোমার কাহিনী পুনর্ব্যক্ত করো।'

ঘটনাটি আনুপুংখ বিবৃত করে শোনায় সান্ত্রী। তার বক্তব্য শেষ হলে সুলতান আইউবী খলীফাকে বললেন— 'অপহরণ করে আপনার মেয়েটিকে আমার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়নি– নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে সুদানী হাবশীদের মেলায় বিক্রি করার জন্য। প্রথা অনুযায়ী হাবশীরা তারা বলীও দিতে পারে।'

লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হয়ে ওঠেন খলীফা। তিনি সুলতান আইউবীকে বললেন, বসুন, ভেতরে আসুন।' কিন্তু ভেতরে যেতে অস্বীকার করলেন আইউবী। বললেন, আমি মেয়েটিকে জীবিত হোক, মৃত হোক উদ্ধার করে এনে আপনার খেদমতে হাজির হবো। তবে আপনি মনে রাখবেন, হেরেমের এমন একটি মেয়ের অপহরণ– যে এসেছিলো উপহারস্বরূপ এবং যে আপনার বিবাহিত স্ত্রী নয়– রক্ষিতা– আমার কাছে বিন্দু বরাবর গুরুত্ব রাখে না। আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।'

'আমার পেরেশানীর কারণ এই নয় যে, হেরেমের একটি মেয়ে অপহৃতা হয়ে গেছে। পেরেশানীর আসল কারণ, যদি এভাবে নারী অপহরণ চলতে থাকে, তাহলে দেশের আইন-শৃংখলার পরিণতি কী হবে!' বললেন খলীফা।

'আর আমি পেরেশান এই ভেবে যে, খোদ ইসলামী সাম্রাজ্য-ই অপহৃত হয়ে যাচ্ছে। যা হোক, আপনি এতো অস্থির হবেন না। আমার গোয়েন্দা বিভাগ মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।' বললেন সুলতান আইউবী।

খলীফা সুলতান আইউবীকে খানিকটা আড়ালে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, সালাহুদ্দীন! বেশ কিছুদিন ধরে আমি দেখছি, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো। তোমার পিতা নাজমুদ্দীন আইউবকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তোমার মনে আমার প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধও নেই দেখছি। তাছাড়াও এই আজই আমি জানতে পারলাম, কায়রোর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব আমীরুল ওলামা জুমার খোতবা থেকে আমার নাম তুলে দেয়ার মতো গোস্তাখী করেছে। কাজটা সে তোমার ইন্ধনে করেনি তো?'

'আমার ইন্ধনে নয়– সরাসরি আমার নির্দেশে তিনি খোতবা থেকে আপনার নাম তুলে দিয়েছেন। শুধু আপনার নাম-ই নয়, আপনার পরে যারা খেলাফতের মসনদে আসীন হবেন এবং তাদেরও পরে যারা আসবেন, সকলের নাম-ই আমি খোতবা থেকে তুলে দিয়েছি।' বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবী।

'এ নির্দেশ কি ফাতেমী খেলাফতকে দুর্বল করার জন্য জারি করা হলো? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, ফাতেমী খেলাফতকে উৎখাত করে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে।' বললেন খলীফা।

'হুজুর বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তাছাড়া মদপানের ফলে মস্তিষ্কও দুর্বল হয়ে গেছে। তাই কথাগুলো আপনার প্রলাপের মত শোনা যাচ্ছে. . . . . .।' বললেন সুলতান আইউবী। তারপর খানিক চিন্তা করে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কাল থেকে আপনার নিরাপত্তা বাহিনীতে রদবদল হবে। রজবকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আমি তার স্থলে নতুন কমাণ্ডার দেবো।'

'কিন্তু রজবকে যে আমি এখানে রাখতে চাই।' বললেন খলীফা

'হুজুরের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন, সামরিক কর্মকাণ্ডে আপনি হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করবেন না।' বলেই সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানের প্রতি মনোযোগী হন। আলী বিন সুফিয়ান তখন পাঁচজন হাবশী রক্ষীসেনা নিয়ে এদিকে আসছিলেন।

'এরা পাঁচজন ঐ গোত্রের লোক। আমি নিরাপত্তা বাহিনীকে উদ্দেশ করে বললাম, ঐ গোত্রের কেউ এখানে থাকলে বেরিয়ে আসো। সারি থেকে বেরিয়ে

আসে এরা পাঁচজন। কমাণ্ডার বললো, এরা আগামী পরশু থেকে ছুটিতে যাচ্ছে। আমি এদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। মেয়েটির অপহরণে এদের হাত থাকতে পারে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'সালাহুদ্দীন আইউবী রজবকে ডেকে বললেন, আগামীকাল এখানে অন্য কমাণ্ডার আসছে। আপনি আমার নিকট চলে আসবেন। আমি আপনাকে মিনজানীকের দায়িত্ব দিতে চাই।'

শুনে ফ্যাকাশে হয়ে যায় রজবের চেহারা।

❖❖❖

উম্মে আরারাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে হাবশী দু'জন চলে যায় অনেক দূর। এখন আর কারো পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা নেই। ঘোড়া থামায় তারা। মেয়েটি পুনরায় মুক্ত হওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করে। হাবশীরা তাকে বলে, এই তড়পানি তোমার অনর্থক। আমরা তোমাকে ছেড়ে দিলেও এখন আর এ বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করে তুমি কসরে খেলাফতে জীবিত যেতে পারবে না। তারা মেয়েটিকে এই বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে, আমরা তোমাকে অপমান করতে চাই না। বাস্তবিক, যদি তাদের উদ্দেশ্য খারাপ হতো, তাহলে এতক্ষণে তারা মেয়েটির সঙ্গে হায়েনার মতো আচরণ করতো। কিন্তু তারা তেমন কিছু-ই করেনি। এমন একটি চিত্তাকর্ষক সুন্দরী মেয়ে যে তাদের হাতের মুঠোয়, সে অনুভূতি-ই যেন নেই তাদের। তাদের যে দু'জন লোক মারা পড়েছে, তার একজন মৃত্যুর আগে উম্মে আরারার সামনে হাটু গেড়ে বসে করজোরে নিবেদন করেছিলো, পালাবার চেষ্টা করে যেন সে নিজেকে কষ্টে না ফেলে। মেয়েটি তাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? জবাবে তারা বললো, আমরা তোমাকে আসমানের দেবতার রাণী বানানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

তারা মেয়েটির চোখে পট্টি বেঁধে ঘোড়ায় বসায়। মেয়েটি পালাবার চেষ্টা ত্যাগ করে। এ চেষ্টা যে বৃথা, তা বুঝে ফেলে সে।

ছুটে চলে ঘোড়া। এক হাবশীর সামনে ঘোড়ায় বসে ফোঁফাতে থাকে উম্মে আরারা। দীর্ঘক্ষণ চলার পর শীতল বায়ুর পরশে সে বুঝতে পারে রাত হয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ চলার পর এক স্থানে থেমে যায় ঘোড়া। একটানা পথ চলায় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে মেয়েটি। সমস্ত শরীর ভেঙ্গে আসে যেনো তার। ভয়ে অকেজো হয়ে গেছে তার মস্তিষ্ক।

ঘোড়া থামতেই আশে-পাশে তিন-চারজন পুরুষ আর জনতিনেক মেয়ের মিশ্র স্বর শুনতে পায় মেয়েটি। অবোধ্য এক ভাষায় কথা বলছে তারা। অপহরণকারী হাবশীরা পথে তার সঙ্গে কথা বলেছে আরবী ভাষায়। কিন্তু তাদের বাচনভঙ্গি আরবী নয়।

চোখের পট্টি খোলা হয়নি উম্মে আরারার। সে অনুভব করে, একজন তাকে তুলে একটি নরম বস্তুর উপর বসিয়ে দেয়। বস্তুটি পাল্‌কি। উপরে উঠে যায় পাল্‌কিটি। শুরু হয় তার নতুন আরেক সফর। পালকি কাঁধে করে এগিয়ে চলে বেহারা। তার সঙ্গে দফের মৃদু-মধুর গুঞ্জরণ কানে আসতে শুরু করে তার। গান গাইতে শুরু করে মেয়েরা। গানের শব্দগুলো বুঝতে পারছে না মেয়েটি। কিন্তু গানের সুর-লয়ে জাদুর ক্রিয়া। তাতে উম্মে আরারার ভয়ের মাত্রা বেড়ে যায় আরো। এই ভয়ের মাঝে এমনও প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করে, যেন নেশা বা আচ্ছন্নতা চেপে ধরছে তাকে। রাতের হীম বায়ু সে আচ্ছন্নতায় এক প্রকার মধুরতা সৃষ্টি করে চলেছে। উম্মে আরারার একবার ইচ্ছা জাগে, পালকি থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করি আর ওরা আমাকে মেরে ফেলুক। কিন্তু পরক্ষণে-ই সে ভাবে, না, আমি যাদের কব্জায় আটকা পড়েছি, তারা মানুষ নয়—অন্য কোন শক্তি। স্বেচ্ছায় আমার কিছু-ই করা চলবে না।

উম্মে আরারা টের পায়, বেহারারা একের পর এক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। উঠছে তো উঠছে-ই। অন্তত ত্রিশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে এবার তারা সমতল জায়গায় চলতে শুরু করে। কয়েক পা এগিয়ে-ই থেমে যায় পাল্‌কি। পাল্‌কিটি নামিয়ে রাখা হয় নীচে। উম্মে আরারার চোখ থেকে পট্টি খুলে দু'চোখে হাত রাখে একজন। কিছুক্ষণ পর চোখের উপর থেকে হাতের আঙ্গুল সরতে শুরু করে এক এক করে। চোখে আলো দেখতে শুরু করে মেয়েটি। ধীরে ধীরে চোখ থেকে সরে যায় হাত।

চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকায় উম্মে আরারা। হাজার হাজার বছরের পুরনো একটি প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছে সে। একদিকে প্রশস্থ একটি হল। তাতে বিছিয়ে রাখা ফরশ আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে। দেয়ালের সঙ্গে স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো দণ্ড। প্রদীপ জ্বলছে সেগুলোর মাথায়। এক প্রকার সুঘ্রাণ নাকে আসে তার, যার সৌরভ সম্পূর্ণ নতুন মনে হলো তার কাছে। দফের মৃদু শব্দ আর নারী কণ্ঠের গানের আওয়াজ কানে আসে উম্মে আরারার। এই বাদ্য-শব্দ আর গানের লয়-তাল অপূর্ব এক গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে চলেছে হলময়।

সম্মুখে তাকায় উম্মে আরারা। একটি চবুতরা চোখে পড়ে। চবুতরায় পাথর-নির্মিত একটি মূর্তির মুখমণ্ডল ও মাথা। চিবুকের নীচে সামান্য একটু গ্রীবা। এই পাথরের মুখমণ্ডলটি দীর্ঘকায় একজন মানুষের চেয়েও দেড়-দু' ফুট উঁচু। মুখটা খোলা, যা এতো-ই চওড়া যে, একজন মানুষ একটুখানি ঝুঁকে অনায়াসে তাতে ঢুকে পড়তে পারে। ধবধবে সাদা দাঁতও আছে মুখে। দেখতে মনে হচ্ছে, খিল্‌খিল্‌ করে হাসছে মুখমণ্ডলটি। উভয় কান থেকে তার বেরিয়ে এসেছে দু'টি দণ্ড। প্রদীপ জ্বলছে সেগুলোর মাথায়। হাত দুয়েক করে চওড়া চোখ দু'টো তার অকস্মাৎ জ্বলজ্বল করে ওঠে। আলো বিচ্ছুরিত হতে শুরু করে তা থেকে। পাল্টে যায় মেয়েদের গানের লয়। তীব্র হয়ে ওঠে দফের বাজনা। আলোকিত হয়ে ওঠে পাথরের অভ্যন্তর। ধপধপে সাদা চোগা পরিহিত দু'জন মানুষ ঝুঁকে বেরিয়ে আসে মুখের ভেতর থেকে। লোক দু'টির গায়ের রং কালো। মাথায় বাঁধা লম্বা লম্বা রং-বেরংয়ের পাখির পালক। মুখের অভ্যন্তর থেকে বাইরে এসেই একজন ডান দিকে একজন বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে যায়।

পরক্ষণে-ই মুখের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে আরেকজন মানুষ। ঝুঁকে বাইরে বেরিয়ে আসে সে-ও। বয়সে খানিকটা বৃদ্ধ মনে হলো তাকে। পরনে লাল বর্ণের চোগা, মাথায় মুকুট। দু' কাঁধে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফনা তুলে বসে আছে মিশমিশে কালো দু'টি সাপ। সাপ দু'টো কৃত্রিম। ভয়ে গা শিউরে উঠে উম্মে আরারার। নির্জীব নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে সে।

এ লোকটি অত্র গোত্রের ধর্মগুরু বা পুরোহিত। চবুতরার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসেন তিনি। ধীরে ধীরে উম্মে আরারার নিকটে এসে মেয়েটির সামনে হাটু গেড়ে বসে তার দুঁ'টি হাত নিজের দু'হাতে নিয়ে চুমো খান। আরবী ভাষায় মেয়েটিকে বলেন, তুমি-ই সেই ভাগ্যবতী মেয়ে, আমার দেবতা যাকে পছন্দ করেছেন। আমি তোমাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি।'

চৈতন্য ফিরে পায় উম্মে আরারা। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলে, 'আমি কোন দেবতা মানি না। তোমাদের যদি দেবতায় বিশ্বাস থাকে, তো আমি তাদের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা আমাকে এখানে কেন আনলে!'

'এখানে যে-ই আসে, প্রথম প্রথম একথা-ই বলে। কিন্তু পরে যখন চোখের সামনে এ পবিত্র ভূখণ্ডের মাহাত্ম্য খুলে যায়, তখন বলে— 'আমি এখানে চিরদিন থাকতে চাই।' আমি জানি, তুমি মুসলমানদের খলীফার প্রেমাস্পদ। কিন্তু যিনি

পছন্দ করেছেন, দুনিয়ার সব খলীফা আর আকাশের ফেরেশতাকুল তাকে সেজদা করে। তুমি জান্নাতে এসে গেছো।'

পুরোহিত চোগার পকেট থেকে একটি ফুল বের করে। উম্মে আরারার ন্যাকের কাছে ধরে ফুলটি। উম্মে আরারাহ হেরেমের রাজকন্যা। এমনসব আতর-সুগন্ধি ব্যবহার সে করেছে, রাজকন্যারা ব্যতীত কেউ যার কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু এ ফুলের সৌরভ তার কাছে নিতান্তই অভিনব বলে মনে হলো। এ ফুলের সৌরভ হৃদয় ভেদ করে যায় উম্মে আরারার। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার রং-ও পাল্টে যায় তার। পুরোহিত বললেন— 'এটি দেবতার উপহার।' মেয়েটির নাক থেকে ফুলটি সরিয়ে নেন পুরোহিত।

ধীরে ধীরে ডান হাতটা আগে বাড়ায় উম্মে আরারা। পুরোহিতের ফুল-ধরা হাতটা টেনে আনে নিজের কাছে। নাকের কাছে নিয়ে ফুল শুঁকে আবেশমাখা কণ্ঠে বলে— 'কি মন ভুলানো উপহার! দেবেন এটি আমায়?'

'তুমি কি দেবতার এ উপহার গ্রহণ করেছো?' জিজ্ঞেস করেন পুরোহিত। ঠোঁটে তার হাসি।

'হ্যাঁ, দেবতার এ উপহার আমি কবুল করে নিয়েছি।' বলে উম্মে আরারাহ পুনরায় ফুলটি নাকের কাছে ধরে। নিজের চোখ দু'টো বন্ধ করে ফেলে, যেন ফুলের সৌরভে বিমোহিত হয়ে পড়েছে সে।

'দেবতাও তোমায় কবুল করে নিয়েছেন।' বললেন পুরোহিত। তারপর জিজ্ঞেস করলেন— 'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

ভাবনায় পড়ে যায় মেয়েটি। যেন কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করছে সে। খানিক পর মাথা দুলিয়ে বলে— 'আমি এখানেই তো আছি।'

– না, না আমি অন্য এক জায়গায় ছিলাম– ধুত্তুরি ছাই! মনে-ই পড়ছে না, কোথায় ছিলাম।

'এখানে তোমাকে কে নিয়ে এসেছে?'

'কেউ নয়– আমি নিজেই এসেছি?'

'কেন, তুমি ঘোড়ায় চড়ে আসোনি?'

'না, আমি উড়ে এসেছি।'

'কেন, পথে মরুভূমি, পাহাড়-জঙ্গল, বিরাণভূমি দেখোনি?'

'দেখিনি মানে! কত সবুজের সমারোহ আর কত রং-বেরংয়ের ফুল দেখেছি!' শিশুর ন্যায় আপ্লুত কণ্ঠে জবাব দেয় মেয়েটি।

'তোমার চোখে কেউ পট্টি বাঁধেনি?'

‘পট্টি? কই না তো! আমার চোখ তো খোলা-ই ছিলো! কত সুন্দর সুন্দর মন ভুলানো পাখি দেখেছি আমি!’

উচ্চশব্দে কি যেন বললেন পুরোহিত। উম্মে আরারার পিছন দিক থেকে ধেয়ে আসে চারটি মেয়ে। এসেই পরনের পোশাক খুলে বিবস্ত্র করে ফেলে উম্মে আরারাকে। উম্মে আরারাহ হেসে জিজ্ঞেস করে— ‘দেবতা এ অবস্থায় আমাকে পছন্দ করবেন?’ পুরোহিত বললেন— ‘না, তোমাকে দেবতার পছন্দের পোশাক পরানো হবে।’ মেয়েরা উম্মে আরারার কাঁধের উপর চাদরের মত দীর্ঘ একটি কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বিত চাদরে আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায় তার। চাদরের পাড়ে কতগুলো রঙ্গিন রশির টুকরো বাঁধা। দুই পাড় একত্র করে বেঁধে দেয় মেয়েরা। চমৎকার এক চোগায় পরিণত হয় চাদরটি। উম্মে আরারার মাথার চুল রেশমের মত কোমল। একটি মেয়ে চুলগুলো আচড়িয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে দেয়। আরো বেড়ে যায় উম্মে আরারার রূপ।

পুরোহিত হাসিমুখে তাকায় উম্মে আরারার প্রতি। পাথর-নির্মিত ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলটির প্রতি হাঁটা দেন তিনি। দু'টি মেয়ে উম্মে আরারারকে নিয়ে পুরোহিতের পেছনে পেছনে এগিয়ে যায়। রাজকন্যার মত হাঁটছে উম্মে আরারাহ। আশে-পাশে দৃষ্টি নেই তার। রাজকীয় ভঙ্গিমায় চলছে সে। পুরোহিতের অনুসরণে মেয়ে দু'টোর হাত ধরে চবুতরার সিঁড়িতে উঠতে শুরু করে। পাথরের পাহাড়সম মুখমণ্ডলের গহ্বরে ঢুকে পড়ে পুরোহিত। উম্মে আরারাও তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করে ঝুঁকে ঢুকে পড়ে মুখের অভ্যন্তরে। মেয়ে দু'টো দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে। উম্মে আরারার হাত ছেড়ে দেয় তারা; ধরে পুরোহিত নিজে। মুখের অভ্যন্তরটা যথেষ্ট প্রশস্থ, অনায়াসে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে মেয়েটি। কণ্ঠনালী থেকে নীচে নেমে গেছে কয়েকটি সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে দু'জন।

আবার একটি কক্ষ। কক্ষটি তেমন প্রশস্থ নয়। বেশ ক'টি প্রদীপ জ্বলছে। এখানেও ফুলের সৌরভ। কক্ষের ছাদ তেমন উঁচু নয়। দেয়াল ও ছাদ গাছের পাতা ও ফুল দিয়ে ঢাকা। ফরাশের উপর নরম ঘাস। ঘাসের উপর ফুল ছিটানো। এক কোনে মনোরম একটি পিপা ও একটি পেয়ালা। পিপা কাৎ করে দু'টি পেয়ালা ভর্তি করেন পুরোহিত। একটি উম্মে আরারার হাতে ধরিয়ে দেন আর অপরটি রাখেন নিজের হাতে। ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে পেয়ালা খালি করে ফেলেন দু'জনে।

‘দেবতা কখন আসবেন?’ জিজ্ঞেস করে উম্মে আরারা।

'এখনো তুমি তাঁকে চিনতে পারোনি? তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছেন? বললেন পুরোহিত।

পুরোহিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে উম্মে আরারা। বলে, 'হ্যাঁ, এবার আমি দেবতাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি সে নও, যাকে আমি উপরে দেখেছিলাম? আমাকে তুমি কবুল করেছো?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে তুমি আমার দুলহান।' বললেন পুরোহিত।

❖ ❖ ❖

আমি আপনাকে আর কিছু জানাতে পারছি না। আমার আব্বা আমাকে বলেছিলেন, পুরোহিত মেয়েটিকে একটি ফুল শোঁকান, যার সৌরভ তাকে ভুলিয়ে দেয়, সে কে ছিলো, কোথা থেকে এসেছে এবং কিভাবে তাকে এখানে আনা হয়েছে। স্বেচ্ছায় সে পুরোহিতের দাসীতে পরিণত হয়ে যায়। জগতের যত্তোসব বিশ্রী বস্তু সুশ্রী হয়ে দেখা দেয় তার চোখের সামনে। পুরোহিত তাকে পাতাল কক্ষে নিজের সঙ্গে রাখেন তিন রাত।'

খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে নিয়ে আসা পাঁচ হাবশীর একজন আলী বিন সুফিয়ানের সামনে ব্যক্ত করছিলো উপরোক্ত তথ্যগুলো। যে গোত্রের চার সিপাহী উম্মে আরারাকে অপহরণ করেছিলো, এই পাঁচজনও সে গোত্রের লোক। যেহেতু অল্প ক'দিন পর তাদের মেলা বসছে আর এরা পাঁচজন সে মেলায় অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে ছুটিতে যাচ্ছে, তাই আলী বিন সুফিয়ান ধরে নিলেন, হেরেমের মেয়ে অপহরণের বিষয়টি তাদের জানা থাকতে পারে। সেমতে খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে আলী বিন সুফিয়ান এদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। প্রথমে পাঁচজন-ই বলে, তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। আলী বিন সুফিয়ান তাদের আশ্বস্ত করেন, সত্য কথা বললে তাদের কোন শাস্তি দেয়া হবে না। তবু তারা অজ্ঞতার কথা-ই প্রকাশ করতে থাকে। হায়েনা চরিত্র আর রক্ত-পিয়াসী বলে প্রসিদ্ধ এ গোত্রটি। সাজা-শাস্তির ভয়-ডর নেই তাদের মনে। আলী বিন সুফিয়ানের ধৃত পাঁচজনও বেশ সাহসিকতার সঙ্গে অস্বীকার করে চলে। অগত্যা আলী বিন সুফিয়ান ঐসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বাধ্য হন, যা পাথরকেও মোমের মত গলিয়ে দেয়।

আলী বিন সুফিয়ান আলাদা আলাদাভাবে পাঁচজনকে এমন স্থানে নিয়ে যান, যেখানকার আহ-চীৎকার বাইরের কেউ শুনতে পায় না। বিরামহীন অত্যাচার-নির্যাতনে কোন আসামী মরে গেলেও জানতে পারে না কেউ।

এই পাঁচ সুদানী বড় কঠিন-হৃদয়ের মানুষ বলে মনে হলো আলী বিন সুফিয়ানের কাছে। তারা রাতভর কঠোর নির্যাতন সইতে থাকে। আর আলী বিন সুফিয়ানও রাত জেগে তাদের মুখ খোলানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা যাচ্ছে না তাদের মুখ থেকে। অবশেষে সর্বশেষ কঠোর পন্থাটি অবলম্বন করলেন আলী।

কঠোর নির্যাতনের মুখে শেষ রাতে মধ্য বয়সী এক হাবশী আলী বিন সুফিয়ানকে বলে— 'আমি সবকিছু জানি। কিন্তু বলছি না দেবতার ভয়ে। বললে দেবতা আমাকে নির্মমভাবে মেরে ফেলবে।'

'এর চেয়ে নির্দয় শাস্তি আর কী হতে পারে, যা আমি তোমাদের দিচ্ছি? তোমার দেবতা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাকে এই নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে বের করিয়ে নেয় না কেন? মৃত্যুকেই যদি তোমরা ভয় করে থাকো, তাহলে মৃত্যু এখানেও আছে। তোমরা কথা বলো। আমার হাতে এমন দেবতা আছে, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দেবতার কবল থেকে রক্ষা করবেন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

আলী বিন সুফিয়ানের কঠোর শাস্তির মুখে বেশ ক'বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে লোকটি। দেবতা নয়– বার বার মৃত্যু এসে চোখের সামনে হাজির হয় তার। আলী বিন সুফিয়ান তার মুখ খোলাতে সক্ষম হন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে পানাহার করিয়ে আরামে শুইয়ে দেন তাকে।

সে স্বীকার করে, উম্মে আরারাকে তার-ই গোত্রের চার ব্যক্তি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তারা খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাহী। তারা আগেই ছুটিতে গিয়েছিলো। পরিকল্পনা সম্পন্ন করে যাওয়ার সময় আমাদের অপহরণের রাত-ক্ষণ বলে গিয়েছিলো। সে রাতে পাহারায় ডিউটি ছিলো আমাদের পাঁচজনের। প্রধান ফটক দিয়ে তাদের দু'জনকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার সুযোগ আমরা-ই করে দিয়েছিলাম। আমরা তাদের অপহরণ ও পলায়নে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছি।

হাবশী জানায়, মেয়েটিকে দেবতার বেদীতে বলী দেয়া হবে। প্রতি তিন বছর পর পর আমাদের গোত্রে চার দিনব্যাপী একটি উৎসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার শেষ দিন মেয়েটির বলীপর্ব সম্পন্ন হওয়ার কথা। আমাদের নিয়ম, বলীর মেয়ে ভিনদেশী, শ্বেতাঙ্গী, উচ্চ বংশের এবং চোখ ধাঁধানো রূপসী হতে হয়।'

'তার মানে প্রতি তিন বছর পর পর তোমার গোত্র বাইরে থেকে একটি করে রূপসী মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে আসে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'না, এটা ভুল প্রচারণা। তিন বছর পর পর মেলা বসে। আর মেয়ে বলী হয় প্রতি পাঁচ মেলার পর। তবে মানুষ এটাই জানে যে, প্রতি তিন বছর পর মেয়ে বলী হয়।' জবাব দেয় হাবশী।

কোন্ স্থানে মেয়ে বলী হয়, হাবশী তাও জানায়। যে জায়গায় মেলা বসে, তার থেকে এক-দেড় মাইল দূরে একটি পাহাড়ী এলাকা। এ এলাকায় দেবতারা বাস করে বলে জনশ্রুতি আছে এবং তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত আছে অসংখ্য জিন-পরী। এ এলাকায় ফেরআউনী আমলের একটি জীর্ণ প্রাসাদ আছে। আছে একটি ঝিল, যাতে বাস করে ছোট-বড় অনেক কুমীর।

গোত্রের কেউ গুরুতর অপরাধ করলে তাকে পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়া হয়। পুরোহিত তাকে জীবন্ত ঝিলে নিক্ষেপ করেন। কুমীররা অপরাধীকে খেয়ে ফেলে।

সেই প্রাসাদেই বাস করেন পুরোহিত। প্রাসাদের এক স্থানে পাথর-নির্মিত বৃহদাকার একটি মুখ ও মাথা আছে। এর-ই অভ্যন্তরে বাস করেন দেবতা। প্রতি পনের বছরের শেষ দিনগুলিতে বাইরে থেকে একটি মেয়ে অপহরণ করে এনে তুলে দেয়া হয় পুরোহিতের হাতে। পুরোহিত মেয়েটিকে একটি ফুল শোঁকান। সেই ফুলের সৌরভে বিমোহিত হয়ে মেয়েটি ভুলে যায় সে কে ছিলো, কোথা থেকে এসেছে এবং তাকে কে এনেছে। ফুলের সাথে এক প্রকার নেশাকর ঘ্রাণ মিশিয়ে দেয়া হয়, যার প্রভাবে মেয়েটি পুরোহিতকে দেবতা এবং নিজের স্বামী ভাবতে শুরু করে। ওখানকার পুঁতিগন্ধময় বস্তুও তার চোখে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

পনের বছর পূর্ণ হওয়ার পথে। এই অল্প ক'দিন পর-ই মেয়েটিকে বলী দেয়া হবে। আমরা নয়জন লোক মিসরের ফৌজে ভর্তি হয়েছিলাম। নির্ভীক এবং জংলী হওয়ার কারণে আমাদেরকে খলীফার নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। দু'মাস আগে হেরেমের এই মেয়েটি আমাদের চোখে পড়ে। আমরা এমন রূপসী নারী জীবনে কখনো দেখিনি। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, একেই অপহরণ করে নিয়ে এবার বলীর জন্য পুরোহিতের হাতে তুলে দেবো। আমাদের এক সঙ্গী– যে গতকাল সান্ত্রীর হাতে মারা গেলো– এলাকায় গিয়ে গোত্রের মোড়লকে বলে এসেছিলো, এবার বলীর জন্য আমরা মেয়ে এনে দেবো। মেয়েটিকে আমরাই অপহরণ করে নিয়ে গেছি। বললো হাবশী।

❖❖❖

রিপোর্ট শুনে ভাবনার সমুদ্রে ডুবে যান সালাহুদ্দীন আইউবী। আলী বিন সুফিয়ান তার নির্দেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। সুলতান আইউবী ম্যাপ দেখলেন। বললেন— 'জায়গা যদি এটি-ই হয়, তাহলে স্থান তো আমাদের নাগালের বাইরে। শহরের প্রবীণ লোকদের নিকট থেকে তুমি যে তথ্য নিয়েছো, তাতে প্রমাণিত হয়, ফেরআউনের পতনের পর শত শত বছর অতিবাহিত হলেও ফেরআউনী কালচার এখনো বহাল আছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য, বেশী দূরে যেতে না পারলেও এই নিকট প্রতিবেশী সমাজ থেকে অন্তত কুফ্‌র-শিরকের অবসান ঘটাতে হবে। কি জানি, এ পর্যন্ত কত বাবা-মায়ের নিষ্পাপ কন্যা ওদের হাতে বলীর শিকার হয়েছে! কত মেয়ে অপহৃতা হয়ে বিক্রি হয়েছে এ মেলায়! দেবতার বিশ্বাসের-ই মূলোৎপাটন করতে হবে। দেবতার নাম ভাঙ্গিয়ে মেয়ে অপহরণ করিয়ে অপকর্ম আর আমোদ-ফুর্তিতে মেতে ওঠে তথাকথিত ধর্মগুরুরা। এই বর্বরতার অবসান ঘটাতে হবে।'

'গুপ্তচর মারফত আমি জানতে পেরেছি, আমাদের ফৌজের কয়েকজন কমাণ্ডার এবং মিসরের কিছুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তি এ মেলায় অংশ নেয় এবং মেয়ে ক্রয় করে কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মেয়েদের ভাড়া আনে। বরখাস্তকৃত সুদানী সৈন্যদের বিপুল সংখ্যক লোকও এ মেলায় অংশ নিয়ে থাকে। কাজেই আমি মনে করি, আমাদের ফৌজ এবং বেসামরিক লোকদের ও প্রাক্তন সুদানী ফৌজদের সঙ্গে একত্রিত হওয়া ও একত্রে উৎসব করা ঠিক নয়। এ যৌথ বিনোদন জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। আর বলীর শিকার হওয়ার আগে আগেই মেয়েটিকে উদ্ধার করে খলীফার সামনে এজন্যে পেশ করা প্রয়োজন, যাতে প্রমাণিত হয় যে, খলীফা আপনার উপর অপহরণের যে অপবাদ দিয়েছেন, তা কত ভিত্তিহীন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'আমার এর বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই আলী! আমার দৃষ্টি আমার ব্যক্তিসত্ত্বার উপর নয়। আমাকে যে যতো তুচ্ছ-ই ভাবুক, আমি ইসলামের মর্যাদা ও সমুন্নতির কথা ভুলতে পারি না। আমি নিজে কি আর ছাই! কথাটা তুমি মনে রেখো আলী! নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সালতানাতের কর্তৃত্ব রক্ষা, দেশের উন্নতি ও ইসলামের প্রসার-প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে কোরবান করে দাও। ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিলো খলীফার। কিন্তু কালক্রমে খলীফা এখন হয়ে পড়েছেন আত্মকেন্দ্রিক, প্রবৃত্তির দাস। আজ আমাদের খেলাফত ফোক্‌লা ও দুর্বল। আমাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে খৃষ্টানরা। সফলতার সঙ্গে যদি তুমি নিজের কর্তব্য পালন করতে চাও, তাহলে আত্মকেন্দ্রীকতা পরিহার করে

চলতে হবে। খলীফা আমার প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছেন, বড় কষ্টে আমি তা বরদাশ্‌ত করেছি। ইচ্ছে করলে আমি এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু তখন আমি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তাম। আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে, ক'দিন পর আমার আশ-পাশের লোকেরাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি, আত্মপ্রিয়তা ও ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।' বললেন সুলতান আইউবী।

'গোস্তাখীর জন্য ক্ষমা চাই, মোহতারাম আমীর! বলী হওয়ার আগেই যদি আপনি মেয়েটিকে উদ্ধার করাতে চান, তাহলে আদেশ করুন। সময় বেশী নেই। পরশু থেকে মেলা শুরু হচ্ছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'সেনাবাহিনীতে ফরমান জারি করে দিন, এ মেলায় কারো অংশ নেয়ার অনুমতি নেই।' বলেই নায়েব সালারকে ডেকে সুলতান বললেন— 'এ নির্দেশ যে অমান্য করবে, পদমর্যাদা যা-ই হোক, তাকে জনসমক্ষে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করা হবে। এক্ষুনি এ নির্দেশ সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিন।'

পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। সুলতান আইউবী সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ডেকে পাঠান। ঘোষণা দেন, এই জঘন্য কুসংস্কারের আড্ডা আমাদের ভাঙ্গতে হবে। স্থানটি ফেরআউনী কালচারের শেষ নিদর্শন বলে মনে হয়। সরাসরি সেনা অভিযানের প্রস্তাব আসে। কিন্তু সে প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, একে গোত্রের মানুষ সরাসরি আক্রমণ মনে করবে। সংঘর্ষ বাঁধবে। মেলায় অংশ নেয়া নিরীহ মানুষ ও নারী-শিশু মারা যাবে। স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সুদানী হাবশীকে রাহবার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার এবং যে স্থানে মেয়ে বলী দেয়া হয়, সেখানে অতর্কিতে কমাণ্ডো আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তাব আসে। সুলতান আইউবী হাবশীকে নিয়ে যাওয়া ভালো মনে করলেন না। তিনি তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

সুলতান আইউবীর নির্দেশে আগেই একটি দুর্ধর্ষ কমাণ্ডো বাহিনী গঠন করে রাখা হয়েছিলো। দীর্ঘদিন যাবত প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিজ্ঞরূপে গড়ে তোলা হয়েছে তাদের। একটি সুইসাইড স্কোয়াডও আছে তাদের সঙ্গে। ঈমানদীপ্ত এই স্কোয়াড এতোই চেতনা-সমৃদ্ধ যে, কোন অভিযান থেকে জীবিত ফিরে না আসতে পারাকে তারা গৌরবের বিষয় মনে করে।

নায়েব সালার আন-নাসের ও আলী বিন সুফিয়ানের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যে স্থানে পুরোহিত বাস করেন এবং মেয়ে বলী হয়, সেই দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় মাত্র বারজন কমাণ্ডো সেনা ঢুকে পড়বে। হাবশীর দেয়া তথ্য মোতাবেক বলীর রাতে মেলা বেশ জমে ওঠে। কারণ, এটি মেলার শেষ দিন।

গোত্রের লোকদের ছাড়া মেয়ে বলির ঘটনা আর কেউ জানে না। জান্‌লেও এই বলি কোথায় হয়, বলতে পারে না কেউ।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, পাঁচশত মিসরী সৈন্য অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে দর্শক হিসেবে এদিন মেলায় ঢুকে পড়বে। তাদের দু'শ জনের কাছে থাকবে তীর-ধনুক। সে যুগে সঙ্গে এসব অস্ত্র রাখা ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার। এসবের উপর কোন পাবন্দি ছিলো না। কমাণ্ডো সদস্যদের বলির স্থানটি স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে দেয়া হবে। তারা সরাসরি আক্রমণ করবে না। তারা কমাণ্ডো স্টাইলে পাহাড়ে ঢুকে পড়বে। অতর্কিতে প্রহরীদের হত্যা করে পৌঁছে যাবে আসল জায়গায়। মেয়েটিকে যখন বলির জন্য বেদীতে নিয়ে আসা হবে, হামলা করবে তখন। অন্যথায় তারা আক্রান্ত হয়ে মেয়েটিকে পাতাল কক্ষে গুম কিংবা খুন করে ফেলতে পারে।

তথ্য পাওয়া গেছে, মধ্য রাতের পূর্ণ চন্দ্রালোকে বলীপর্ব সম্পন্ন করা হয়। পাঁচশত সিপাহীকে এ সময়ের পূর্বে বলীর স্থান সংলগ্ন পাহাড়ের আশে-পাশে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের জানিয়ে দেয়া হয়, কমাণ্ডো সেনারা যদি প্রতিপক্ষের ঘেরাওয়ে পড়ে যায় কিংবা অভিযান ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা একটি সলিতাওয়ালা অগ্নিতীর উপর দিকে নিক্ষেপ করবে। এ তীরের শিখা দেখে তারা হামলা চালাবে।

নির্বাচন করে নেয়া হয় চারজন জানবাজ। দু' বছর আগে নুরুদ্দীন জঙ্গী সুলতান আইউবীর সাহাযার্থে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তাদের থেকে নেয়া হয় বাছা বাছা পাঁচশত সৈন্য। এরা এসেছিলো আরব থেকে। এদের উপর মিসর ও সুদানের রাজনীতি এবং তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের কোন প্রভাব ছিলো না। ইসলাম পরিপন্থী আকীদার বিরুদ্ধে ছিলো তারা উচ্চকণ্ঠ। কুসংস্কার নির্মূলে ছিলো তারা বদ্ধপরিকর। তাদেরকে ধারণা দেয়া হয়, তারা এক ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছে এবং নিজেদের তুলনায় অধিক সৈন্যের মোকাবেলা করতে হতে পারে। লড়াই হতে পারে রক্তক্ষয়ী। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের সামনে দাঁড়াতে-ই পারবে না কেউ, যুদ্ধ ছাড়াই অভিযান সফল হয়ে যাবে। তাদেরকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হয়। সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। পাহাড়ে আরোহণ, মরুভূমিতে দৌড়ানো এবং উটের মত দীর্ঘ সময় পিপাসায় অতিবাহিত করেও অকাতর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ আছে তাদের পূর্ব থেকেই।

বলীর রাত আসতে আর ছয় দিন বাকী। কমাণ্ডো বাহিনী ও পাঁচশত সৈন্যকে মহড়া দেয়া হয় তিনদিন তিনরাত। চতুর্থ দিন কমাণ্ডোদের উটে চড়িয়ে রওনা

করানো হয়। উটের মধ্যম গতিতে গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে একদিন একরাত। উট চালকদের নির্দেশ দেয়া হয়, তারা কমাণ্ডোদের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে দূরে কোথাও নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে।

পাঁচশত সৈন্যের বাহিনীটি মেলার দর্শক বেশে দু'জন দু'জন চারজন চারজন করে লরি ও উটে চড়ে মেলার দিকে রওনা হয়। তাদের কমাণ্ডারও একই বেশে তাদের সঙ্গে রওনা হয়েছে। তাদের পশুগুলো থাকবে তাদের সঙ্গে।

মেলার শেষ রাত।

আকাশের ঝলমলে চাঁদ পূর্ণতা লাভ করতে আর অল্প বাকি। স্বচ্ছ কাচের মত পরিষ্কার মরুর পরিবেশ। মেলায় বিপুল দর্শকের ভীড়। পিনপতনের স্থান নেই যেন কোথাও। একধারে অর্ধনগ্ন মেয়েরা নাচছে-গাইছে। সুন্দরী মেয়েদের দেদারছে বেচা-কেনা চলছে এক জায়গায়। বেশী ভীড় সেখানেই। একটি মঞ্চ পাতা আছে সেখানে। একটি করে মেয়ে আনা হয় মঞ্চে। চারদিক থেকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে ক্রেতা। মুখ হা করিয়ে দাঁত দেখে। নেড়ে চেড়ে দেখে মাথার চুল। দেহের কোমলতা-কঠোরতাও পরখ করা হয়। তারপর শুরু হয় দর-দাম নিয়ে আলোচনা। অবশেষে বেচা-কেনা। জুয়ার আসরও আছে মেলায়। আছে মদের আড্ডা। মেলার চার ধারে বহিরাগত দর্শকদের থাকার আয়োজন।

উৎসবে যোগদানকারী লোকদের ধর্ম ও চরিত্রের কোন বালাই নেই। আদর্শিক অনুশাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তারা। মেলাঙ্গন থেকে খানিক দূরের পাহাড়ী অঞ্চলের কোন এক নির্ভৃত ভূখণ্ডে যে সুন্দরী নারী বলির আয়োজন চলছে, তাদের তা অজানা। একজন মানুষ যে সেখানে দেবতা হয়ে বসে আছে, তাও তারা জানে না। তারা শুধু এতটুকুই জানে, পাহাড়-বেষ্টিত এ এলাকাটি তাদের দেবতাদের আবাস। জিন-ভূত পাহারা দেয় তাদের। সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না কোন মানুষ।

তাদের এ-ও জানা নেই যে, আল্লাহ্র পাঁচশত সৈনিক তাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বারজন রক্ত-মাংসের মানুষ তাদের দেবতাদের রাজত্বের সীমানায় ঢুকে পড়েছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কিভাবে প্রবেশ করতে হবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর চার জানবাজকে আগেই তা বলে দেয়া হয়েছিলো। কঠোর পাহারার কারণে তারা সে পথে ঢুকতে পারেনি। অন্য এক দুর্গম পথ দিয়ে ঢুকতে হয়েছে তাদের। তাদের বলা হয়েছিলো, পাহাড়ের আশেপাশে কোন মানুষ থাকবে না। কিন্তু এসে তারা দেখতে পায়, মানুষ আছে। তার মানে ধৃত

হাবশীর দেয়া তথ্য ভুল। পাহাড়রটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এক বর্গ-মাইলের বেশী নয়। অতি সাবধানে বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে যায় তারা।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় স্পন্দনশীল একটি ছায়ামূর্তি চোখে পড়ে এক কমাণ্ডোর। সঙ্গে সঙ্গে হাটু গেড়ে বসে পড়ে সে। অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে চলে যায় ছায়াটির। নিকটে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। দু' বাহু দ্বারা ঘাড় ঝাপটে খঞ্জরের আগা ঠেকিয়ে ধরে তার বুকে। জিজ্ঞেস করে, বল্‌ল, এখানে কি করছিস্ তুই? আর কে আছে তোর সাথে?

ছায়া মূর্তিটি একজন হাবশী লোক। কমাণ্ডো কথা বলছে আরবীতে। হাবশী আরবী বুঝে না। এমন সময়ে এসে পড়ে আরেক কমাণ্ডো। সে-ও খঞ্জর তাক করে ধরে হাবশীর বুকে। ইংগিতে প্রশ্ন করে তারা হাবশীকে। হাবশীও ইংগিতে জবাব দেয়। তার জবাবে সন্দেহ হয়, এখানে কঠোর পাহারা আছে। দুই কমাণ্ডো ধমনি কেটে দেয় হাবশীর। মাটিতে পড়ে যায় সে। আরো সতর্কতার সাথে সম্মুখে এগিয়ে চলে তারা। গহীন জঙ্গল। সামনে একটি পাহাড়। চাঁদ উঠে এসেছে আরো উপরে। ঘন পাহাড়ের ভেতরটা গাছ-গাছালিতে ঘোর অন্ধকার। তারা পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে– যেস্থানে মেয়েটিকে পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে– চলছে আরেক তৎপরতা। পাথরের মুখের সামনে চবুতরায় একটি জাজিম বিছানো। তার উপর বিশাল এক কৃপাণ। নিকটে-ই বড় একটি পেয়ালা। জাজিমে ছড়িয়ে আছে কতগুলো ফুল। পার্শ্বে একস্থানে আগুন জ্বলছে। চবুতরার চারদিকে জ্বলছে কতগুলো প্রদীপ। ঘোরাফেরা করছে চারটি মেয়ে। পরণে তাদের দু'টি করে গাছের চওড়া পাতা। বাকি শরীর নগ্ন। আছে চারজন হাবশী। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তাদের সাদা চাদর দিয়ে আবৃত।

উম্মে আরারা পাতাল কক্ষে পুরাহিতের সঙ্গে উপবিষ্ট। তার এলোচুলে বিলি কেটে খেলছেন পুরোহিত। মেয়েটি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলছে— 'আমি আংগুকের মা। তুমি আংগুকের পিতা। আমার সন্তানরা মিসর ও সুদানের রাজা হবে। তাদেরকে আমার রক্ত পান করিয়ে দাও। আমার লম্বা লম্বা সোনালী চুলগুলো তাদের ঘরে রেখে দাও। তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেলে কেন? এসো, আমার কাছে এসো।'

পুরোহিত তেলের মত একটি পদার্থ মালিশ করতে শুরু করে উম্মে আরারার গায়ে।

'আংগুক' এ গোত্রটির নাম। মদের নেশা একটি আরব মেয়েকে এই গোত্রের মা বানিয়ে দিয়েছে। বলীর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সে। পুরোহিত সম্পন্ন করছে তার নিয়ম-নীতির শেষ পর্ব।

পদে পদে হোঁচট-ধাক্কা খেতে খেতে চড়াই বেয়ে উপরে উঠছে বারজন কমাণ্ডো সৈন্য। দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে তাদের। পাহাড়ের বেশীর ভাগ ঝোপ-ঝাড়, কাঁটাল। আকাশের পূর্ণ চাঁদ এখন মাথার উপর। আস্তে আস্তে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোক-রশ্মি চোখে পড়তে শুরু করে। সেই কিরণে তারা একস্থানে একজন হাবশীকে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পায়। তার এক হাতে একটি বর্শা। অপর হাতে ঢাল। লোকটি দেব-জগতের পাহারাদার। নীরবে মেরে ফেলতে হবে তাকেও। কিন্তু লোকটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে পিছন দিক থেকে হামলা করার সুযোগ নেই। সামনাসামনি মোকাবেলা করাও ঠিক হবে না। তাই ঝোপের মধ্যে নীরবে বসে পড়ে এক কমাণ্ডো। লোকটির ঠিক সম্মুখে একটি পাথর ছুঁড়ে মারে আরেকজন। চমকে ওঠে হাবশী। পাথরটি কোত্থেকে আসলো দেখার জন্য এগিয়ে আসে এদিকে। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কমাণ্ডোর ঠিক সামনে এসে পৌছামাত্র ঘাড়টা তার এসে পড়ে কমাণ্ডোর দু' বাহুর মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয় তার বুকে। প্রহরীকে খুন করে বারজনের কমাণ্ডো বাহিনী খানিকটা বিলম্ব করে সেখানে। পরক্ষণেই এগিয়ে যায় অতি সাবধানে। পা টিপে টিপে অগ্রসর হয় সামনের দিকে।

বলীর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে উম্মে আরারা। তাকে শেষবারের মত বুকে জড়িয়ে ধরেন পুরোহিত। হাতে ধরে সিঁড়ি বেয়ে হাঁটা দেন তিনি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চার হাবশী পুরুষ ও মেয়েরা পাথরের মুখ ও মস্তকে আলোর ঝলক দেখতে পায়। মুখের সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে তারা। মুখে কি এক মন্ত্র পাঠ করতে করতে পাথরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেন পুরোহিত। উম্মে আরারা তার সঙ্গে।

উম্মে আরারাকে জাজিমের উপর নিয়ে যান পুরোহিত। হাবশী পুরুষ ও মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তার চারদিকে। উম্মে আরারা আরবীতে বলে— 'আমি আংগুকের ছেলে ও মেয়েদের জন্য গলা কাটাচ্ছি। আমি তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত্ব করছি। আর বিলম্ব না করে এবার আমার গলা কেটে দাও। আমার মাথাটা রেখে দাও আঙ্গুকের দেবতার পায়ে। এই মাথার উপর মিসর ও সুদানের মুকুট রাখবেন দেবতা।

চার হাবশী পুরুষ ও মেয়েরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে পুনর্বার। উম্মে আরারাকে জাজিমের উপর আসন গেড়ে বসিয়ে মাথাটা নত করে দেন পুরোহিত। ঘাড় বরাবর সুতীক্ষ্ম ধারাল কৃপাণ উত্তোলন করেন তিনি।

সকলের সামনে হাঁটছে যে কমাণ্ডো, থেমে যায় সে। হাতের ইশারায় থামতে বলে পিছনের সঙ্গীদের। পাহাড়ের চূড়া থেকে চবুতরা ও পাথরের মাথা দেখতে পায় তারা। চবুতরার উপরে নতমুখে আসন গেড়ে বসে আছে একটি মেয়ে। ধবধবে জোৎস্নালোক। বেশ ক'টি প্রদীপ ও বড় বড় মশালের আলোয় দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল করে রেখেছে স্থানটা। মেয়েটির কাছে দণ্ডায়মান লোকটির হাতে কৃপাণ। মেয়েটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার দেহের রং-ই বলছে, সে হাবশীদের গোত্রের মেয়ে নয়।

কমাণ্ডো সেনারা এখনো বেশ দূরে এবং পাহাড়ের চূড়ায় তাদের অবস্থান। সেখান থেকে তীর ছুঁড়লে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। আবার সেখান থেকে নীচে নেমে আসাও অসাধ্য। নীচের দিকে কোন ঢালু নেই। সামনে খাড়া দেয়াল।

কমাণ্ডোরা বুঝে ফেলে মেয়েটিকে বলীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ধারাল তরবারীর আঘাত তার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করলো বলে। হাতে সময় এত-ই কম যে, উড়ে গিয়ে বলীর স্থলে পৌঁছুতে না পারলে রক্ষা করা যাবে না তাকে। চূড়া থেকে নীচে তাকিয়ে তারা একটি ঝিল দেখতে পায়। এই সেই ঝিল, যেখানে বাস করে অসংখ্য কুমীর।

ডান দিকে খানিকটা ঢালু পথ। তা-ও প্রায় খাড়া দেয়ালের-ই মত। ঝোপ-জঙ্গল এবং গাছ-পালাও আছে এখানে। সেটি অবলম্বন করে একে অপরের হাত ধরে ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করে তারা। পিছনের কমাণ্ডো হঠাৎ দেখতে পায়, সামনের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে এক হাবশী। তার এক হাতে ঢাল, অপর হাতে বর্শা। নিক্ষেপের জন্য তীরের মত তাক করে রেখেছে বর্শাটি। কমাণ্ডোদের উপর চাঁদের আলো পড়ছে না। নিশ্চিত কিছু বুঝে উঠতে পারেনি হাবশী এখনো। ধনুকে তীর জুড়ে দেয় পিছনের কমাণ্ডো। ছুটে যায় তীর। রাতের নিস্তব্ধতায় তীরের শাঁ শাঁ শব্দ কানে বাজে সকলের। হাবশীর ধমনিতে গিয়ে বিদ্ধ হয় তীরটি। মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে সে। ঢালু বেয়ে নীচে নেমে আসে কমাণ্ডোরা।

❖ ❖ ❖

তরবারীর ধারাল বুক উম্মে আরারার ঘাড়ে রাখেন পুরোহিত। আবার উপরে তোলেন। পার্শ্বস্থিত নারী-পুরুষরা সেজদা থেকে উঠে আসন গেড়ে বসে ধীর অথচ জ্বালাময়ী কণ্ঠে কী যেন পাঠ করতে শুরু করে। তরবারী উঁচু করে

দাঁড়িয়ে পুরোহিত। দু'-একটি নিঃশ্বাসের বিলম্ব আর। তরবারী নীচে নামলো বলে। ঠিক এমন সময়ে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয় পুরোহিতের বগলে। তরবারী ধরা হাতটা তার নীচে পড়ে যায়নি এখনো। একই সঙ্গে আরো তিনটি তীর এসে বিদ্ধ হয় পাজরে। চীৎকার জুড়ে দেয় মেয়েরা। জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে হাবশী পুরুষরা। দেখতে না দেখতে আরো এক ঝাঁক তীর এসে আঘাত করে পুরোহিতের সহচরদের। ধরাশায়ী হয়ে পড়ে দু' ব্যক্তি। এদিক-সেদিক দৌড়ে পালিয়ে যায় মেয়েরা। উম্মে আরারার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। দিব্যি মাথা নত করে বসে আছে সে।

দ্রুত দৌড়ে বেদীতে এসে পৌঁছে কমাণ্ডোরা। চবুতরায় উঠে তুলে নেয় উম্মে আরারাকে। নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছে সে এখনো। এক জানবাজ নিজের গায়ের জামা খুলে পরিয়ে দেয় তাকে। উম্মে আরারাকে নিয়ে রওনা দেয় তারা।

হঠাৎ বার-তেরজন হাবশী বর্শা ও ঢাল নিয়ে ছুটে আসে একদিক থেকে। বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডোরা। তীর-কামান ছিলো তাদের চারজনের কাছে। তীর ছুঁড়ে তারা। অবশিষ্টরা লুকিয়ে থাকে এক জায়গায়। হাবশীরা নিকটে এলে পিছন দিক থেকে তাদের উপর হামলা চালায় লুকিয়ে থাকা কমাণ্ডোরা। এক তীরান্দাজ কমাণ্ডো কামানে সলিতাওয়ালা তীর স্থাপন করে। সলিতায় আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারে উপর দিকে। বেশ উপরে উঠে থেমে যখন তীরটি নীচে নামতে শুরু করে, তখন প্রজ্বলিত হয়ে উঠে তীরের মাথায় জড়ানো সলিতার শিখা।

মেলার জাঁকজমক মন্দীভূত হয়নি এখনো। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের পাঁচশত লোক মেলাঙ্গন থেকে পৃথক হয়ে তাকিয়ে আছে পাহাড়ী ভূখণ্ডের প্রতি। বেশ দূরে শূন্যে একটি শিখা দেখতে পায় তারা। হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়ে নীচে নামছে শিখাটি। তারা উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আছে। কমাণ্ডার আছে তাদের সঙ্গে। প্রথমে ধীরপায়ে এগিয়ে চলে তারা, যেন সন্দেহ না জাগে কারুর মনে। খানিক দূরে গিয়েই দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটায়। মেলার লোকেরা মদ-জুয়া, উলঙ্গ নারীর নাচ-গান আর গণিকাদের নিয়ে এত-ই ব্যস্ত যে, তাদের দেবতাদের উপর কি প্রলয় ঘটে যাচ্ছে, তার খবরও নেই তাদের।

কমাণ্ডো বাহিনী এই আশঙ্কায় অগ্নি-তীর নিক্ষেপ করেছিলো যে, হাবশীদের সংখ্যা বোধ হয় অনেক হবে। কিন্তু পাঁচশত সৈন্য অকুস্থলে পৌঁছে মাত্র চৌদ্দ-পনেরটি লাশ দেখতে পায়। তেরটি হাবশীদের আর দু'টি তাদের দু' কমাণ্ডোর। হাবশীদের বর্শার আঘাতে শাহাদাতবরণ করেছিলো কমাণ্ডো দু'জন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারদিকের খোঁজ-খবর নেয় সৈন্যরা। তারা পাথরের মুখমণ্ডলের নিকট ও পাতাল কক্ষে যায়। যা পেলো কুড়িয়ে নেয় সব। তন্মধ্যে ছিলো একটি ফুল। ফুলটি প্রাকৃতিক নয়– কৃত্রিম। কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছিলো ফুলটি। নির্দেশনা মোতাবেক পাঁচশত সৈন্য জায়গাটি দখল করে অবস্থান নেয় সেখানে। আর উম্মে আরারাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে কায়রো অভিমুখে রওনা হয় কমাণ্ডো বাহিনী।

ভোর বেলা।

মেলার রওনক শেষ হয়ে গেছে। রাতভর মদপান করে এখনও অচেতন পড়ে আছে বহু লোক। দোকানীরা যাওয়ার জন্য মালামাল গুটিয়ে নিচ্ছে। মেয়ে-বেপারীরাও যাচ্ছে চলে। মেলাঙ্গন থেকে বের হওয়ার জন্য মরুবাসীদের ভীড় পড়ে গেছে রাস্তায়।

আংগুক গোত্রের লোকেরা অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে কখন তাদের মাঝে বলী দেয়া মেয়ের চুল বিতরণ করা হবে।

এ গোত্রের যারা দূর-দূরান্তের পল্লি অঞ্চলে বাস করে, তারা এক নাগাড়ে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেবপুরীর প্রতি তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধ ও প্রবীণরা নবীনদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, একটু অপেক্ষা করো, পুরোহিত এক্ষুনি চলে আসবেন, দেবতাদের সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করবেন এবং আমাদের মাঝে চুল বিতরণ করবেন। কিন্তু দেবতাদের কোন পয়গাম যে আসবে না, তা কেউ জানে না।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। দেবতাদের কোন সংবাদ আসছে না। সংশয়ে পড়ে যায় এক শ্রেণীর যুবক। সব মিথ্যা বলে সন্দেহ জাগে তাদের মনে। কিন্তু কারুর এতটুকু সাহস নেই যে, ওখানে গিয়ে দেখে আসবে, পুরোহিত আসছেন না কেন।

❖ ❖ ❖

'ডাক্তারকে ডেকে আন। মেয়েটা নেশার ঘোরে এমন করছে।' বললেন সুলতান আইউবী।

উম্মে আরারা সুলতান আইউবীর সামনে বসে আছে এবং বিড় বিড় করে বলছে— 'আমি আঙ্গুকের মা। তুমি কে? তুমি তো দেবতা নও। আমার স্বামী কোথায়? আমার মাথাটা কেটে ফেলো এবং দেবতাকে দিয়ে দাও; আমাকে আমার ছেলেদের জন্য উৎসর্গ করো।'

অনর্গল বকে যাচ্ছে উম্মে আরারা। নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন সে। মাথাটা দুলছে তার।

ডাক্তার আসেন। মেয়েটির অবস্থা দেখেই তিনি সব বুঝে ফেলেন। সামান্য ঔষধ খাইয়ে দেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার চোখ দু'টো বুজে আসে। বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে উম্মে আরারা।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন আইউবী। অভিযান চালিয়ে সেই পার্বত্য অঞ্চলে কী কী পাওয়া গেলো, তা-ও শোনানো হলো তাঁকে। সুলতান আইউবী নায়েব সালার আন-নাসের ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদকে নির্দেশ দেন, পাঁচশত সৈন্য নিয়ে আপনারা এক্ষুনি রওনা হন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিন। মূর্তিটিকে ধুলায় মিশিয়ে দিন। জায়গাটিকে ঘেরাও করে রাখুন। আক্রমণ আসলে মোকাবেলা করবেন। এলাকার মানুষ যদি নতি স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে স্থানটি দেখিয়ে মমতার সাথে বুঝিয়ে দেবেন, এ ছিলো স্রেফ প্রতারণা।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন-

'পাঁচশত সৈন্য নিয়ে আমরা ওখানে পৌঁছি। পূর্ব থেকে আমাদের যে বাহিনীটি ওখানে অবস্থান নিয়েছিলো, তার কমাণ্ডার আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। হাজার হাজার সুদানী কাফ্রী দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কেউ কেউ উট-ঘোড়ায় সওয়ার। হাতে তাদের বর্শা, তরবারী ও কামান-ধনুক।

আমাদের সমুদয় সৈন্যকে আমরা সেই পার্বত্য অঞ্চলের চারদিকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেই যে, তাদের মুখ বাইরের দিকে। তারা তীর-ধনুক বর্শা নিয়ে প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছিলাম।

আমি আন-নাসেরের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করি। মূর্তিটি দেখেই আমি বললাম, এতো ফেরাউনদের প্রতিকৃতি।

আশে-পাশে পড়ে আছে হাবশীদের লাশ। আমরা পুরো এলাকা ঘুরে-ফিরে দেখি। দু'টি পাহাড়ের মাঝে একটি জীর্ণ প্রাসাদ। ফেরআউনী আমলের একটি মনোরম প্রাসাদ এটি। দেয়ালের গায়ে সে যুগের কিছু লিপি। আমাদের সন্দেহ রইলো না, এখানে ফেরআউনের-ই বাস ছিলো।

দেয়ালের মত খাড়া একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি ঝিল। ঝিলে অনেকগুলো কুমীর। পাহাড়ের কোল ঘেষে পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে গেছে ঝিলের পানি। পানির উপর পাহাড়ের ছাদ। বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। আমাদের দেখে সবগুলো কুমীর এসে পড়ে কূলে। চেয়ে চেয়ে আমাদের দেখতে থাকে।

আমি সৈনিকদের বললাম, হাবশীদের লাশগুলো ধরে ধরে ঝিলে নিক্ষেপ করো; ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলোর ভাল আহার মিলবে। সৈনিকরা লাশগুলোকে টেনে-হেঁচড়ে ঝিলে নিক্ষেপ করে। কুমীরের সংখ্যা যে কতো, তার হিসেব নেই।

ফেলা মাত্র দেখলাম, লাশগুলো যেন দৌড়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে গেলো। সব শেষে আসলো পুরোহিতের লাশ। বহু মানুষকে সে কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করেছিলো। আর আজ সে নিজে-ই নিক্ষিপ্ত হলো সেই কুমীরের মুখে।

দু'জন সিপাহী চারটি সুদানী মেয়েকে ধরে আনে। তারা এক স্থানে লুকিয়ে ছিলো। মেয়েগুলো বিবস্ত্র। কোমরে বাঁধা দু'টি পাতা। একটি সামনে, অপরটি পিছনে। আমি ও নাসের অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সৈনিকদের বললাম, জলদি এদের ঢাকো। সৈনিকরা তাদের পোশাক পরায়। এবার আমরা তাদের পাণে তাকালাম। মেয়েগুলো বেশ রূপসী। তারা কাঁদছে। ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে। তারা অভয় পেয়ে কথা বলে। খুলে বলে সেখানকার সব ইতিবৃত্ত। বড় লজ্জাকর সেসব ঘটনা। নারী জাতির এ অবমাননা কোন মুসলমানের সহ্য হওয়ার কথা নয়। আপন-পর, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম সব নারীকে সমান ইজ্জত করে। একজন মুসলমানের নিকট একজন মুসলিম নারীর যে মর্যাদা, একজন অমুসলিম নারীর মর্যাদা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যা হোক, মেয়েগুলোর বক্তব্যে আমরা বুঝলাম যে, তারা ফেরআউনদের খোদা বলে বিশ্বাস করে। তাদের গোত্রের মানুষ মানুষকে খোদা মানে।

স্থানটি বেশ মনোরম। সবুজ-শ্যামলিমায় ঘেরা সমগ্র এলাকা। ভেতরে পানির ঝরনা। এই ঝরনার পানি থেকেই ঝিলের উৎপত্তি। ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ছায়া দিয়ে রেখেছে। কোন এক সৌখিন ফেরআউনের স্থানটি পসন্দ হয়ে গেলে একে সে বিনোদপুরি বানিয়েছিলো। নিজের খোদায়িত্বের প্রমাণস্বরূপ তৈরী করেছিলো এ মূর্তিটি। নির্মাণ করেছিলো পাতাল-কক্ষ। বহুদিন আমোদ করে গেছে সে এখানে।

অবশেষে এক সময় দিন বদলে যায়। খসে পড়ে ফেরআউনদের ক্ষমতার নক্ষত্র। মিসরে আসে আরেক মিথ্যা ধর্ম। কেটে যায় কিছু দিন। সবশেষে জয় হয় সত্যের। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মুখরিত ধ্বনি শুনতে পায় মিসর। আল্লাহর সমীপে মাথা নত করে মিসরের মানুষ। কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মিথ্যা তখনো টিকে থাকে এই পার্বত্য অঞ্চলে। আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্, মহান আল্লাহ'র অপার কৃপায় আমরা মিথ্যার এই শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেললাম। মূর্তিপূজাসহ জঘন্যতম কুসংস্কার থেকে এ ভূখণ্ডটিকে পবিত্র করলাম।

সৈন্যরা স্থানটিকে ঘিরে ফেলে। প্রস্তর-নির্মিত বেদীটি ভেঙ্গে চুরমার করে। চবুতরাটিও গুড়িয়ে দেয়। পাতাল-কক্ষটি ভরে দেয় ইট-পাথর দিয়ে। বাইরে

হাজার হাজার হাবশী বিস্ময়াভিভূত দাঁড়িয়ে কাণ্ড দেখছে। ডেকে তাদেরকে ভিতরে নিয়ে দেখান হয়, এখানে কিছু-ই ছিলো না। বলা হয়, ধর্ম-বিশ্বাসের নামে তোমাদের সাথে এতোকাল শুধু প্রতারণা-ই করা হয়েছে। মেয়ে চারটিকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হলো। মেয়েদের বাপ-ভাইরাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। আপন আপন কন্যা ও বোনকে নিয়ে যায় তারা। তাদেরকে বলা হলো, এখানে একজন অসৎ লোক বাস করতো। ধর্মের নামে নারীর ইজ্জত ও মানুষের জীবন নিয়ে তামাশা করতো সে। এখন সে কুমীরের পেটে। এই হাজার হাজার হাবশীকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশে কমাণ্ডার বক্তৃতা করেন তাদের ভাষায়। তারা সকলে-ই নীরব। তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়। এবারও তাদের মুখে কোন কথা নেই। কখনো কখনো মনে হচ্ছিলো, রক্ত নেমে এসেছে তাদের চোখে। প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে মরছে যেন তারা। অবশেষে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়— 'যদি তোমাদের সত্য খোদাকে দেখার ইচ্ছে থাকে, তাহলে এসো দেখিয়ে দিই। আর এখন তোমরা যে স্থানে বসে আছো, যদি তাকে মিথ্যা দেব-দেবীর আবাস মনে করে থাকো, তা-ও বলো; এই পাহাড়গুলোকেও আমরা ধুলোয় মিশিয়ে দিই। তার পরে তোমরা দেখবে কোন্ খোদা সত্য।

জ্ঞান ফিরে এসেছে উম্মে আরারার। মেয়েটি সুলতান আইউবীকে সে নিজের সব ঘটনা খুলে বলে। চৈতন্য ফিরে আসার পর এবার তার সব ঘটনা-ই মনে আসে। সে বলে, পুরোহিত দিন-রাত যখন-তখন তাকে উপভোগ করতো। বারবার একটি ফুল শোঁকাত তার নাকে। বলি দেয়ার কথাও পুরোহিত বলে রেখেছিলো তাকে। কমাণ্ডো বাহিনী যথাসময়ে গিয়ে না পৌঁছুলে এখন তার মস্তক থাকতো গর্তে আর দেহ থাকতো কুমীরের পেটে। ভয়ে কাঁপতে লাগলো মেয়েটি। চোখে অশ্রু নেমে আসে তার। সুলতান আইউবীর হাতে চুমো খেয়ে বললো, 'আল্লাহ আমাকে আমার পাপের শাস্তি দিয়েছেন। আমি জীবনে বহু পাপ করেছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।' মানসিকভাবে বড় বিধ্বস্ত উম্মে আরারা।

সিরিয়ার এক বিত্তশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে উম্মে আরারা জানায়, আমি তার কন্যা। লোকটি মুসলমান। বিখ্যাত ব্যবসায়ী। সিরিয়ার আমীরদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

তৎকালে আমীরগণ একটি শহর কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করতো। কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে কাজ করতো তারা। দশম শতাব্দীর পর এই আমীরগণ সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতায় ডুবে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা তাদের সঙ্গে ব্যবসা করতো এবং সুদও গ্রহণ করতো। সুন্দরী

মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের হেরেম। তারা নারী আর মদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

উম্মে আরারাও এমনি এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কন্যা। বার-তের বছর বয়সেই সে পিতার সঙ্গে আমীরদের নাচ-গানের আসরে যোগ দিতে আরম্ভ করে। অসাধারণ সুন্দরী বলে-ই বোধ হয় পিতা শৈশব থেকে-ই তাকে আমীরদের কালচারে অভ্যস্ত করে তুলতে শুরু করেছিলো।

উম্মে আরারাহ জানায়— 'আমার বয়স যখন চৌদ্দ, তখন-ই আমীরগণ আমার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। দু'জন আমীর আমাকে বহু-মূল্যবান উপহারও দিয়েছিলেন। আমি নিজেকে পাপের হাতে তুলে দেই। ষোল বছর বয়সে পিতার অজান্তে গোপনে রক্ষিতা হয়ে যাই এক আমীরের। কিন্তু বাস করতাম নিজের ঘরে।'

বিত্তশালী পিতার কন্যা উম্মে আরারা। ঐশ্বর্যের মাঝে তার জন্ম, লালন-পালন ও যৌবন লাভ। লাজ-লজ্জার সঙ্গে কোন পরিচয় ছিলো না তার। তিন বছরের মাথায় পিতার হাত থেকে বেরিয়ে যায় সে। স্বাধীন চিত্তে আরো দু'জন আমীরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নেয়। বাক্‌পটু রূপসী কন্যা হিসেবে উম্মে আরারার নাম এখন সকলের মুখে মুখে।

অবশেষে পিতা তার সঙ্গে সমঝোতা করেন। পিতার সহযোগিতায় তিনজন আমীর তাকে নতুন এক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। ইসলামী সাম্রাজ্য ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই তিন আমীর। উম্মে আরারার পিতাও এই ষড়যন্ত্রে জড়িত। খেলাফতের মূলোৎপাটন করার কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে উম্মে আরারাকে। এক সময়ে এক খৃষ্টানও এসে যোগ দেয় এ প্রশিক্ষণে।

স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন এই আমীরগণ। এর জন্যে প্রয়োজন খৃষ্টানদের সহযোগিতা। নুরুদ্দীন জঙ্গী ও খেলাফতের মাঝে ভুল-বুঝাবুঝির কাজে ব্যবহার করা হয় উম্মে আরারাকে। এ অভিযানে তিন খৃষ্টান মেয়েকে যুক্ত করে একটি টিম গঠন করে ক্রুসেডাররা।

কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে উম্মে আরারাকে তারা উপহারস্বরূপ খলীফা আল-আজেদের খেদমতে প্রেরণ করে। তার দায়িত্ব, প্রথমত খলীফার অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা এবং সাবেক সুদানী ফৌজের যে ক'জন অফিসার এখনো বাহিনীতে রয়ে গেছে, তাদেরকে খলীফার কাছে ভিড়িয়ে সুদানীদেরকে আরেকটি বিদ্রোহের প্রতি উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত সুদানী ফৌজকে বিদ্রোহে নামিয়ে অস্ত্র ও নানাবিধ উপায়ে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য খলীফাকে প্রস্তুত করা এবং সম্ভব হলে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর একটি দলকে প্ররোচনা দিয়ে বিদ্রোহী বানিয়ে তাদেরকে সুদানীদের সঙ্গে যুক্ত

করা। খলীফা আর কিছু করতে না পারলেও তাকে দিয়ে অন্তত এতটুকু করানো যে, নিজের নিরাপত্তা বাহিনীকে সুদানীদের হাতে অর্পণ করে নিজে সুলতান আইউবীর নিকট চলে যাবেন এবং তাকে বলবেন, আমার রক্ষী বাহিনী বিদ্রোহী হয়ে গেছে। সারকথা, সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে এমন একটি যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যা তাকে মিসর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবনটা তার একঘরে হয়ে কাটাতে হয়।

উম্মে আরারাহ সুলতান আইউবীকে জানায়, সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে তার জন্ম হয়েছিলো। কিন্তু পিতা তাকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র-ই মূলোৎপাটনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের আমীরগণ শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে আপন সাম্রাজ্যের পতনের কাজে-ই ব্যবহার করে।

রূপ-যৌবন, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও বাকচাতুর্যে অল্প ক'দিনে খলীফাকে নিজের মুঠোয় নিয়ে আসে উম্মে আরারা। সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে সে খলীফাকে। রজবকে-ও জড়িত করে নেয় এ ষড়যন্ত্রে। আরো দু'জন সামরিক কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে আইউবীর বিরুদ্ধে মাঠে নামে রজব। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীতে মিসরীদের বাদ দিয়ে সুদানীদের টেনে আনতে শুরু করে সে।

উম্মে আরারা খলীফার মহলে এসেছে দু'-আড়াই মাস হলো। এই স্বল্প সময়ে-ই সে রাণী হয়ে গেছে মহলের। গোটা কসরে খেলাফত এখন ওঠে-বসে তার-ই ইঙ্গিতে।

উম্মে আরারা সুলতান আইউবীকে আরো জানায়, খলীফা আপনাকে হত্যা করাতে চান। হাশীশীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হত্যার আয়োজন সম্পন্ন করেছে রজব।

ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা এবং বিলাস-প্রিয়তায় বিরক্ত হয়ে সুলতান আইউবী খলীফার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিয়েছিলেন আগেই। এর মধ্যে কাকতালীয়ভাবে ঘটে গেলো এসব ঘটনা। খলীফা যাদের দ্বারা সুলতান আইউবীকে কোণঠাসা করাতে চেয়েছিলেন, তাদের-ই হাতে মহলের রাণী উম্মে আরারার অপহরণ এবং আইউবীর হাতে তার উদ্ধারের মধ্য দিয়ে দৈবাৎ ফাঁস হয়ে গেলো অনেক তথ্য। অবশেষে সুলতান কর্তৃক আইউবীর হত্যার ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাও গোপন রইলো না। উম্মে আরারার অপহরণকে কেন্দ্র করে-ই ইতিমধ্যে সুলতান আইউবী খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে বদলি করে দিয়েছেন রজবকে। তার স্থলে প্রেরণ করেছেন নিজের বিশ্বস্ত এক নায়েব সালারকে। কিন্তু এসব ঘটনা সুলতান আইউবীর জন্য জন্ম দেয় নতুন এক বিপদ।

উম্মে আরারাকে নিজের আশ্রয়ে রাখলেন সুলতান। অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরছে মেয়েটি। অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে। ভয়াবহ এক বিপদে ফেলে আল্লাহ তার চোখ খুলে দিয়েছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেবেন, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছেন সুলতান আইউবী।

ফেরআউনদের শেষ চিহ্ন ধুলোয় মিশিয়ে পরদিন আন-নাসের ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ফিরে আসেন কায়রো।

❖ ❖ ❖

আট দিন পর।

রাতের শেষ প্রহর। ঘুমিয়ে আছেন সুলতান আইউবী। চাকর এসে তাঁকে জাগিয়ে বলে, আন-নাসের, আলী বিন সুফিয়ান এবং আরো দু'জন নায়েব এসেছেন। ধড় মড় করে উঠে বৈঠকখানায় ছুটে যান সুলতান। অভ্যাগতদের একজন এক টহল বাহিনীর কমাণ্ডার।

সুলতান আইউবীকে জানানো হলো, প্রায় ছয় হাজার সুদানী সৈন্য মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করে একস্থানে শিবির স্থাপন করেছে। তাদের মধ্যে আছে পদচ্যুত সুদানী বাহিনীর কিছু সদস্য এবং কাফ্রী গোত্রের বেশ কিছু লোক। এই কমাণ্ডার তথ্য জানার জন্য ছদ্মবেশে দু'জন উষ্ট্রারোহীকে তাদের ছাউনিতে প্রেরণ করেছিলো। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক কায়রো আক্রমণ করা তাদের উদ্দেশ্য। নিজেদেরকে পর্যটক দাবি করে উষ্ট্রারোহীদ্বয় বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলে এবং এই বলে ফিরে আসে যে, এ অভিযানকে সফল করার জন্য প্রয়োজনে তারা সৈন্য দিয়ে তাদের সাহায্য করবে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক তারা এদিক-ওদিক থেকে আরো সৈন্য আগমনের অপেক্ষা করছে এবং আগামী কাল-ই সেখান থেকে কায়রো অভিমুখে রওনা হবে।

সব শুনে সুলতান আইউবী আদেশ করলেন, খলীফার নিরাপত্তা বাহিনীতে মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য আর একজন কমাণ্ডার রেখে অন্যদের ছাউনিতে ডেকে আনো। খলীফা আপত্তি জানালে বলবে, এ আমার আদেশ।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, আপনার ব্রাঞ্চের সুদানী ভাষায় পারদর্শী এমন একশত লোককে সুদানী বিদ্রোহী বেশে এই কমাণ্ডারের সঙ্গে এক্ষুনি রওনা করিয়ে দিন। কমাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, এ একশত লোক ঐ দু' উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে সুদানী বাহিনীতে গিয়ে যোগ দেবে। উষ্ট্রারোহী সান্ত্রী দু'জন বলবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা তোমাদের সাহায্য নিয়ে এসেছি। তাদেরকে বলে দেবে, যেন তারা বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে

আমাদের অবহিত করে এবং রাতে তাদের পশু ও রসদ কোথায় থাকে, তা চিহ্নিত করে রাখে। সুলতান আইউবী আন-নাসেরকে বললেন, আপনি অতি দ্রুতগামী অশ্বারোহী, কমাণ্ডো বাহিনী এবং ক্ষুদ্র একটি মিনজানিক প্লাটুন প্রস্তুত করে রাখুন।

'আমি ভেবেছিলাম, সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে শহর থেকে দূরে থাকতে-ই ওদের শেষ করে দেবো।' বললেন আন-নাসের।

'না, মনে রেখো নাসের! দুশমনের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা কম হলেও মুখোমুখি সংঘাত এড়িয়ে চলবে। রাতে কমাণ্ডো বাহিনী ব্যবহার করবে, দুশমনের উপর অতর্কিতে হামলা চালাবে। পার্শ্ব থেকে, পিছন থেকে আঘাত হেনে পালিয়ে যাবে। দুশমনের রসদ নষ্ট করবে, পশু ধ্বংস করবে। তাদের অস্থির করে রাখবে ও শত্রু বাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেবে না। ডানে-বাঁয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য করবে। মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হতে হলে মনে রাখবে, রণাঙ্গন মরুভূমি। সর্বপ্রথম পানির উৎস দখল করবে। সূর্য এবং বায়ুকে তাদের প্রতিকূলে রাখবে। তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে নিজের যুৎসই জায়গায় নিয়ে যাবে। মনে রাখবে, সুদানীদের কায়রো পর্যন্ত পৌছার কিংবা আমাদের সৈন্যদেরকে মুখোমুখি লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলার স্বপ্ন আমি পূরণ হতে দেবো না।

সুলতান আইউবী আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, যে একশত সৈন্যকে সুদানী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পাঠাবে, তাদের বলে দেবে, যেন তারা ছাউনিতে গুজব ছড়ায়, 'ছয়-সাত দিনের মধ্যে সালাহুদ্দীন আইউবী ফিলিস্তীন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। কাজেই আমাদের ক'টা দিন অপেক্ষা করে তাঁর অনুপস্থিতির সময়টাতে কায়রো আক্রমণ করতে হবে।'

এমনি বেশ কিছু আদেশ-নির্দেশনা দিয়ে সুলতান আইউবী বললেন, আজ আমি কায়রো থাকবো না। কায়রো থেকে বেশ দূরের একটি জায়গার নাম বললেন তিনি। সেখানে তিনি দুশমনের কাছাকাছি তার হেডকোয়ার্টার রাখতে চান; যাতে সরাসরি নিজে যুদ্ধের তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

বৈঠকখানায়-ই ফজর নামায আদায় করেন সকলে। সুলতান আইউবীর পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে যায়। প্রস্তুতির জন্য সুলতান নিজ কক্ষে চলে যান।

সুদানীদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ইতিপূর্বে তাদের একটি বিদ্রোহ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো দু' বছর হলো। আবার বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুতি

শুরু করে দিয়েছিলো তখন থেকেই। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলো খৃষ্টানরা। বিপুলসংখ্যক গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলো তারা মিসরে। একদিন যে সুদানীরা কায়রো আক্রমণ করবে, তা ছিলো সুনিশ্চিত। কিন্তু তা এতো তাড়াতাড়ি, এমন আচম্বিত হয়ে যাবে, তা ভাবেননি সুলতান আইউবী। হাবশী গোত্রের উপর সুলতান আইউবীর সামরিক অভিযানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো সুদানীরা। তার-ই প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে তার এই আকস্মিক সেনা অভিযান। হাবশীদের উপর আইউবীর সামরিক অভিযানের পর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে-ই তারা সেনা সমাবেশ ঘটায় এবং কায়রো আক্রমণের জন্য রওনা হয়।

দু' উষ্ট্রারোহীর সঙ্গে একশত সশস্ত্র মুসলিম সেনা যখন সুদানী বাহিনীতে যোগ দেয়, সুদানীরা তখন মিসর সীমান্ত থেকে বেশ ভিতরে পৌঁছে গিয়ে ছাউনী ফেলেছে। সুলতান আইউবী রাতে শহর ত্যাগ করে এমন স্থানে চলে যান, যেখান থেকে সুদানীদের গতিবিধির খবর নেয়া ছিলো নিতান্ত সহজ। সুদানী বাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী আইউবীর সেনারা কর্মকর্তাদের জানায়, সুলতান আইউবী কয়েকদিনের মধ্যে ফিলিস্তীন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। এ সংবাদ শুনে সুদানী সেনা কর্মকর্তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আইউবীর অনুপস্থিতির সময়টিতে-ই তারা কায়রো অভিযান পরিচালিত করবে বলে স্থির করে। ফলে এ ছাউনী আরো দু' দিন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিন রাত থেকে সুলতান আইউবীর নিকট তাদের খবরা-খবর আসতে শুরু করে।

তারও পরের রাতে সুলতান আইউবী পাঁচটি মিন্‌জানিক, বেশ কিছু অগ্নিগোলা ও অগ্নিতীর দিয়ে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করেন।

মধ্য রাত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সুদানী বাহিনী। এমন সময়ে তাদের রসদ-ডিপোতে অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। পরক্ষণেই ছুটে আসতে শুরু করে অগ্নিতীর। ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখায় আলোকিত হয়ে ওঠে মধ্য রাতের নিঝুম শূন্য আকাশ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সুদানী বাহিনীতে। সঙ্গে সঙ্গে মিনজানিকগুলোকে সেখান থেকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যায় আইউবীর সেনারা। পঞ্চাশজন অশ্বারোহী তিন-চারটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটায় এবং সুদানী বাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্বের সৈন্যদের পায়ে পিষে এবং বর্শা দ্বারা দমাদম আঘাত হেনে চোখের পলকে উধাও হয়ে যায়। খাদ্য-সম্ভারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর আতঙ্কিত উট-ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছে। সুলতান আইউবীর সৈন্যরা এ ছাউনীতে আরো একবার হামলা চালায় এবং বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে হাওয়া হয়ে যায়।

পরদিন সংবাদ পাওয়া গেলো, আগুনে পুড়ে, ঘোড়া ও উটের পদতলে পিষ্ট হয়ে ও সুলতান আইউবীর কমাণ্ডো বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে অন্তত চারশত সুদানী সৈন্য নিহত হয়েছে। সমুদয় খাদ্যসম্ভার ও তীরের ডিপো পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।

অবশেষে সুদানী সৈন্যরা ছাউনী তুলে সেখান থেকে চলে যায় এবং রাতে এমন এক স্থানে শিবির স্থাপন করে, যার আশে-পাশে উঁচু উঁচু মাটির টিলা। কমাণ্ডো হামলার আশঙ্কা নেই এখানে। এবার টহল বাহিনী ছাউনীর চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত পাহারা দিতে শুরু করে। কিন্তু তারপরও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেলো না। তারা ঠিক আগের রাতের মত আক্রমণের শিকার হয়। দু'জন প্রহরীকে কাবু করে খুন করে ফেলে সুলতান আইউবীর কমাণ্ডোরা। টিলার উপর থেকে অগ্নিতীর ছুঁড়তে শুরু করে তীরান্দাজ বাহিনী। ভোরের আলো ফোটার পূর্ব পর্যন্ত এ হামলা চালিয়ে তারা উধাও হয়ে যায়। আক্রমণকারীরা কোত্থেকে এলো, কোথায়-ই বা গেলো কিছু-ই বুঝতে পারলো না সুদানী বাহিনী। এ হামলায় তারা গত রাত অপেক্ষা বেশী ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

সন্ধ্যার পর আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবীকে গুপ্তচর মারফত প্রাপ্ত রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, সুদানী বাহিনী আমাদের কমাণ্ডো বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে এ্যাকশন নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা মোতাবেক তারা আগামী কাল-ই অভিযান পরিচালনা করবে। সুলতান আইউবী একটি রিজার্ভ ফোর্স আটকে রেখেছিলেন নিজের কাছে। গত দু' রাতের অভিযানে অংশ নেয়নি তারা। তিনি জানতেন, দু' একটি অপারেশনের পর দুশমন সতর্ক হয়ে যাবে। পর দিন তিনি সুদানী বাহিনীর ডানে ও বাঁয়ে চারশত করে পদাতিক বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদেরকে বলে দেন, যেন তারা সুদানী বাহিনী থেকে আধা মাইল দূর দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। সুদানীরা যখন দেখলো, শত্রু বাহিনীর দু'টি দল রণসাজে তাদের পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে চলছে, তখন তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শত্রুবাহিনী পিছন অথবা পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করতে পারে, এ আশঙ্কায় দু' পার্শ্বের সৈন্যদেরকে দু'দিকে ছড়িয়ে দেয় এবং সুলতান আইউবীর এ দু' পদাতিক বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

সুলতান আইউবীর নির্দেশনা মোতাবেক তারা সামনে এগিয়ে চলে। ধোঁকায় পড়ে যায় সুদানীরা। ঠিক এমন সময়ে আচমকা পাঁচশত অশ্বারোহী টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সুদানী বাহিনীর মধ্যস্থলে হামলা করে বসে।

অশ্বারোহীদের এ আকস্মিক তীব্র আক্রমণে প্রলয় সৃষ্টি হয়ে যায় সমগ্র বাহিনীতে। পার্শ্ব থেকে তীরান্দাজ বাহিনী বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়তে শুরু করে তাদের প্রতি। এভাবে সুলতান আইউবীর মাত্র তেরশত সৈন্য অন্তত ছয় হাজার শত্রুসেনাকে ক্ষণিকের মধ্যে বিপর্যস্ত করে তোলে। সু-কৌশলে গ্যাড়াকলে আটকিয়ে এমন শোচনীয়ভাবে তাদের পরাজিত করে যে, মিসরের মরুপ্রান্তর তাদের লাশে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জীবনে রক্ষা পাওয়া সুদানীদের দু' চারজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বেশীর ভাগ-ই বন্দী হয় আইউবী বাহিনীর হাতে।

এ ছিলো সুদানীদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ, যাকে তাদের-ই রক্তে ডুবিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন সুলতান আইউবী।

বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য সংগ্রহ করেন সুলতান। গ্রেফতারকৃত সুদানী সব কমাণ্ডার এবং বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও সিপাহীদের তিনি কারাগারে প্রেরণ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত লোকদের নাম-পরিচয়ও পেয়ে যান সুলতান আইউবী। তিনি তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। রজব এবং তার মতো আরো যেসব সালার এই রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মতৎপরতায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলো, তাদেরকে আজীবনের জন্য জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হলো। এ ষড়যন্ত্র এমন কতিপয় কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার তথ্যও পাওয়া গেলো, যাদেরকে সুলতান আইউবীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত মনে করা হতো। এ তথ্য পেয়ে সুলতান আইউবী স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য সালার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের জানিয়ে দেন, এ পরিস্থিতিতে মিসরের প্রতিরক্ষা এবং সালতানাতের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করার জন্য এখনই আমাদের সুদান দখল করা একান্ত আবশ্যক।

সুলতান আইউবী খলীফা আল-আজেদের নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেন। খেলাফতের মসনদ থেকে খলীফাকে অপসারণ ঘোষণা দেন, এখন থেকে মিসর সরাসরি বাগদাদের খেলাফতের অধীনে পরিচালিত হবে। খেলাফতের একমাত্র মসনদ থাকবে বাগদাদে।

সুলতান আইউবী আটজন রক্ষীর সঙ্গে উম্মে আরারাকে নুরুদ্দীন জঙ্গীর নিকট পাঠিয়ে দেন।

# ফিলিস্তীনের মেয়ে

গম্ভীর মুখে কক্ষে পায়চারী করছেন সুলতান আইউবী। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন–

'দেশের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং হয়েও যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন করছে শুধু জাতির কর্ণধারগণ। আমীর-উজীর-শাসক নামের বড় বড় জাতীয় নেতাদের তুমি দেখে থাকবে আলী! মিসরবাসীদের মুখে তো আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। জাতির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বড়রা। আমার সঙ্গে এই বড়দের শত্রুতা ব্যক্তিগত নয়। আমি তাদের স্বপ্নের মসনদ দখল করে আছি, এটাই তাদের অন্তর্জ্বালার কারণ।'

আলী বিন সুফিয়ান ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ বসে নিবিষ্টচিত্তে শুনছেন সুলতানের বেদনাভরা কথাগুলো।

সময়টি ছিল ১১৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের এক অপরাহ্ন বেলা। জুন-জুলাইয়ে বিদ্রোহ দমন করে সুলতান আইউবী সঙ্গে সঙ্গে আল-আজেদকে খেলাফতের মসনদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তার আগে তিনি সুদানীদের বিদ্রোহকে কৌশলে দমন করে সেনাবাহিনী থেকে সুদানী বাহিনীকে বিলুপ্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন বিদ্রোহী নেতা, কমান্ডার কিংবা সৈনিককে সাজা দেননি; কৌশলে কার্যসিদ্ধি করেছিলেন।

তারপর যখন তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখন সুলতান আইউবী এই উদ্ধত মস্তকগুলোকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য রণাঙ্গনে সুদানীদের লাশের স্তূপ তৈরি করেন। পদ-পদবীর তোয়াক্কা না করে তিনি গ্রেফতারকৃতদের কঠোর শাস্তি দেন। অধিকাংশকে জল্লাদের হাতে তুলে দেন আর অবশিষ্টদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন কিংবা দেশান্তর করে সুদান পাঠিয়ে দেন।

'দু' মাস হয়ে গেল, আমি রাজ্যের কোন খোঁজ নিতে পারছি না! এক একজন অপরাধী ধরে আনা হচ্ছে আর বিচার করে আমি তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে চলছি! দুঃখে আমার কলজেটা ছিঁড়ে যাচ্ছে আলী! মনে হচ্ছে, আমি গণহত্যা করছি। আমার হাতে যারা জীবন দিচ্ছে, তাদের অধিকাংশ-ই যে মুসলমান! বুক ফেটে কান্না আসতে চায় আমার।' আক্ষেপের সাথে বললেন সুলতান আইউবী।

মুখ খুললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ। বললেন–

'সম্মানিত আমীর! একজন কাফির এবং একজন মুসলমান একই অপরাধে লিপ্ত হলে শাস্তি মুসলমানের-ই বেশী পাওয়া উচিত। কাফিরের না আছে বুদ্ধি-বিবেক, না আছে

ধর্ম-চরিত্র। কিন্তু আল্লাহ্‌র দ্বীনের আলো পাওয়ার পরও একজন মুসলমান কাফিরের মত অপরাধ করা গুরুতর নয় কি? মুসলমানদের শাস্তি দিচ্ছেন বলে আপনি মর্মাহত হবেন না মহামান্য সুলতান! ওরা বিশ্বাসঘাতক, মুসলিম নামের কলংক। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিষফোঁড়া ওরা। ইসলামের নাম-চিহ্ন ধূলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য যারা কাফিরদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, এ জগতে মৃত্যুদন্ড-ই তাদের উপযুক্ত শাস্তি। পরকালে তাদের জন্য আছে জাহান্নাম।'

'শাদ্দাদ! আমার ব্যথা হল, মিসরে আমি শাসক হয়ে আসিনি। দেশ শাসন করার নেশা যদি আমার থাকত, তাহলে মিসরের বর্তমান পরিস্থিতি আমার সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু আমি জানি, ক্ষমতার লোভ মানুষকে অন্ধ করে তোলে। মসনদপ্রিয় মানুষ চাটুকার-চালবাজদের পসন্দ করে বেশী। কিছু-ই না দিয়ে মিথ্যা প্রলোভন আর মনভোলানো রঙ্গিন ফানুস দেখিয়ে-ই তারা মাতিয়ে রাখে জাতিকে। শয়তানী চরিত্রের মানুষকে তারা আমলা নিয়োগ করে। তারা অধীনদের রাজপুত্রের মর্যাদা দিয়ে রাখে। নিজে হয় শাহেনশাহ। ক্ষমতার মসনদ রক্ষা করা ব্যতীত তারা আর কিছু-ই বুঝে না।

তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ, তোমরা এই মসনদ আমার থেকে নিয়ে নাও। আমাকে শুধু তোমরা এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমার পথে তোমরা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আর কিছু চাই না আমি। যে লক্ষ্য নিয়ে আমি ঘর থেকে বের হয়েছি, আমায় সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে দাও। হাজারো জীবন কোরবান করে এবং আরব মুজাহিদদের রক্তে নীল নদের পানির রং পরিবর্তন করে নূরুদ্দীন জঙ্গী মিসর ও সিরিয়াকে একীভূত করেছেন। এই ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। সুদানকে মিসরের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফিলিস্তীনকে মুক্ত করতে হবে ক্রুসেডারদের হাত থেকে। ইউরোপের ঠিক মধ্যাঞ্চলের কোথাও নিয়ে কোণঠাসা করে রাখতে হবে খৃষ্টানদের। এসব বিজয় আমাকে অর্জন করতে হবে আমার শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়– আল্লাহর রাজ্যে তাঁর-ই শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মিসর যে পাঁকে জড়িয়ে রেখেছে আমায়! আমাকে তোমরা মিসরের এমন একটি ভূখন্ড দেখাও, যা ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও গাদ্দারী থেকে মুক্ত!' আপ্লুতকণ্ঠে বললেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

'এইসব ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছে খৃষ্টানরা। কত জঘন্যভাবে ওরা ওদের মেয়েদেরকে বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে! ভাবলে আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। ওরা ওদের চুম্বকার্ষক রূপ আর চাটুবাক্য দিয়ে ঘায়েল করছে আমাদের শাসকদের।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'ভাষার আঘাত তরবারীর আঘাতের চেয়েও মারাত্মক আলী! আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর খৃষ্টান মেয়েরা তোমার দুর্বলতা বুঝে এমন ধারায়, এমন ক্ষেত্রে, এমন যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করবে যে, মোমের মত গলে গিয়ে তুমি তোমার তরবারী কোষবদ্ধ করে দুশমনের পায়ে অর্পণ করবে। খৃষ্টানদের অস্ত্র হল দু'টি।

ভাষা আর পশুবৃত্তি। মানবীয় চরিত্র ধ্বংস করে আমাদের মধ্যে এই পশুবৃত্তি ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য ওরা সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ব্যবহার করছে। এই অস্ত্র ব্যবহার করে-ই ওরা আমাদের মুসলিম আমীর-শাসকদের হৃদয় থেকে ইসলামী চেতনাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।' বললেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

'শুধু আমীর-শাসক-ই নন সুলতান! মিসরের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই অশ্লীলতার বিষবাষ্প মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ অভিযানে খৃষ্টানরা সফল। অর্থশালী মুসলিম পরিবারগুলোতেও এই বেহায়াপনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'এটি-ই সর্বাপেক্ষা বড় আশংকা। খৃষ্টানদের সকল সৈন্য যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবু আমি তাদের মোকাবেলা করতে পারব; করেছিও। কিন্তু তাদের এই চারিত্রিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে পারব কিনা আমার ভয় হয়। মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যতপানে দৃষ্টিপাত করলে আমি শিউরে উঠি। তখন আমার কাছে মনে হয়, যদি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এ ধারা রোধ করা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে মুসলমান হবে নামমাত্র মুসলমান। তাদের মধ্যে ইসলামের নীতি-আদর্শ, সংস্কৃতি-চরিত্র কিছুই থাকবে না। খৃষ্টান সভ্যতা-সংস্কৃতি লালন করে মুসলমানরা গর্ববোধ করবে। প্রকৃত ইসলাম বলতে তাদের মধ্যে কিছুই থাকবে না।

মুসলমানদের দুর্বলতাগুলো আমার জানা আছে। মুসলমান শত্রু চিনে না। তারা শত্রুর পাতা আকর্ষণীয় জালে সরলমনে আটকে যায়।

পাশাপাশি খৃষ্টানদের দুর্বলতাগুলোও আমার অজানা নয়। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তা সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু ভিতরে তাদের মনের মিল নেই। ফরাসী-জার্মানী একে অপরের দুশমন। বৃটিশ-ইতালীয়রা একে অপরের অপছন্দ। মুসলমান তাদের সকলের শত্রু বলেই কেবল এই ইস্যুতে তারা একতাবদ্ধ হয়েছে। অন্যথায় তাদের পারস্পরিক বিরোধ শত্রুতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। তাদের ফিলিপ অগাস্টাস একজন কু-জাত ব্যক্তি। অন্যরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তারা মুসলিম শাসকদেরকে নারীর রূপ ও হিরা-মাণিক্যের চমক দেখিয়ে অন্ধ বানিয়ে রেখেছে। মুসলিম শাসকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাড়া দিলে ওরা পালাবার পথ পাবে না।

ফাতেমী খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে আমি শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। মসনদ পুনর্দখলের জন্য ফাতেমীরা সুদানী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে। আমার জন্য এ এক নতুন সমস্যা।' বললেন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী।

'ফাতেমীদের কবিকে কাল মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

সালাহুদ্দীন আইউবী বললেন, আম্মারাতুল ইয়ামানীর কবিতা শুনে এক সময় আমিও আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু খৃষ্টানরা তার সেই ভাষা আর গীতিকে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করিয়ে ইসলামী চেতনাকে ভষ্ম করে দেয়ার চেষ্টা করেছে।'

আম্মারাতুল ইয়ামানী ছিল তৎকালের একজন নামকরা কবি। সে যুগে এবং তার আগেও সাধারণ মানুষ কবিদের প্রবল ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। অগ্নিঝরা কবিতার মাধ্যমে তারা সৈন্যদেরকে উজ্জীবিত করে তুলত। শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত জনতাকে। আম্মারাতুল ইয়ামানীও সে- মানের একজন কবি। এক সময় সে কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জিহাদী চেতনা জাগিয়ে তুলত।

কিন্তু পরবর্তীতে হতভাগাকে লোভে পেয়ে বসেছে। ফাতেমী খেলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করতে শুরু করে কবি আম্মারা।

সন্দেহবশতঃ আকস্মিকভাবে একদিন হানা দেওয়া হয় তার গৃহে। অনুসন্ধান করে এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, লোকটি কেবল ফাতেমী খেলাফতের-ই নিমকখোর নয়- খৃষ্টানদের বেতন-ভোগী চরও বটে। মিসরীদের হৃদয়ে নপুংসক ফাতেমী খেলাফতের প্রতি সমর্থন এবং সুলতান আইউবীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পুষত তাকে খৃষ্টানরা।

'জাতির বিবেক বলে খ্যাত কবিরা পর্যন্ত যখন শত্রুর বেতনভোগী, তখন জাতির জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা অবধারিত।' ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন সুলতান আইউবী।

কক্ষে প্রবেশ করে দারোয়ান। বলে, ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-আজেদের দূত সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইছেন।

সুলতানের কপালে ভাজ পড়ে যায়। ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করে বললেন, 'খেলাফত ছাড়া বুড়া আর আমার কাছে কি-ইবা চাইবে'। দারোয়ানকে বললেন, 'ওকে আসতে বল'।

আজেদের দূত কক্ষে প্রবেশ করে। বলে, 'খলীফা আপনাকে সালাম বলেছেন'।

'তিনি তো এখন আর খলীফা নন। দু' মাস হয়ে গেল, আমি তাকে বরখাস্ত করেছি। এখন আপন প্রাসাদে তিনি আমার বন্দী।' সুলতান বললেন।

'অপরাধ মার্জনা করবেন সুলতান! দীর্ঘদিনের অভ্যাস কিনা, তাই মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এসেছে। সালামান্তে আল-আজেদ বলেছেন, তিনি গুরুতর অসুস্থ, বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। কিন্তু আপনার সাক্ষাৎ তার একান্ত প্রয়োজন। আমীরে মুহতারাম দয়া করে একটু আসলে ভীষণ উপকার হবে।' দূত বলল।

খানিকটা ঝাঁঝ মেশানো কণ্ঠে সুলতান বললেন, এখনো তাহলে তিনি নিজেকে খলীফা-ই মনে করছেন। সে জন্যে-ই বুঝি আমাকে এই ডেকে পাঠানো, না!

'না, আমীরে মেসের! অবস্থা তার ভাল নয়। মহলের ডাক্তার আশংকা ব্যক্ত করেছেন। তিনি পুরনো এক রোগে ভুগছেন। চিন্তা ও রাগের সময় এ রোগ তার বেড়ে যায়। এখন তিনি রীতিমত শয্যাশায়ী।'

একটু থেমে দূত আরো বলে, 'আপনাকে তিনি একা যেতে বলেছেন; কি যেন গোপন কথা আছে, যা আপনি ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না।'

'তুমি যাও, আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সালাহুদ্দীন আইউবীর সব গোপন কথা-ই জানা আছে। তাকে বল গিয়ে গোপন কথা আল্লাহকে বলুক। আল্লাহ তাঁর অপরাধ ক্ষমা করুন।' বললেন সালাহুদ্দীন আইউবী।

নিরাশ মনে ফিরে যায় দূত।

সুলতান আইউবী দারোয়ানকে বললেন, 'ডাক্তারকে ডেকে আন'। আলী বিন সুফিয়ান ও বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের প্রতি তাকিয়ে সুলতান বললেন, 'আচ্ছা, লোকটি আমাকে একা যেতে বলল! কোন ষড়যন্ত্র আছে বোধ হয়। মহলে ডেকে নিয়ে আমাকে সে খুন করাতে চাইছে, এ আশংকা কি আমার অমূলক? আমার হাতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এখন কৌশলে তার প্রতিশোধ নেয়ার সাধ জাগা বিচিত্র কি?

'আপনি যাননি ভালো-ই করেছেন।' বললেন বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ। আলী বিন সুফিয়ানও সমর্থন করলেন।

ডাক্তার আসলে সুলতান বললেন, 'আপনি আজেদের নিকট যান। লোকটি দীর্ঘদিন যাবত গুরুতর অসুস্থ বলে শুনেছি। মনে হচ্ছে, তার ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। আপনি গিয়ে তাকে দেখুন, চিকিৎসা করুন। তবে হতে পারে প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যে; তিনি অসুস্থ নন। তা-ই যদি হয়, আমাকে জানাবেন।'

খলীফা থাকা অবস্থায় আল-আজেদ যে মহলটিকে খেলাফতের মসনদ হিসেবে ব্যবহার করতেন, ক্ষমতাচ্যুতির পর তাকে সে ভবনে-ই বাস করতে দেয়া হয়। মহলটিকে তিনি অপূর্ব এক বিলাস-ভবন বানিয়ে রেখেছিলেন। দেশ-বিদেশের সুন্দরী নারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল তার হেরেম। দাসীদের ভীড় লেগে থাকত সব সময়। হাজার হাজার মোহাফেজ বাহিনী প্রস্তুত থাকত সর্বক্ষণ। সেনা কমান্ডারগণ দরবারে আসলে বসবারও অনুমতি ছিল না– থাকতে হত হাতজোড় দাঁড়িয়ে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর বিপ্লব পাল্টে দেয় এ মহলের রূপ। আজেদ এখন খলীফা নন। একজন সাধারণ নাগরিকের মত এ মহলে জীবন যাপন করছেন তিনি। মহলের বিলাসোপকরণগুলো যেমন ছিল তেমন-ই পড়ে আছে সেখানে। সেনা কমান্ডার আর মোহাফেজ বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এখান থেকে। তবে একটি সেনাদল চোখে পড়ছে এখনো। এরা খলীফা আল-আজেদের মোহাফেজ নয়– বন্দী আজেদের প্রহরী। খেলাফতের এই মসনদটি ছিল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র, তাই এখন পাহারা বসিয়ে রাখা হয়েছে এখানে। আজেদ এখন নিজ মহলে আইউবীর বন্দী। বৃদ্ধ হৃদরোগের রোগী। ক্ষমতা হারাবার শোক, বার্ধক্য, মদ-মাদকতায় এখন তিনি শয্যাগত।

অল্প ক'দিনেই মরণাপন্ন হয়ে পড়ে লোকটি। দু'জন বিগত-যৌবনা মহিলা আর এক খাদেম সেবা-শুশ্রূষা করছে তার।

মহলের ডাক্তার বৃদ্ধকে ঔষধ খাইয়ে যান। ইত্যবসরে কক্ষে প্রবেশ করে দুই যুবতী। এক সময় তারা আল-আজেদের হেরেমের শোভা ছিল। একজন বৃদ্ধের হাত

নিজের মুঠোয় নিয়ে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে অবস্থা জানতে চায়। অপরজন বৃদ্ধের মুখমন্ডলে দু' হাতের পরশ দিয়ে তার সুস্থতার জন্য দু'আ দেয়। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দুই যুবতী। একজন বলে, আপনি আরাম করুন। আমরা আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। অপরজন বলল, আমরা সারাক্ষণ পাশের কক্ষে-ই থাকি। প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাবেন। যুবতীদ্বয় কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

আরো একরাশ বেদনা চেপে ধরে বৃদ্ধকে। আহ! বলে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পার্শ্বে দন্ডায়মান পৌঢ়া মহিলাদ্বয়কে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে এনে ক্ষীণ কণ্ঠে ভাঙ্গা স্বরে বলেন, 'মেয়ে দু'টো কেন এসেছে জান? ওরা দেখতে এসেছে আমি কবে মরব! ওরা শকুন। ওদের শ্যেণদৃষ্টি আমার সম্পদের উপর। অপেক্ষা শুধু আমার মৃত্যুর। তোমরা ছাড়া এখন আমার আপন আর কে আছে? কেউ নেই, একজনও নেই। ফাতেমী খেলাফতের শ্লোগান দিয়ে যারা আমাকে উস্কে দিয়েছিল, তারা এখন কোথায়?'

মৃতকল্প আজেদ নিজের বুকে হাত রেখে পার্শ্ব পরিবর্তন করেন। বড় কষ্ট হচ্ছে তার।

এ সময়ে দূত ফিরে এসে কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে, 'আমীরে মেসের আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।'

'আহ! হতভাগা, বদনসীব সালাহুদ্দীন! আমার এই মুমূর্ষু অবস্থায় একটিবার আসলে কি হত তোমার!' কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে অব্যক্ত কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ।

সালাহুদ্দীন আইউবীর না আসার ব্যাথায় বৃদ্ধের কষ্ট আরো বেড়ে যায়। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে থেমে থেমে বললেন, 'আমার সেবার জন্য এক সময়ে একপায়ে খাঁড়া থাকত যেসব দাসী-বাঁদী, হাত তালির শব্দ পাওয়া মাত্র ছুটে আসত যারা, তারা-ই এখন আমার মিনতিভরা ডাকেও আসে না, তা মিসরের আমীর সালাহুদ্দীন আইউবী আসবে কেন? এ আমার পাপের শাস্তি। এ শাস্তি আমাকে ভোগ করতে-ই হবে। আমার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রাও কেটে পড়েছে। তাদের কেউ এখন আর আসে না। তবে আসবে। আসবে আমার জানাযায়। তারপর মহলে ঢুকে হাতে ধরে যার যা ইচ্ছে নিয়ে যাবে। সকলের দৃষ্টি এখন আমার মৃত্যু আর আমার সম্পদের উপর!'

রোগযন্ত্রণা বেড়ে যায় আজেদের। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কোঁকাতে থাকেন তিনি। শুশ্রুষাকারী মহিলাদ্বয় ব্যথিত-হৃদয়ে শুনছে তার জীবনের অন্তিম কথাগুলো। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা তাদের নেই। চেহারায় তাদের কেমন যেন এক ভীতির ছাপ। যেন তারা আল্লাহর সেই গজবের ভয়ে ভীত, যা রাজাকে পথের ভিখারী আর ধনীকে ফকীরে পরিণত করে।

হঠাৎ– কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় তারা। চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায়। দেখে, অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে সাদা দাঁড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। অনুমতি পেয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন লোকটি। আজেদের শিরায় হাত রেখে সালাম করে বলেন, 'আমি মিসরের গভর্নর সালাহুদ্দীন আইউবীর প্রাইভেট ডাক্তার। আপনার চিকিৎসার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবীর এতটুকু মানবতাবোধও কি নেই যে, এসে আমাকে এক নজর দেখে যেত! ডেকে পাঠাবার পরও তো একটু আসল না!' বৃদ্ধ বললেন।

'সে ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে আপনার চিকিৎসার জন্য। তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, তাঁর ও আপনার মধ্যে যে অঘটন ঘটে গেছে, তারপর তিনি এখানে আসবেন না। দু'জনের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ হল, জীবন হারাল হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু আপনার রোগমুক্তির চিন্তা তাঁর আছে। অন্যথায় আপনার চিকিৎসা করার আদেশ তিনি আমাকে দিতেন না। এ অবস্থায় বেদনাদায়ক কোন কথা আপনি মনে আনবেন না। নতুবা চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না।' ডাক্তার বললেন।

চিকিৎসা আমার হয়ে গেছে। মনোযোগ সহকারে তুমি আমার একটি পয়গাম শুনে নাও। সালাহুদ্দীন আইউবীকে হুবহু শব্দে শব্দে পয়গামটি পৌঁছিয়ে দিও। আমার শিরা থেকে হাত সরিয়ে নাও। ইহজগতের সব হেকমত-বিজ্ঞান আর তোমার ঔষধ-পথ্যাদি থেকে আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাশ।

শোন ডাক্তার! সালাহুদ্দীন আইউবীকে বলবে, আমি তার শত্রু ছিলাম না– আমি শত্রুর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য আমার না আইউবীর, তা জানিনা, নিজের পাপের কথা স্বীকার করছি আমি এমন এক সময়ে, যখন এ জগতে আমি ক্ষণিকের মেহমান মাত্র। সালাহুদ্দীনকে বলবে, আমার হৃদয়ে সবসময়-ই তার প্রতি ভালবাসা ছিল এবং তার ভালবাসা হৃদয়ে বহন করেই আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার অপরাধ, আমি সোনা-রূপা, হিরা-মাণিক্য আর ক্ষমতার মোহ হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলাম, যা ইসলামের মর্যাদার উপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল।

আজ আমার মন থেকে সব নেশা দূর হয়ে গেছে। যারা সারাক্ষণ আমার পায়ে পড়ে থাকত, আমার দুর্দিনে সকলেই তারা কেটে পড়েছে। যে দাসীরা আমার আঙ্গুলের ইশারায় নাচত-গাইত, তারা আমার মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছে। আমার দরবারে নগ্নদেহে নাচত যেসব রূপসী মেয়ে, আমি এখন তাদের ঘৃণার পাত্র।

শোন ডাক্তার! মানুষের সবচে' বড় ভুল হল, মানুষ মানুষের দাসত্বে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর কথা ভুলে যায়। একদিন যে তার আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে, যেখানে কোন মানুষ মানুষের পাপের বোঝা বহন করবে না– মানুষ সে কথা বেমালুম ভুলেই যায়। বদমাশরা আমাকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন প্রকৃত খোদার ডাক এসে গেল, তখন সব হাকীকত আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে আজ আমি মুক্তির পথ খুঁজছি। শত্রুর প্রতারণার শিকার হয়ে যত পাপ আর যত অন্যায় করেছি, অবলীলায় সব স্বীকার করে দয়াময় আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাহুদ্দীনকে এমন কিছু বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে আমি মরতে চাই, যা বোধ হয় তার জানা নেই।

তুমি সালাহুদ্দীনকে বলবে, আমার মোহাফেজ বাহিনীর সালার রজব জীবিত আছে এবং সুদানের কোথাও আত্মগোপন করে আছে। যাওয়ার সময় সে আমাকে বলে

গিয়েছিল, ফাতেমী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সে সুদানী এবং আস্থাশীল মিসরীদের নিয়ে বাহিনী গঠন করবে এবং খৃষ্টানদের থেকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করবে।

সালাহুদ্দীনকে তুমি আরো বলবে, সে যেন নিজের রক্ষীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তাকে একাকী চলাফেরা করতে নিষেধ করবে। রাতে যেন অধিক সতর্ক থাকে। ফেদায়ীদের নিয়ে রজব তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আইউবীকে তুমি আরো বলবে, তোমার জন্য মিসর এক আগ্নেয়গীরি। যাদেরকে তুমি আপন বলে মনে করছ, তাদের অনেকে-ই তোমার শত্রু। যারা তোমার সুরে সুর মিলিয়ে বিস্তৃত ইসলামী সাম্রাজ্যের শ্লোগান দিচ্ছে, তাদের মধ্যে খৃষ্টানদের পোষ্য বিষধর সাপও আছে।

তার সামরিক বিভাগে ফয়জুল ফাতেমী পদস্থ একজন অফিসার। কিন্তু সে জানে না, সে-ও তার শত্রুদের একজন। রজবের ডান হাত সে। তার বাহিনীর তুর্কি, সিরীয় এবং আরব বংশোদ্ভূত কমান্ডার ও সৈন্যদের ব্যতীত আর কাউকে যেন সে বিশ্বাস না করে। এরাই শুধু তার ওফাদার এবং ইসলামের সংরক্ষক। মিসরী সৈন্যদের মধ্যে উভয় চরিত্রের লোক-ই আছে।

সালাহুদ্দীনকে বলবে, তুমি হয়ত জান না, সুদানী সৈন্যদের উপর যখন তুমি চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়েছিলে, তখন তোমার আক্রমণকারী বাহিনীতে দু'টি বাহিনীর দুই কমান্ডার তোমার নির্দেশনা লংঘন করে তোমার অভিযানকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তোমার নিবেদিতপ্রাণ তুর্ক ও আরব সৈন্যরা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে শেষ পর্যন্ত কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও তাদের কমান্ড অমান্য করে সুদানীদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অন্যথায় এই দুই কমান্ডার যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করে তোমাকে ব্যর্থ-ই করে দিয়েছিল বলা যায়।

মরণোন্মুখ ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-আজেদ মর মর কণ্ঠে থেমে থেমে কথা বলছেন। ডাক্তার এক-দু'বার তাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু হাতের ইশারায় তিনি ডাক্তারকে থামিয়ে দেন।

বৃদ্ধের মুখমন্ডল ঘামে ভিজে গেছে, যেন কেউ তার মুখে পানির ছিটা দিয়েছে। দুই মহিলা রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে দেয়। কিন্তু ঘাম যেন ফোয়ারার মত নির্গত হচ্ছে। এ অবস্থায় আজেদ আরো ক'জন প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তার নাম বললেন, যারা সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর হল ফেদায়ী, রহস্যময় উপায়ে হত্যাকান্ড ঘটানো যাদের একমাত্র কাজ। আজেদ মিসরে খৃষ্টানদের জেঁকে বসার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে বললেন–

আমি যাদের কথা বললাম, আইউবীকে বলবে, এদেরকে তুমি মুসলমান মনে কর না। এরা ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে। শোন ডাক্তার! সালাহুদ্দীনকে আরো বলবে, আল্লাহ তোমাকে কামিয়াব করুন এবং বিজয় দান করুন। তবে মনে রাখবে, আপনদের মধ্যে তোমার শত্রু দু'প্রকার। প্রথমতঃ তারা, যারা গোপনে তোমাকে ধোঁকা দিয়ে বেড়াচ্ছে,

দ্বিতীয়তঃ তারা, যারা খোশামোদ করতে করতে তোমাকে খোদার আসনে নিয়ে বসাবে। মনে রাখবে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুশমন প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা বেশী ভয়ংকর।

ডাক্তার! আইউবীকে আরো বলবে, শত্রুকে পরাজিত করে যখন তুমি নিশ্চিন্তে গদিতে বসবে, তখন আমার মত তুমিও উভয় জগতের রাজা হয়ে বস না যেন। নিরংকুশ রাজত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। মানুষ আল্লাহ্‌র অনুগত প্রতিনিধি মাত্র। এই মিসরে ফেরআউনের ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি দাও, আমার পরিণতি দেখ। নিজেকে এম্‌নি পরিণতি থেকে রক্ষা করে চল।'

ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে আজেদের। কণ্ঠে জড়তা এসে যায় তার। আরো কিছু বলতে চায় বৃদ্ধ। কিন্তু কথার পরিবর্তে কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে আসে গড়গড় শব্দ। মাথাট হেলে পড়ে একদিকে। ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-আজেদ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

মহলে আজেদের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার সুলতান আইউবীর নিকট সংবাদ পাঠান। এক কালের দোর্দন্ড প্রতাপশালী খলীফা আজেদ মারা গেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, তার মৃত্যুতে কাঁদছে না কেউ। জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যে দু' মহিলা তার পাশে ছিল, তাদেরকেই শুধু আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে দেখা গেল।

কয়েকজন কর্মকর্তাসহ মহলে প্রবেশ করলেন সুলতান আইউবী। বহিরাগত লোকজন আর দাসী-চাকরে গম্ গম্ করছে সমগ্র মহল। কারো মুখে শোকের ছায়া দেখতে পেলেন না সুলতান। সন্দেহে পড়ে যান তিনি। একজন সাবেক খলীফার মৃত্যু সংবাদে এলাম; কিন্তু অবস্থা দেখে তো এ মহলে কেউ মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে না! তা হলে বিষয়টা কী?

রক্ষী বাহিনীর কমান্ডারকে সুলতান আদেশ দিলেন, মহলের প্রতিটি কক্ষে ঘুরে দেখ. তল্লাশী চালাও। নারী-পুরুষ-যুবতী যাকে যেখানে পাও, বের করে বারান্দায় বসিয়ে রাখ। কাউকে মহলের বাইরে যেতে দেবে না। যত প্রয়োজন-ই দেখাক, কাউকে আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে দেবে না। সুলতান সমগ্র মহল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন।

সুলতান মৃত আজেদের কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু আশ্চর্য, একটি প্রাণীকেও শিয়রে বসে আজেদের জন্য কাঁদতে দেখলেন না তিনি। গোটা মহল নারী-পুরুষে পরিপূর্ণ। কিন্তু এতটুকু বিষাদের ছাপ নেই কারো মুখে। এক ফোঁটা অশ্রু পর্যন্ত নেই কারো চোখে।

ডাক্তার সুলতান আইউবীকে ইংগিতে নিভৃতে নিয়ে যান। আজেদের অন্তিম কথাগুলো শোনান। অবশেষে ডাক্তার অভিমত ব্যক্ত করেন, এই বিদায়ের মুহূর্তে একবার এসে আপনার তাকে দেখে যাওয়া উচিত ছিল। সুলতান বললেন, উচিত ছিল অস্বীকার করি না। তবে আসিনি দু'টি কারণে। প্রথমতঃ লোকটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তার এই ডেকে পাঠানোকে আমি ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে সন্দেহ

করেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ 'ঈমান-বিক্রেতা' বলে তার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। একজন বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য ব্যক্তিকে দেখতে আসায় আমার মন চাচ্ছিল না।

ডাক্তারের মুখে আল-আজেদের শেষ কথাগুলো শুনে অনুশোচনায় ফেটে পড়েন আইউবী। অস্থির-চিত্তে বললেন, 'হায়! না এসে তাহলে ভুল-ই করলাম! আসলে বোধ হয় তার মুখ থেকে আরো অনেক গোপন তথ্য বের করতে পারতাম। তাকে কোন গোপন কথা বুকে চেপে কবরে যেতে দিতাম না!'

বেশ ক'জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, আল-আজেদ বিলাসপ্রিয় ও বিভ্রান্ত লোক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুলতান আইউবী-বিরোধী ষড়যন্ত্রেও তার পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, তাও ঠিক। কিন্তু আইউবীর প্রতি তার বেশ অনুরাগও ছিল। আইউবীকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

দু'জন ঐতিহাসিক এ-ও লিখেছেন, সুলতান আইউবী যদি আজেদের ডাকে সাড়া দিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তাহলে আজেদ তাকে আরও অনেক তথ্য জানাতেন।

যা হোক, ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, আজেদের ডাকে কোন প্রতারণা ছিল না। নিজের পাপমোচন এবং আইউবীর প্রতি হৃদ্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি আইউবীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই দুঃখ আইউবীকে বহুদিন পর্যন্ত দংশন করতে থাকে। আল-আজেদ যাদের ব্যাপারে যে তথ্য প্রদান করে গিয়েছিলেন, পরবর্তী অনুসন্ধানে তার প্রতিটি তথ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ঐসব লোকের নামের তালিকা আলী বিন সুফিয়ানের হাতে দিয়ে সুলতান নির্দেশ দেন, এদের পিছনে গুপ্তচর নিয়োগ কর। অতীব গুরুত্ব সহকারে সতর্কতার সাথে এদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ কর। তবে নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করবে না। এমন পন্থা অবলম্বন কর, যেন অভিযুক্তকে হাতে-নাতে ধরা যায়, পাছে বিনা দোষে যেন কারো প্রতি অবিচার করা না হয়।

সুলতান আইউবী আজেদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করান। সেদিনেই অপরাহ্ন-বেলায় আজেদকে সাধারণ কবরস্তানে দাফন করা হয়। অল্প ক'দিনের মধ্যেই তার সেই কবরের নাম-চিহ্ন মুছে যায়।

সুলতান আইউবী মহলে তল্লাশী চালান। উদ্ধার করেন এত বিপুল পরিমাণ সোনা-হিরা-মাণিক্য ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী, যা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান।

হেরেমের সকল নারী ও যুবতী মেয়েদেরকে আলী বিন সুফিয়ানের হাতে সোপর্দ করে সুলতান আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের নাম-পরিচয় ও বাড়ি-ঘরের ঠিকানা জেনে নাও। যারা নিজ বাড়িতে চলে যেতে চায়, নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের পৌঁছিয়ে দাও। অমুসলিম কেউ থাকলে তাদের ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত চালিয়ে তথ্য নাও, কে কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে। কাউকে সন্দেহ হলে বন্দী করে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ কর।

সুলতান আইউবী মহল থেকে উদ্ধারকৃত অর্থ-সম্পদগুলো মিসরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলোতে বন্টন করে দেন।

মৃত্যুর আগে আল-আজেদ তার রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার রজব সম্পর্কে বলেছিলেন, রজব সুদানে আত্মগোপন করে সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে বাহিনী গঠন করছে এবং সহযোগিতার জন্য খৃষ্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আলী বিন সুফিয়ান এমন ছয়জন জানবাজ বেছে নেন, যারা অভিজ্ঞ গুপ্তচর হওয়ার পাশাপাশি দুঃসাহসী যোদ্ধাও। তাদের কমান্ডার রজবকে চিনে। পূর্ণ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে আলী বিন সুফিয়ান বণিক বেশে তাদেরকে সুদান প্রেরণ করেন। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়, সম্ভব হলে রজবকে জীবিত ধরে আনবে, অন্যথায় সেখানেই হত্যা করবে।

তারা যখন রওনা হয়ে যায়, রজব তখন সুদানে ছিল না। তখন ফিলিস্তীনের এক বিখ্যাত দুর্গ শোবকে অবস্থান করছিল সে। ফিলিস্তীন তখন খৃষ্টানদের দখলে। শোবক তাদের প্রধান ঘাঁটি। খৃষ্টানদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে শোবকের মুসলমানরা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার কোন মুসলমানের ইজ্জত তখন নিরাপদ ছিল না। ডাকাত বেশে খৃষ্টানরা মুসলমানদের কাফেলা লুট করে বেড়াত। অপহরণ করে নিয়ে যেত মুসলিম মেয়েদের। এ কারণে-ই সুলতান আইউবী সর্বপ্রথম ফিলিস্তীনকে পদানত করতে চাইছিলেন। তাছাড়া মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসও খৃষ্টানদের দখলে। কিন্তু মুসলিম শাসকগণের অবস্থা ছিল এই যে, তারা খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা ও খাতির-তোয়াজে ব্যস্ত। রজবও ছিল তেমনি একজন। সুলতান আইউবীর বিরুদ্ধে মদদ হাসিল করার জন্য খৃষ্টানদের দুয়ারে ধরণা দিয়ে বসে আছে সে।

রজবের সম্মানে শোবকে নাচ-গান-বাদ্যের আসর চলছে। রজব কায়োমনে উপভোগ করছে সে অনুষ্ঠান। অপূর্ব সুন্দরী যুবতীরা নগ্নদেহে তার সামনে নাচছে, গাইছে। কিন্তু একটিবারও সে ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেনি যে, এই গায়িকাদের অধিকাংশ-ই মুসলিম পিতা-মাতার সেইসব কন্যা, খৃষ্টানরা শৈশবে যাদের অপহরণ করে এনে বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দিয়ে এ পেশায় নিয়োজিত করেছে। স্বজাতির মেয়েদের নাচ দেখে, গান শুনে, তাদের হাতে মদ পান করে কাফিরদের আতিথেয়তা উপভোগ করছে রজব। রাতভর মদ আর নাচ-গানে মত্ত থাকে সে। পরদিন সকালে আলোচনার জন্য খৃষ্টানদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেয়।

বৈঠকে উপস্থিত আছেন খৃষ্টান সম্রাট হে অফ লুজিনান ও কনরাড। আছেন বেশ ক'জন খৃষ্টান সেনা কমান্ডার।

রজব আগেই খৃষ্টানদের অবহিত করেছিল, সুলতান আইউবী এক সুদানী হাবশী গোত্রের উপাসনালয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে তার পুরোহিতকে হত্যা করে ফেলেছে। জবাবে সুদানীরা আইউবী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা পিছনে সরে আসতে বাধ্য হয়।

শুধু তা-ই নয়– খলীফা আল-আজেদের ফাতেমী খেলাফত বিলুপ্ত করে আইউবী খেলাফতে আব্বাসীয়াও ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মিসরের শাসন ক্ষমতায় কোন খলীফা থাকছেন না। সুলতান আইউবী নিজেই মিসরের স্বাধীন-সার্বভৌম শাসক হতে চাইছেন। এসবের মোকাবেলায় সুদানে গিয়ে আমি বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা নিয়েছি। এ কাজে আমি আপনাদের সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

এ বৈঠকে মিসরে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্যও রজব খৃষ্টানদের সাহায্যের আবেদন জানায়।

'সুলতান আইউবী যে হাবশী গোত্রটির ধর্মীয় অধিকারে নির্দয় হস্তক্ষেপ করেছেন, প্রতিশোধের জন্য প্রথমতঃ তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি সুদানে আরো যে ক'টি ধর্ম আছে, সেগুলোর অনুসারীদেরকে আইউবীর বিরুদ্ধে এই বলে উত্তেজিত করে তুলতে হবে যে, এই মুসলিম রাজাটি মানুষের ধর্মীয় উপাসনালয় ও পুরোহিত-দেব-দেবীর উপর আগ্রাসন চালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নতুন কোন অঘটন ঘটানোর আগে-ভাগে মিসরে-ই তার পতন ঘটাতে হবে। এভাবে মানুষের ধর্মীয় চেতনায় আগুন ধরিয়ে অনায়াসে তাদেরকে মিসর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব।' বললেন খৃষ্টান সম্রাট কনরাড।

এক খৃষ্টান কমান্ডার বলল, মিসরের মুসলমানদেরকেও আমরা সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারি। শ্রদ্ধেয় রজব যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে তার-ই উপকারার্থে আমি এর ব্যাখ্যা প্রদান করব। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমানকে খুন করানো কঠিন কিছু নয়। আমাদের ধর্মে যেমন কোন কোন পাদ্রী নিজেই নিজেকে গীর্জার কর্তা বানিয়ে নিজের অস্তিত্বকে মানুষ ও খোদার মাঝে দাঁড় করিয়ে দেন, ঠিক তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও কোন কোন ইমাম মসজিদের উপর নিজের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্‌র এজেন্ট হয়ে বসেন।

আমাদের অর্থ আছে। এই অর্থ দিয়ে আমরা আমাদের পছন্দমত মুসলমান মৌলভী-মাওলানা তৈরি করে মিসরের মসজিদে মসজিদে বসাতে পারি। আমাদের কাছে এমন একজন খৃষ্টানও আছেন, যিনি ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে বেশ পারদর্শী। মুসলমান ইমামের বেশে তাকেও আমরা কাজে ব্যবহার করতে পারি। মসজিদে বসে ইমামদের সালাহুদ্দীন আইউবীর বিরুদ্ধে কথা বলা যাবেও না– প্রয়োজনও হবে না। ঐ মৌলভীদের মুখে মুসলমানদের মধ্যে আমরা এমন চিন্তাধারা ও কুসংস্কার সৃষ্টি করে দেব যে, তাদের মন থেকে সালাহুদ্দীন আইউবীর ভক্তি-শ্রদ্ধা এমনিতেই মুছে যাবে।

'এ কাজ আমাদের এক্ষুণি শুরু করে দেয়া দরকার। সুলতান আইউবী মিসরে মাদ্রাসা খুলেছেন। সেখানে শিশু-কিশোর-যুবকদেরকে ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনার তালীম দেয়া হচ্ছে। এর আগে মিসরে এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। মানুষ মসজিদে মসজিদে খোতবা শুনত। সে খুতবায় খলীফার স্তুতি-প্রশংসা-ই থাকত বেশী। এখন সালাহুদ্দীন আইউবী খোতবা থেকে খলীফার আলোচনা তুলে দিয়েছেন। যদি

মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ও মানসিক সচেতনা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মিশন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আপনারা নিশ্চয় জানেন, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে হলে জনসাধারণকে মানসিকভাবে পশ্চাদপদ আর দৈহিকভাবে পরনির্ভরশীল করে রাখা একান্ত আবশ্যক।' বলল রজব।

'মোহতারাম রজব! আপনি দেখছি নিজের দেশ সম্পর্কে কোন খবর-ই রাখছেন না যে, পর্দার আড়ালে সেখানে কী ঘটছে! সালাহুদ্দীন আইউবী রোম উপসাগরে যেদিন আমাদের পরাজিত করেছিলেন, এ কার্যক্রম তো আমরা সেদিনই শুরু করে দিয়েছি। আমরা প্রকাশ্য ধ্বংসযজ্ঞে বিশ্বাসী নই। আমরা ধ্বংস করি মানুষের মন-মস্তিষ্ক আর চিন্তা-চেতনা। একটু ভেবে দেখুন মোহতারাম! দু' বছর আগে কায়রোতে ক'টি পতিতালয় ছিল, আর এখন ক'টি? এই অল্প ক'দিনে বেশ্যাবৃত্তি কি সন্তোষজনকহারে বৃদ্ধি পায়নি? বিত্তশালী পরিবারগুলোতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে আপত্তিজনক মন দেয়া-নেয়ার খেলা কি শুরু হয়ে যায়নি? আমাদের প্রেরিত খৃষ্টান মেয়েরা মুসলমান নারীর বেশ ধরে সেখানে মুসলমান পুরুষদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাদেরকে খুনাখুনিতে লিপ্ত করিয়েছে। কায়রোতে আমরা অতি আকর্ষণীয় একটি জুয়াবাজি চালু করেছি। আমাদের প্রেরিত লোক দু'টি মসজিদে ইমামতি করছে। অত্যন্ত চমৎকারভাবে তারা ইসলামের রূপ পাল্টে দিচ্ছে। জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেখানকার মুসলমানদের চেতনা নষ্ট করছে। আলেমের বেশে আমরা আরো বেশ কিছু লোক সেখানে পাঠিয়ে রেখেছি। তারা মুসলমানদেরকে যুদ্ধ-জিহাদের বিপক্ষে প্রস্তুত করছে। শত্রু-বন্ধুর ধারণাও পাল্টে দিচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি আশাবাদী যে, অল্প ক' বছরের মধ্যে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা এই দাঁড়াবে যে, তারা নিজেদেরকে গর্বভরে মুসলমান দাবি করবে; অথচ তাদের মন-মানসিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর থাকবে ক্রুশের প্রভাব। শোন রজব! একটু বিলম্বে হলেও একটি সময় এমন আসবে, আজ যে মুসলমান ক্রুশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সে মুসলমান-ই সেদিন সভ্যতার প্রতীক বিশ্বাসে শ্রদ্ধাভরে ক্রুশ বুকে ধারণ করে চলবে।' বলল এক খৃষ্টান কমান্ডার।

'সালাহুদ্দীন আইউবীর গোয়েন্দা বিভাগ অত্যন্ত দক্ষ ও অতিশয় সতর্ক। এ বিভাগের প্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে যদি হত্যা করা যায়, তাহলো সালাহুদ্দীন অন্ধ ও বধির হয়ে যাবে।' বলল রজব।

'তার মানে নিজে আপনি কিছুই করতে পারবেন না; সব আমাদের-ই করে দিতে হবে। শত্রুর গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তাকেও হত্যা করার যোগ্যতা আপনার নেই, তাই না? আপনি যদি বিবেক-বুদ্ধিতে এতই দুর্বল হন, তাহলে তো আপনি আমাদের লোকদেরও ধরিয়ে খুন করাবেন, আমাদের অর্থ-সম্পদ নষ্ট করবেন।' বললেন সম্রাট কোনার্ড।

'না, জনাব! আমাকে অত দুর্বল ভাববেন না। আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। ফেদায়ীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি আলোচনাও করেছি। তারা সালাহুদ্দীন আইউবীকেও হত্যা করতে প্রস্তুত।' বলল রজব।

'সুদানের দিক থেকে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আপনি মিসরের সীমান্তকে অস্থিতিশীল করে তুলুন। দেশের ভিতরে মানসিক ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাব আমরা। এদিকে আরবের কয়েকজন মুসলমান আমীর আমাদের কব্জায় এসে গেছেন। তাদের দু'-চারজনকে তো আমরা এমনভাবে কোণঠাসা করে ফেলেছি যে, এখন তারা আমাদেরকে কর দিচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ চালিয়ে আমরা একটু একটু করে তাদের ভূখন্ড দখল করে চলেছি। সুদানের দিক থেকেও আপনি এ কৌশল অবলম্বন করে কাজ করুন। মুসলমানদের দু'জন লোক এখনো রয়ে গেছে। নূরুদ্দীন জঙ্গী আর সালাহুদ্দীন আইউবী। এ দু'জনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পশ্চিম আকাশে ইসলামী দুনিয়ার সূর্য ডুবে যাবে। শর্ত হল, আপনাকে দৃঢ়পদ থাকতে হবে। আর আপনাদের মিসর যে আপনাদের-ই থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।' বললেন সম্রাট কনরাড।

মৌলিক আলাপ-আলোচনার পর বৈঠকে কাজের কৌশল ও পদ্ধতি নিয়েও পর্যালোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ। শেষে উদ্ভিন্ন-যৌবনা অনিন্দ্যসুন্দরী ও অতিশয় বিচক্ষণ তিনটি মেয়ে এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে রজবকে বিদায় করা হয়। কায়রোর দু'জন লোকের ঠিকানাও দেয়া হয় তাকে। তাদের যে কোন একজনের নিকট মেয়েগুলোকে গোপনে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয় রজবের হাতে। দু'জনের একজন হল সুলতান আইউবীর সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তা ফয়জুল ফাতেমী।

মেয়েদের দিয়ে কিভাবে কাজ নিতে হয়, রজবকে তা বলা হয়নি। তাকে শুধু এতটুকু অবহিত করা হয়েছে যে, ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। মেয়েদেরকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার তা জানা আছে। তাছাড়া মেয়েরাও জানে তাদের কর্তব্য কী। রজবের সঙ্গে দেয়া এই মেয়ে তিনটি আরব ও মিসরের ভাষায় পারদর্শী।

দশজন রক্ষীর প্রহরায় রজব মেয়েদের নিয়ে রওনা হয়। আপাততঃ তার গন্তব্য সুদানের একটি পাহাড়ী অঞ্চল, যেখানে নারী বলি হত এবং যেখানে সুলতান আইউবীর জানবাজরা উম্মে আরারাহকে হাবশীদের কবল থেকে মুক্ত করে পুরোহিতকে হত্যা এবং তার আস্তানাকে ধ্বংস করেছিল। সুদানীদের পরাজয় এবং খলীফা আল-আজেদের ক্ষমতাচ্যুতির পর রজব পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এ স্থানকে নিজের আখড়ায় পরিণত করেছিল। হাবশীদের যে গোত্রটির পুরোহিতকে সুলতান আইউবী হত্যা করিয়েছিলেন, রজব তাদেরকে নিজের পাশে এনে জড়ো করেছিল। এখনো সে স্থানটিকে তারা দেবতার আখড়া বলে বিশ্বাস করছে। তারা পাহাড়ের অভ্যন্তরে যাচ্ছে না। মাত্র চারজন বৃদ্ধ ভিতরে যাওয়া-আসা করছে। তাদের একজন গোত্রের-ই ধর্মগুরু। পরলোকগত পুরোহিতের স্বঘোষিত স্থলাভিষিক্ত হয়ে বসেছে সে। রক্ষী হিসেবে তিনজন লোককে বেছে নিয়ে এখন সে পাহাড়ে আসা-যাওয়া করছে। সে অঞ্চলের-ই নিভৃত এক

কোণে রজব তার আস্তানা গেড়েছিল। ফেরার হয়ে সে প্রথমে সেখানে আশ্রয় নিয়ে পরে মিসরের অধিবাসী এক খৃষ্টান এজেন্টের সঙ্গে ফিলিস্তীন চলে গিয়েছিল।

❁ ❁ ❁

হাবশীদের এ গোত্রটি– যার নাম আংগুক– ভয়ে তটস্থ। কারণ, প্রথমতঃ তাদের দেবতার বলি পূরণ হয়নি। দ্বিতীয়তঃ তাদের পুরোহিত খুন হয়েছে। তৃতীয়তঃ তাদের দেবমূর্তির আস্তানাটিও ধ্বংস হয়ে গেছে। সর্বোপরি গোত্রের হাজার হাজার যুবক দেবতার আপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে অধিকাংশ নিহত হয়েছে আর অবশিষ্টরা পরাজয়ের গ্লানি ও জখম নিয়ে ফিরে এসেছে। আংগুকের ঘরে ঘরে মাতম চলছে। সর্বত্র বিরাজ করছে শোকের ছায়া।

তাদের কেউ কেউ এমনও ভাবতে শুরু করেছে যে, যিনি তাদের দেব-মূর্তিটি ভেঙ্গেছেন, তিনি বোধ হয় তদপেক্ষাও বড় দেবতা হবেন।

নিহত পুরোহিতের স্থলাভিষিক্ত ও ধর্মগুরু এ অবস্থা দেখে বললেন, দেবতার কুমীর ক'দিন যাবত অভুক্ত; তার পেটে খাবার দাও। তবেই তোমরা এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। হাবশীরা দেবতার কুমীরের জন্য কয়েকটি বকরি পাঠিয়ে দেয়। একজন আবেগের আতিশয্যে নিজের উটটি পর্যন্ত পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়। কয়েকদিন পর্যন্ত এ পশুগুলো কুমীরদের ঝিলে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু গোত্রের মানুষের মনের ভীতি এতটুকুও কমল না।

এক রাতে পুরোহিত গোত্রের লোকদেরকে এক স্থানে সমবেত করে ঘোষণা দেয় যে, তিনি দেবতাদের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়েছেন। দেবতারা তাকে ইংগিত করেছে যে, যেহেতু সময়মত নারী বলি হয়নি, তাই গোত্রের উপর এ বিপদ নেমে এসেছে। দেবতারা বলেছেন, এখন যদি একত্রে দু'টি মেয়ে বলি দেয়া যায়, তাহলে বিপদ দূর হতে পারে। অন্যথায় দেবতা গোত্রের একটি মানুষকেও শান্তিতে থাকতে দেবেন না।

পুরোহিত আরো জানান যে, মেয়ে দু'টো আংগুক হতে পারবে না, সুদানীও নয়। হতে হবে ভিনদেশী শ্বেতাঙ্গী।

পুরোহিত আরো কি যেন বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এতটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের অসংখ্য অকুতোভয় সাহসী যুবক দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে উঠে, যে করে হোক, মিসর থেকে দু'টি খৃষ্টান কিংবা মুসলমান মেয়ে আমরা তুলে আনবই। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হোক, এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি আমাদের পেতেই হবে।

তিন খৃষ্টান যুবতীকে নিয়ে রক্ষীদের সঙ্গে এগিয়ে চলছে রজব। এ সফর তার যেমন দীর্ঘ, তেমনি বিপদসংকুল। রজব আইউবী বাহিনীর দলত্যাগী ও বিদ্রোহী কমান্ডার। সুলতান আইউবী যে তার সীমান্তে টহল-প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তা তার জানা আছে। তাই সীমান্তের অনেকদূর ভিতর দিয়ে কাফেলাকে নিয়ে আসছে সে।

রজবের কাফেলায় আছে তিনটি উট। পানি, খাবার এবং খৃষ্টানদের দেয়া মাল-পত্রে বোঝাই উটগুলো। নিজেরা চলছে ঘোড়ায় চড়ে।

কয়েকদিন পথ চলার পর রজব দেবতার পাহাড়ে এসে পৌছে। শ্বেতাঙ্গী দু'টি রূপসী মেয়ে বলি দিতে হবে পুরোহিত এ ঘোষণা দিয়েছিল মাত্র তার আগের দিন।

রজব এসে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করে পুরোহিতের সঙ্গে। রজবের সঙ্গে সাদা চামড়ার তিনটি সুন্দরী মেয়ে দেখে পুরোহিতের চক্ষু তো চড়ক গাছ। সীমাহীন আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠেন পুরোহিত। দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়ার জন্য ঠিক এমনি দু'টি মেয়ে-ই তার প্রয়োজন। পুরোহিত মেয়েদের ব্যাপারে জানতে চাইলে রজব বলে, আমি বিশেষ উদ্দেশ্যে এদেরকে সঙ্গে এনেছি।

পাহাড়ের অভ্যন্তরে সবুজ-শ্যামল মনোরম একটি জায়গা। স্থানটি তিনদিক থেকে পাহাড়ঘেরা। পূর্ব থেকে-ই তাঁবু খাটানো আছে। এটি-ই রজবের আস্তানা। রজব মেয়েদের নিয়ে যায় সেখানে।

মেয়েদের আরাম-আয়েশের সব আয়োজন-ই আছে এখানে। তাদের জন্য মদের ব্যবস্থাও করে রেখেছে রজব।

অনেক দীর্ঘ ও বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে রজব নিরাপদে এখানে এসে পৌছেছে। মনে তার বেশ আনন্দ। তাই সকলকে নিয়ে রাতে উৎসবের আয়োজন করে। নিজে মদপান করে, রক্ষী এবং মেয়েদেরও মদপান করায়।

মধ্যরাত। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। রজবের রক্ষীরা গভীর নিদ্রায় বিভোর। এমন সময়ে পা টিপে টিপে রজব এগিয়ে আসে মেয়েদের তাঁবুতে। একটি মেয়ের বাহু ধরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করে নিজের তাঁবুতে। রজবের মতলব বুঝে ফেলে মেয়েটি। বলে, আমি গণিকা নই। এখানে এসেছি আমি ক্রুশের দায়িত্ব পালন করতে– অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। আপনার সঙ্গে আমি মদপান করতে পারি– যৌনকর্মে লিপ্ত হতে পারি না।'

রজব হাসতে হাসতে মেয়েটিকে জোর করে তার তাঁবুতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। মেয়েটি ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে রজবের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। রজব পুনরায় হাত বাড়াতে চাইলে মেয়েটি দৌড়ে তাঁবুতে চলে যায়।

ঘটনাটি অপর দু'মেয়ের কানে গেলে তারা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসে। রজব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা রজবকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না, এ আচরণ আপনার ঠিক হয়নি।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রজব। বলে, 'তোমরা কত পবিত্র মেয়ে আমার তা জানা আছে। বেহায়াপনা যাদের পেশা, তারা গণিকা নয় তো কি?'

'এ পেশার প্রয়োগ আমরা সেখানেই করি, যেখানে কর্তব্য পালনে এ-কাজ প্রয়োজন হয়। নিছক বিনোদনের জন্য আমরা ও-সব করি না।' বলল মেয়েটি।

মেয়েদের কথায় নিরস্ত হতে চাইল না রজব। অবশেষে কঠোর হল মেয়েরা। 'বলল, আমাদের সঙ্গে দশজন রক্ষী আছে। তারা আমাদের নিরাপত্তার জন্য-ই এসেছে। আগামীকাল-ই তাদের ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে আমরা তাদেরকে এখানে রেখে দিতে পারি কিংবা তোমাকে ফেলে রেখে তাদের সঙ্গে আমরা চলেও যেতে পারি। আশা করি সীমালংঘন থেকে তুমি বিরত থাকবে।'

চুপসে যায় রজব। কিন্তু ভাবে মনে হচ্ছে, মেয়েদেরকে সে ক্ষমা করবে না।

কেটে যায় রাত।

পরদিন ফিলিস্তীন থেকে আসা দশ রক্ষীকে রজব বিদায় করে দেয়। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা এল। রজব মেয়েদের নিয়ে আড্ডায় বসেছে। হঠাৎ চারজন হাবশীসহ পুরোহিত এসে উপস্থিত। সুদানী ভাষায় পুরোহিত রজবকে বলে, 'দেবতা আমাদের উপর রুষ্ট হয়ে আছেন। তিনি দু'টি ফিরিঙ্গী বা মুসলমান মেয়ের বলি চাচ্ছেন। তোমার এই মেয়েগুলো বলির জন্য বেশ উপযুক্ত। এর থেকে দু'টি মেয়ে তুমি আমাকে দিয়ে দাও।'

আঁতকে উঠে রজব। আগুন ধরে যায় তার মাথায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকে পুরোহিতের প্রতি। অবশেষে বলে, 'এরা তো বলির মেয়ে নয়। এদের দ্বারা আমাকে বিশেষ কাজ নিতে হবে। এদের হাতে-ই তোমাদের দেবতাদের দুশমনকে হত্যা করতে হবে।'

পুরোহিত বলল, 'না, তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি এদেরকে এখানে আমোদ করার জন্য এনেছ। এদের দু'জনকে আমরা বলি দেব-ই দেব।'

রজব পুরোহিতকে নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করে; কিন্তু পুরোহিত কিছুতেই কিছু মানছে না। দেবতা সাওয়ার হয়ে বসেছে যেন তার মস্তকে। দু'টি মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে পুরোহিত বলল, 'এরা দু'জন দেবতার জন্য উৎসর্গিত। আংগুকের মুক্তি এখন এদের হাতে।' রজবকে বলল, মেয়েদের নিয়ে বৃথা পালাবার চেষ্টা করবে না; আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুমি এখান থেকে পালাতে পারবে না।'

'মেয়েরা সুদানী ভাষা বুঝে না। পুরোহিত চলে যাওয়ার পর রজবকে বিমর্ষ দেখে তারা জিজ্ঞেস করে, লোকটা কী বলে গেল? তার কথা শুনে তুমি-ই বা এত অস্থির হয়ে পড়লে কেন? রজব রাখঢাক না করে পরিষ্কার বলে দেয় যে, লোকটা এখানকার দেব-মন্দিরের পুরোহিত। তোমাদেরকে তিনি বলি দিতে চাইছেন। দেবতারা নাকি তাদের উপর রুষ্ট হয়ে গেছেন। এখন নারী বলি দিয়ে তিনি এই অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চান।

'বলি' কী জানতে চায় মেয়েরা। রজব জানায়, তোমাদের মাথা কেটে শুকাবার জন্য ক'দিন রেখে দেবে এবং দেহটা ঝিলে নিক্ষেপ করবে। ঝিলে অনেকগুলো কুমীর আছে। তারা তোমাদের দেহকে খেয়ে ফেলবে।

বলির ব্যাখ্যা শুনে মেয়েরা শিউরে উঠে। গায়ের লোম কাঁটার মত দাঁড়িয়ে যায় তাদের। শুকিয়ে যায় মুখের রক্ত। তাদের রক্ষা করার জন্য রজব কি চিন্তা করেছে

জানতে চায় মেয়েরা। রজব বলে, 'আমি নানাভাবে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি। তোমরা কারা, কোথা থেকে কেন এসেছ, তা-ও বলেছি। কিন্তু আমার কোন কথা-ই তার কানে পশেনি। দেবতার সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই বুঝছে না সে। আমি এখন তার দয়ার উপর নির্ভরশীল। অনুগ্রহ করে যদি তিনি তোমাদের মুক্তি দেন, তবেই তোমরা রক্ষা পাবে। আমি এদেরকে কাছে টানার ইচ্ছা করেছিলাম। এ গোত্রের লোকেরা আমার বাহিনীতে যোগ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু নিজেদের বিশ্বাসে তারা এতই অনড় যে, দেবতাদের সন্তুষ্ট না করে তারা আমার কোন কথা-ই শুনতে রাজি নয়।'

রজবের কথা শুনে মেয়েরা বুঝে ফেলে যে, সে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না কিংবা পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না। গতরাতে তারা রজবের দুর্মতির কিছুটা প্রমাণও পেয়ে গেছে। কাজেই রজবের ব্যাপারে মেয়েরা সম্পূর্ণ নিরাশ।

মেয়েরা তাঁবুতে চলে যায়। ভেবে-চিন্তে তিনজনে সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা এখানে রজবের মনোরঞ্জন কিংবা হাবশীদের দেবতার বলির যূপকাষ্ঠে চড়ার জন্য আসিনি। জীবন রক্ষা করার চেষ্টা না করে এভাবে এক নির্মম অপমৃত্যুর মুখে নিজেদের ঠেলে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। কাজেই যে করে হোক আমাদের পালাতে হবে। পালিয়ে আমাদের ফিলিস্তীন চলে যেতে হবে।

নিরাপদে সে রাত কেটে যায়। হাবশী পুরোহিত পরদিনও এসে রজবের সঙ্গে কথা বলে। মেয়েরা মনে মনে পলায়নের প্রস্তুতি নিয়েছে। রাতে ঘোড়াগুলো কোথায় থাকে, সেখান থেকে পালিয়ে বের হওয়ার পথ কোন্ দিকে, তা ভালভাবে দেখে নেয় তারা। এখান থেকে পালিয়ে ফিলিস্তীন পৌঁছা তিনটি মেয়ের পক্ষে অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার, তা মেয়েরা জানে; তবু তাদের যেতেই হবে।

পুরোহিত চলে গেলে মেয়েরা রজবকে জিজ্ঞাসা করে, লোকটা আবার এসে কী বলে গেল? রজব বলল, কাল রাতে এসে তোমাদেরকে তারা এখান থেকে নিয়ে যাবে। লোকটি আমাকে হুমকি দিয়ে গেল যে, আমি যদি তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করি, তাহলে তারা আমাকে খুন করে কুমীরের ঝিলে নিক্ষেপ করবে।

আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কেটে যায় সারাটা দিন। পালাবার পরিকল্পনার কথা রজবকে জানায়নি মেয়েরা। কারণ, রজবের উদ্দেশ্য তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আর রজবের মনেও এমন কোন সন্দেহ জাগেনি যে, জীবন রক্ষা করার জন্য মেয়েগুলো পালিয়ে যেতে পারে।

পালাবার পথ চিনে নেয়ার জন্য কৌশল আঁটে মেয়েরা। তারা রজবকে বলে, নরকসম এই পার্বত্য এলাকার মধ্যখানে এমনি এক সবুজ-শ্যামল ভূখন্ড সত্যিই প্রকৃতির এক লীলা। চল, জায়গাটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখে আসি। রজব তাদের ভ্রমণে নিয়ে যায়। কতটুকু অগ্রসর হওয়ার পর তাদের চোখে পড়ে সেই ভয়ানক ঝিল। ঝিলের এক কিনারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে পাঁচ-ছয়টি কুমীর। ঝিলের পানি গাঢ় ও পুঁতিগন্ধময়।

রজব বলে, এই সেই ঝিল। হাবশীরা নারী বলি দিয়ে বলির মস্তকবিহীন দেহ এ ঝিলে নিক্ষেপ করে। আর এই সেই কুমীর, যারা বলির নারীদেহ খেলে দেবতারা তুষ্ট হয়। তোমাদেরও বলি দিয়ে পুরোহিত এই ঝিলে এসব কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এমনি ভয়ানক দৃশ্য দেখে মেয়েদের মনে পালাবার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে উঠে। ভ্রমণের বাহানায় পালাবার পথ-ঘাট ভালো করে দেখে নেয় তারা। পালাবার জন্য তারা নরম পথ চিনে নেয়, চলার সময় যেন পথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ না হয়।

অপরদিকে হাবশী পুরোহিত পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে বসে গোত্রের লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করছে যে, বলির জন্য মেয়ে আমি পেয়ে গেছি। আজ থেকে চার দিন পর পূর্ণিমার রাতে অনুষ্ঠিত হবে বলির পর্ব। পুরোহিত জানায়, বলি হবে দেব-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর। তারপর আমরা মন্দির পুনঃনির্মাণ করব। তারপর যারা আমাদের দেবতাদের অপমান করল, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব।

✿✿✿

রাতের দ্বি-প্রহর। বিশেষ প্রশিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় মেয়েরা। তারা রজব ও তার সঙ্গীদের এত পরিমাণ মদ পান করায় যে, সঙ্গে সঙ্গে তারা অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সহসা জাগ্রত হওয়ার কোন আশংকা নেই। কি পরিমাণ মদ খাওয়ালে একজন মানুষকে কত সময় অচেতন রাখা যায়, তা ওরা বেশ জানে।

উঠে দাঁড়ায় মেয়েরা। সফরের সামানাদি গুছিয়ে বেঁধে নেয়। ঘোড়ায় জিন লাগায়। তিনজন চড়ে বসে তিনটি ঘোড়ায়। দিনের বেলা ঠিক করে রাখা নরম মাটির পথে ঘোড়া ছুটায়। ভয়ানক এই বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে যায় তারা।

গন্তব্য তাদের ফিলিস্তীন। রজব তাদের যে পথে নিয়ে এসেছে, এগুতে হবে সে পথ ধরে-ই। তারা অস্বাভাবিক বিচক্ষণ মেয়ে। সামরিক দক্ষতাও আছে তাদের। কিন্তু তাদের একথা জানা নেই যে, বালুকাময় মরুভূমিতে পদে পদে এত প্রবঞ্চনা লুকিয়ে থাকে, যা অতি অভিজ্ঞজনদেরকেও বোকা বানিয়ে ছাড়ে। এই দীর্ঘ মরু অঞ্চলে একাকী চলে না কেউ– চলে দল বেঁধে। সব রকম বিপদের মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে-ই যাত্রা শুরু করে মানুষ।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে বেশ কিছু পথ অগ্রসর হয়ে মেয়েরা ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে চলছে তারা। অগ্রসর হয় আরো কিছু পথ। এবার তীব্রগতিতে ঘোড়া ছুটায়। তীরবেগে ছুটে চলেছে ঘোড়া। বাকী রাতটুকু চলে একই গতিতে। রাতের মরুভূমি নিরুত্তাপ।

ভোর হল। পূর্ব আকাশে সূর্য উদিত হয়েছে। মেয়েদের চারদিকে গোলাকার টিলা। সম্মুখে বালুকাময় মাটির উঁচু উঁচু পাহাড়। মেয়েদের পথ রোধ করে দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়গুলো। সূর্যের দিকে তাকিয়ে দিক-নির্ণয় করার চেষ্টা করে তারা। ঢুকে পড়ে

টিলার ফাঁকে আঁকা-বাঁকা দুর্গম পথে। ঘোড়াগুলো পিপাসার্ত। নিজেদেরও পিপাসায় ধরেছে তাদের। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে একটি করে পানির ছোট্ট মশক বাঁধা। একদিনও চলবে না সেই পানিতে। পানির অন্বেষায় কোথাও খেজুর বাগান আছে কি না খুঁজতে শুরু করে তিন মেয়ে। সূর্য উঠে এসেছে আরো উপরে। ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে উত্তাপ। গরমে যেন মরুভূমি জাহান্নামে পরিণত হতে যাচ্ছে। না, খেজুর বাগান নেই আশেপাশে কোথাও, নেই এক ফোঁটা পানিও।

সূর্যোদয়ের পর এখনো ঘুমুচ্ছে রজব ও তার সঙ্গীরা। মদের নেশা ভালো করেই পেয়েছে তাদের। তিনজন হাবশীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হয় পুরোহিত। আগে যায় মেয়েদের তাঁবুতে। তাঁবু শূন্য। রজবকে ঘুম থেকে জাগায় সে। বলে, 'কই, মেয়ে দু'টোকে আমার হাতে তুলে দাও, জলদি কর।' রজব তখনো বিছানায় শোয়া। ধড়মড় করে উঠে বসে সে। কাকুতি-মিনতি করে মেয়েদের জীবন ভিক্ষা চায়। মেয়েদেরকে কি উদ্দেশ্যে এখানে এনেছে, আবারও তার বিবরণ দেয়। কিন্তু পুরোহিত তার কোন কথা-ই শুনছে না। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য নারী বলি তাকে দিতে-ই হবে। আর এদেরকে হাতছাড়া করলে বলি দেয়া তার অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রজব সঙ্গীদের জাগাতে চাইলে হাবশীরা তাকে বাধা দেয়। বলে, পুরোহিত যা বলছেন, তার অন্যথা করলে পরিণতি ভাল হবে না। পুরোহিত জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েগুলো কোথায়?'

নিজের তাঁবুতে বসে বসেই রজব মেয়েদের ডাক দেয়। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। উঠে দাঁড়ায় রজব। মেয়েদের তাঁবুতে গিয়ে দেখে, তাঁবু শূন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও দেখা গেল না তাদের। হঠাৎ রজবের দৃষ্টি পড়ে ঘোড়ার জিনের উপর। কিন্তু একি! তিনটি জিন-ই যে নেই! রজব দৌড়ে যায় আস্তাবলে। ঘোড়াও তো তিনটি উধাও! ঘটনাটা বুঝে ফেলে রজব। পুরোহিতকে বলে, 'আপনার ভয়ে ওরা পালিয়ে গেছে। ওদের ভাগিয়ে আপনি বেশ করেছেন!'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে পুরোহিত। বলে, তু-ই ওদের ভাগিয়েছিস্! আমার আশা-ভরসা সব তুই মাটি করে দিলি!' হাবশীদের বলে, একে নিয়ে বেঁধে রাখ। বেটা আংগুকের দেবতাকে আবার রুষ্ট করল। কয়েকজন সুদক্ষ অশ্বারোহী ডেকে আন। এক্ষুণি মেয়েদের ধাওয়া করতে বল। যেখান থেকে হোক, খুঁজে ওদের আনতেই হবে। এখনো বেশী দূর যেতে পারেনি তারা। যাও, জল্দি কর।'

রজবের যুক্তি-প্রমাণ, অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে হাবশীরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। হাত দু'টো পিছনে করে একটি গাছের সাথে বেঁধে রাখে। তার ঘুমন্ত সঙ্গীদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নেয়। তাদের হুমকি দিয়ে বলে, এখান থেকে এক চুল নড়বি তো খুন করে ফেলব।

ক্ষণিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয় ছয়জন অশ্বারোহী। মেয়েদের ধাওয়া করে ধরে আনার জন্য রওনা হয় তারা। বালির উপর তিনটি ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে তীব্রবেগে ছুটে চলে ছয় ঘোড়সওয়ার। কিন্তু মেয়েদের

নাগাল পাওয়া অত সহজ নয়। তাদের পলায়ন আর এই পশ্চাদ্ধাবনের মাঝে কেটে গেছে আট-দশ ঘন্টা।

হাবশী অশ্বারোহীদের মরুভূমির পথ-ঘাট সব চেনা। তদুপরি তারা পুরুষ। অল্প সময়ে তারা এগিয়ে যায় অনেক পথ। তীব্র বাতাস বইছে। বালি উড়ছে। তবু সমান গতিতে এগিয়ে চলছে তারা।

তিন ঘন্টা পথ চলার পর হাবশী অশ্বারোহীরা হঠাৎ দেখতে পেল, সম্মুখ আকাশে দিগন্তেরও উপরে মরুভূমির ধূলো-বালি ঘুর্ণাবর্তের মত পাক খেয়ে খেয়ে ধেয়ে আসছে। ভয়ার্ত চোখে বীর আরোহীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে তীব্রগতিতে পিছন দিকে পালাতে শুরু করে তারা।

মরুভূমির দম্‌কা বাতাস, যাকে বলে সাইমুম। এ ভয়ংকর ঝড় বড় বড় টিলাকে বালু-কণায় পরিণত করে উড়িয়ে নিয়ে যায়। রাশি রাশি টিলা মুহূর্তের মধ্যে সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এই ঝড়ের মধ্যে কোন মানুষ বা পশু যদি দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকে, তাহলে উড়ে আসা বালি তার গায়ে বসে তাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করে এবং ছোট-খাট একটি টিলা দাঁড়িয়ে যায় তার উপর।

দম্‌কা ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার মত আশেপাশে শক্ত কোন টিলা নেই। পালিয়ে নিজেদের পাহাড়ী এলাকায় ফিরে যেতে মনস্থ করে হাবশী অশ্বারোহী। কিন্তু সে পাহাড় যে অনেক দূর। তাছাড়া দম্‌কা ঝড় পৌঁছে গেছে সেখানেও। সেখানকার বড় বড় বৃক্ষগুলো বাতাসের তোড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে চীৎকার করছে যেন।

ঝিলের কুমীরগুলো ভয়ে পাহাড়ের নালায় গিয়ে আত্মগোপন করে আছে। পুরোহিত একস্থানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত দু'টো একবার মাটিতে একবার মাথায় ছুঁড়ে হা-হুতাশ করছে আর বিলাপ করে বলছে, ওহে আংগুকের দেবতা! তোমার গজব সংবরণ কর। আর একটু ধৈর্য ধর দেবতা! অল্প পরেই আমরা দু'টি মেয়েকে তোমার চরণে নিবেদন করছি। আমাদের প্রতি একটু দয়া কর দেবতা!

পলায়নপর মেয়েরাও এই ঝড়ের কবলে আক্রান্ত হয়। বালির আস্তর জমে যায় তাদের ও তাদের ঘোড়াগুলোর গায়ে। আতঙ্কগ্রস্ত ঘোড়াগুলো নিয়ন্ত্রনহীনভাবে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর ও ঝড়-কবলিত তিনটি ঘোড়া মধ্যরাত পর্যন্ত এভাবে ছুটোছুটি করে। নিথর শরীরে নিরুপায় ঘোড়ার পিঠে বসে আছে তিন মেয়ে।

একদিকে সীমাহীন ক্লান্তি, অপরদিকে প্রবল পিপাসা। ক্লান্তি ও পিপাসা ধীরে ধীরে ঘোড়াগুলোকে বেহাল করে তুলতে শুরু করে। হঠাৎ একটি ঘোড়া উপুড় হয়ে পড়ে যায়, পড়ে যায় তার আরোহী মেয়ে। ঘোড়াটি আবার উঠে দাঁড়ায়। আবার পড়ে যায়। মেয়েটি ঘোড়ার বুকের নীচে চাপা পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর ঢিলে হয়ে আসে আরেকটি ঘোড়ার দেহ। পিঠের জিন সরে যায় একদিকে। তার আরোহী মেয়েটিও কাত হয়ে পড়ে যায় সে দিকে। কিন্তু এক

পা তার আটকে গেছে রেকাবে। মন্থর গতিতে চলছে ঘোড়া। মাটিতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটিকে। তৃতীয় মেয়েটি সাহায্য করতে পারছে না তাকে। ঘোড়া তার নিয়ন্ত্রণহীন। মেয়েটির চীৎকার কানে আসে তার। এক সময় স্তব্ধ হয়ে যায় তারও কণ্ঠ। বিহ্বলের মত কেবল তাকিয়ে থাকে তৃতীয় মেয়ে। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে হেঁচড়াচ্ছে মেয়েটির মৃতদেহ। ভয়ে আঁতকে উঠে তৃতীয় মেয়ে। যত সাহসী-ই হোক মেয়ে তো! চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে সে।

নিজের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না তৃতীয় মেয়ে। পিছন ফিরে তাকায় সে। ধূলিঝড়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

মেয়েটি এখন একা। সে ভয়ে জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়েছে। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে হাত দু'টো এক করে আকাশপানে উচিয়ে ধরে। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলতে শুরু করে–

'আমার মহান খোদা! আসমান-জমিনের খোদা! তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি গুনাহগার। আমার দেহের প্রতিটি লোম পাপে নিমজ্জিত। পাপ করতে-ই আমি এসেছিলাম। পাপের মধ্যেই আমি বড় হয়েছি। আমি যখন নিতান্ত অবুঝ শিশু, তখনই বড়রা আমাকে পাপের সম্মুখে নিক্ষেপ করেছিল। পাপের পাঠ শিখিয়ে তারা আমাকে বড় করেছে। তারপর বলেছে, যাও, এবার নিজের রূপ আর দেহ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত কর। মানুষ খুন কর। মিথ্যা বল, প্রতারণা কর। আপাদমস্তক চরিত্রহীন হয়ে যাও। এ পথে নামিয়ে ওরা আমাকে বলেছিল, এটা তোমার ক্রুশের অর্পিত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলে তুমি জান্নাত পাবে।'

পাগলের মত চীৎকার করছে মেয়েটি। ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে তার ঘোড়ার গতি। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে, 'খোদা! যে ধর্ম সত্য, যে দ্বীন তোমার মনোপূতঃ আজ আমাকে তুমি তার মোজেজা দেখাও, সে ধর্মের উসিলায় আমাকে রক্ষা কর।'

বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে উঠে মেয়েটির। পাপের অনুভূতি শিথিল করে তোলে তার পুরনো ধর্মের বাঁধন। মৃত্যুর ভয়ে ভুলে যায় সে কোন্ ধর্মের মেয়ে। নিজেকে পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত দেখতে পায় সে। হৃদয়ে তার এই অনুভূতি জাগতে শুরু করে, আমি পুরুষদের একটি ভোগ্য-সামগ্রী, আমি একটি প্রতারণার ফাঁদ। তার-ই শাস্তি এখন ভোগ করছি আমি।

চৈতন্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয় মেয়েটির। নিজেকে সামলিয়ে রাখার চেষ্টা করে সে। উচ্চকণ্ঠে আহ! বলে চীৎকার দিয়ে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে সে বলে উঠে, 'আমাকে রক্ষা কর খোদা! আমাকে বাঁচাও। এম্নি বেঘোরে প্রাণটা নিওনা তুমি আমার!'

তখনি মেয়েটার মনে পড়ে যায়, সে এতীম। মৃত্যুর কবলে পড়লে অতীতের দিকে পালাতে চেষ্টা করে মানুষ। এ যুবতীটিও তার অতীতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা

করে। কিন্তু ওখানে তার নেই যে কেউ! মা নেই, বাপ নেই, ভাই-বোন কেউ নেই তার। তার মনে পড়ে যায়, খৃষ্টানরা তাকে লালন-পালন করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়ে এ পথে নিক্ষেপ করেছে। নিজের প্রতি নিজের-ই ঘৃণা জাগতে শুরু করে তার।

মেয়েটি এখন ক্ষমার প্রত্যাশী। কৃত পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে চায় সে।

ঘোড়ার গতি তার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। কোন রকম পা টেনে টেনে চলছে ঘোড়াটি। ধীরে ধীরে ঝড়ও থেমে যায়। চৈতন্য হারিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে-ই উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

✿✿✿

সুলতান আইউবী মিসরের সীমান্তে টহল প্রহরার ব্যবস্থা করে রেখেছেন আগেই। তার তিনটি প্লাটুনের হেডকোয়ার্টার সুদান ও মিসর সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইল ভিতরে। হেডকোয়ার্টারের তাঁবু বসান হয়েছে এমন স্থানে, যেখানে ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার মত আড়াল আছে। কিন্তু এই দম্‌কা ঝড় তাদেরও নিরাপদ তাঁবুগুলো পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে। উট-ঘোড়াগুলোকে সামলানো দুষ্কর হয়ে পড়েছে। ঝড় থামলে সৈন্যরা তাঁবু প্রভৃতি গোছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আহমদ কামাল এ তিন প্লাটুনের কমাণ্ডার। গৌরবর্ণ, সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান এক সুপুরুষ। বাড়ি তুরস্ক। ঝড় থামলে তিনিও বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং মাল-পত্র ও পশুপালের পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। আকাশ পরিষ্কার। ধূলো-বালি উড়ছে না এখন আর। অনেক দূরের বস্তুটিও এখন চোখে পড়ছে। এক সিপাহী হঠাৎ একদিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠে, 'কমাণ্ডার! কমাণ্ডার!! ঐ যে একটি ঘোড়া আর একজন আরোহী দেখা যাচ্ছে! ওটি আমাদের নয় তো?'

সিপাহীর দৃষ্টির অনুসরণ করেন আহমদ কামাল। বলেন, 'আরোহী মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। আমাদের বাহিনীতে তো মেয়ে নেই। চল, দেখে আসি।'

সিপাহীকে নিয়ে ছুটে যান আহমদ কামাল। অবনত মুখে অতি ধীরপদে এগিয়ে আসছে একটি ঘোড়া। খাবারের গন্ধ পেয়ে হেডকোয়ার্টারের ঘোড়াগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে ঘোড়াটি। ঘোড়ার পিঠে একটি মেয়ে। নিস্তেজ উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। বাহু দু'টো তার ঘোড়ার ঘাড়ের দু'দিকে ছড়ানো। মাথার চুলগুলো তার এলোমেলো ছড়িয়ে আছে সামনের দিকে।

আহমদ কামাল কাছে পৌছার আগে-ই ঘোড়াটি হেডকোয়ার্টারের ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে খাবার খেতে শুরু করে। ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়ান আহমদ কামাল। এক নজর তাকিয়ে নিরীক্ষা করেন মেয়েটিকে। তাকে রেকাব থেকে পা সরিয়ে দু' হাতে করে ধরে নীচে নামিয়ে আনেন। সিপাহীর উদ্দেশে বলেন, 'জীবিত; বোধ হয় খৃষ্টান। এর ঘোড়াটিকে পানি পান করাও।'

মেয়েটিকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যান আহমদ কামাল। মাথার চুল ও সর্বাঙ্গ তার ধুলোমলিন। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মেয়েটির মুখমণ্ডলে পানির ঝাপটা দেন তিনি। তারপর ফোঁটা ফোঁটা করে পানি দিতে থাকেন তার মুখে।

মিনিট দশেক পর চোখ খুলে মেয়েটি। বিস্ময়াভিভূত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত আহমদ কামালের প্রতি তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উঠে বসে সে। গৌরবর্ণ একটি লোককে পাশে দেখতে পেয়ে মেয়েটি ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি এখন ফিলিস্তীনে?' মাথা দুলিয়ে আহমদ কামাল তাকে বুঝাতে চান, আমি তোমার ভাষা বুঝছি না। এবার মেয়েটি আরবীতে জিজ্ঞেস করে। আপনি কে? আমি কোথায়?'

'আমি ইসলামী ফৌজের একজন নগন্য কমাণ্ডার। আর তুমি এখন মিসরে।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

আঁতকে উঠে মেয়েটি। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করে তার মুখ। আবার চৈতন্য হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তার। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকে আহমদ কামালের প্রতি।

অভয় দেন আহমদ কামাল। বলেন, 'ভয় কর না, আত্মসংবরণ কর। আমরা মুসলমান। মুসলমান বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেয় না।

সস্নেহে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আহমদ কামাল বললেন, 'আমি জানি, তুমি খৃষ্টান। কিন্তু এখন তুমি আমার মেহমান। তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও।'

আহমদ কামাল একজন সিপাহীকে ডেকে মেয়েটির জন্য খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে আদেশ করেন।

খাবার-পানি নিয়ে আসে সিপাহী। দেখা মাত্র পানির গ্লাসটি খপ্ করে হাতে তুলে নেয় মেয়েটি। মুখের সঙ্গে লাগিয়ে অতিশয় ব্যাকুলতার সাথে ঢক্ ঢক্ করে পানি পান করতে শুরু করে সে। গ্লাসটি ধরে ফেলেন আহমদ কামাল। টেনে ঠোঁট থেকে জোর করে সরিয়ে এনে বললেন, 'আস্তে, বেশী পিপাসার পর হঠাৎ এত পানি পেটে দিতে নেই। এখন খাবার খাও, পানি পরে পান কর।' খাবারের পাত্রে হাত দেয় মেয়েটি। তৃপ্তি সহকারে আহার করে। ধীরে ধীরে স্বস্তি ও শক্তি ফিরে আসতে শুরু করে তার। ফিরে আসে মুখের জৌলুস। চাঙ্গা হয়ে উঠে তার দেহ।

আহমদ কামালের তাঁবুর পার্শ্বেই ছোট আরেকটি তাঁবু। এটি তাঁর গোসলখানা। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি আছে এখানে। দেখে-শুনে একটি খেজুর বাগানের নিকটে স্থাপন করা হয়েছিল ক্যাম্পটি। তাই এখানে পানির কোন সংকট পড়ে না। আহারের পর আহমদ কামাল মেয়েটিকে সেই তাঁবুতে ঢুকিয়ে পর্দা ঝুলিয়ে দেন। গোসল করে মেয়েটি।

মেয়েটি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত। আহমদ কামালের অভয় বাণীতে ভয় তার কাটেনি; শত্রুর আশ্রয়ে ভাল ব্যবহারের আশা করতে পারছে না সে। শৈশব থেকে-ই সে শুনে আসছে, মুসলমানের চরিত্র হায়েনার মত, নারীর সাথে তাদের আচরণ হিংস্র পশুর মত। তদুপরি

হাবশীদের আচরণ, কুমীর ও মরুঝড়ের ভীতি চেপে ধরে আছে তাকে। দুই সঙ্গী মেয়ের নির্মম মৃত্যুর করুণ দৃশ্য আরো ভয়ার্ত করে তোলে তাকে। সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তটির কথা স্মরণে আসা মাত্র সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠে তার।

গোসল করার সময় মেয়েটির মনে জাগে, আমি আমার এই অপবিত্র অস্তিত্বকে ধুয়ে পরিষ্কার করতে চাই। কিন্তু দুনিয়ার এ পানি তো পবিত্র করতে পারবে না আমায়!

চরম অসহায়ত্ব ও উপায়হীনতা বোধ করে মেয়েটি। অবশেষে মনে মনে পরিস্থিতির হাতে তুলে দেয় নিজেকে। বলে, ভেবে আর লাভ কি, যা হবার হবে। মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে এসেছি, আপাততঃ তা-ই বা কম কিসে!

গোসল সেরে তাঁবুতে ফিরে আসে মেয়েটি। এবার তার আসল রূপ ফুটে উঠে আহমদ কামালের সামনে। মন-মাতানো দেহটিতে তার রূপের বন্যা বইছে যেন। কোন সাধারণ মেয়ে হতে পারে না এ যুবতী। মিসরের এ অঞ্চলে এই ফিরিঙ্গী মেয়েটি আসল কিভাবে? কোত্থেকে-ই বা এল? বেজায় কৌতূহল আহমদ কামালের মনে। মেয়েটির পরিচয় জানতে চান আহমদ কামাল। জবাবে সে বলে, আমি কাফেলা হারিয়ে পথ ভুলে এসেছি। ঝড়ের কবলে পড়ে ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আশ্বস্ত হলেন না আহমদ কামাল। আরো তিন-চারটি প্রশ্ন করলেন তিনি। কাঁপতে শুরু করে মেয়েটির ওষ্ঠাধর। আহমদ কামাল বললেন, যদি বলতে, আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল; ঝড়ের কবলে পড়ে দস্যুদের হাত থেকে ছুটে এখানে এসে পড়েছি, তাহলে বোধ হয় আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারতাম। কাফেলা হারিয়ে পথ ভুলে যাওয়ার কথাটা আমি মানতে পারছি না।

ইত্যবসরে এক সিপাহী তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে একটি থলে ও একটি পানির মশক আহমদ কামালের হাতে দিয়ে বলে, এগুলো মেয়েটির ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা ছিল। থলেটি হাতে নিয়ে খুলতে শুরু করেন আহমদ কামাল। সঙ্গে সঙ্গে থতমত খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে থলের মুখ চেপে ধরে মেয়েটি। ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার চেহারা। আহমদ কামাল থলেটি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, নাও তুমি-ই খুলে দেখাও।' শিশুর মত করে থলেটি পিছনে লুকিয়ে ফেলে মেয়েটি। ভয়জড়িত কণ্ঠে বলে, না, এটা কাউকে দেখান যাবে না।

আহমদ কামাল বললেন, দেখ, এমনটি আশা কর না যে, তোমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে আমি বলব, ঠিক আছে চলে যাও! তোমাকে আটকে রাখার অধিকার হয়ত আমার নেই। কিন্তু লোকালয় থেকে বহু দূরে ঘোড়ার পিঠে নিঃসঙ্গ ও অচেতন অবস্থায় যে মেয়েটিকে পাওয়া গেল, তাকে আমি এমনিতে-ই ছেড়ে দিতে পারি না। তাছাড়া এই অসহায় অবস্থায় একাকী-ই বা তোমাকে ছেড়ে দিই কি করে। একটা মানবিক কতর্ব্যও তো আমার আছে। ঠিকানা বল, আমার রক্ষী বাহিনীর হেফাজতে তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেব। অন্যথায় সন্দেহভাজন মেয়ে সাব্যস্ত করে আমি তোমাকে কায়রোতে আমাদের প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি নিশ্চিত, তুমি

মিসরীও নও, সুদানীও নও। তাহলে তুমি কে? এখানে-ই বা কেন এসেছ, এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই আমি তোমায় করতে পারি।'

চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে শুরু করে মেয়েটির। থলেটি ছুঁড়ে দেয় আহমদ কামালের সামনে। রশি দিয়ে বাঁধা থলের মুখ খুলেন আহমদ কামাল। ভিতরে আছে কয়েকটি খেজুর, আর অপর একটি থলে। কৌতূহল বেড়ে যায় আহমদ কামালের। এ থলেটিও খুললেন তিনি। পেলেন অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর সোনার তৈরি সরু শিকলে বাঁধা কালো কাঠের একটি ক্রুশ। আহমদ কামাল বুঝে ফেললেন, মেয়েটি খৃষ্টান। তিনি বোধ হয় জানতেন না যে, খৃষ্টান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খৃষ্টান বাহিনীতে যোগ দিতে আসে, একটি ক্রুশে হাত ধরিয়ে তার থেকে শপথ নেয়া হয় এবং সে ছোট্ট একটি ক্রুশ সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখে। আহমদ কামাল বললেন,থলেতে আমার প্রশ্নের জবাব নেই।'

'আমি যদি এইসবগুলো স্বর্ণ-মুদ্রা আপনাকে দিয়ে দিই, তাহলে কি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'কেমন সাহায্য?' জানতে চান আহমদ কামাল।

'আমাকে ফিলিস্তীন পৌঁছিয়ে দেবেন এবং আর কোন প্রশ্ন করবেন না।' বলল মেয়েটি।

'আমি তোমাকে ফিলিস্তীন পৌঁছিয়ে দিতে পারি। তবে প্রশ্ন করব অবশ্যই।' বললেন আহমদ কামাল।

'আমাকে যদি আপনি কিছু-ই জিজ্ঞেস না করেন, তাহলে তার জন্য আপনাকে আলাদা পুরস্কার দেব।' বলল মেয়েটি।

'কি পুরস্কার?' জানতে চান আহমদ কামাল।

'আমার ঘোড়াটি আমি আপনাকে দিয়ে দেব। আর ..........'

'আর কি?'

'আর তিনদিনের জন্য আমি আপনার দাসী হয়ে থাকব।'

আহমদ কামাল ইতিপূর্বে কখনো এতগুলো সোনা হাতে নেননি। এমন চোখ ধাঁধানো রূপ আর এমন মনোহারী নারীদেহও দেখেননি কোনদিন। সম্মুখে পড়ে থাকা চকমকে সোনার টুকরাগুলোর প্রতি তাকান আহমদ কামাল। তারপর চোখ চলে যায় তার মেয়েটির রেশম-কোমল চুলের প্রতি। সোনার তারের ন্যায় ঝিক্‌ঝিক্ করছে চুলগুলো। চোখ দু'টোতে যেন তার যাদুর আকর্ষণ। এ চোখের যাদুময় চাহনি দিয়ে-ই রাজ-রাজড়াদের একজনকে আরেকজনের শত্রুতে পরিণত করে এরা। তা-ও নিরীক্ষা করে দেখেন আহমদ কামাল।

আহমদ কামাল সুঠাম সুদেহী এক বলিষ্ঠ যুবক। সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত তিন প্লাটুন সৈনিকের কমাণ্ডার। কোন কাজে তাকে বাধা দেয়, জবাব চায়, এমন নেই কেউ এখানে।

তবু–

তবু তিনি সোনার মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে থলেতে ভরেন। ক্রুশটিও থলেতে রাখেন। তারপর নির্লিপ্তের মত থলেটি ছুঁড়ে দেন মেয়েটির কোলের মধ্যে।

'কেন, এ মূল্য কি কম?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'নিতান্ত কম। ঈমানের মূল্য আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না।' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আহমদ কামাল।

এ ফাঁকে কি যেন বলতে চায় মেয়েটি। আহমদ কামাল তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে বললেন–

'আমি আমার কর্তব্য ও আমার ঈমান বিক্রি করতে পারি না। সমগ্র মিসর আমার উপর নির্ভর করে স্বস্তিতে ঘুমায়। তিন মাস আগে সুদানীরা কায়রো আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। আমি যদি এখানে না থাকতাম, কিংবা যদি আমি তাদের কাছে আমার ঈমান বিক্রি করে দিতাম, তাহলে এই বাহিনী কায়রোতে ঢুকে পড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাত। আমার চোখে তুমি সেই বাহিনী অপেক্ষাও ভয়ংকর। কেন, তুমি কি গোয়েন্দা নও?'

'না।'

'মরুভূমির ঝড়ো-বাতাস তোমাকে কোন জালিমের কবল থেকে রক্ষা করে এখানে পাঠিয়েছে কিংবা দমকা বায়ুর মধ্যে থেকে নিজে বেরিয়ে এসেছ, এমন একটা কিছু বলে-ই কি তুমি আমাকে বুঝ দিতে চাও?' জানতে চান আহমদ কামাল।

জবাবে মেয়েটি আমতা আমতা করে যা বলল, তার কোন অর্থ দাঁড়ায় না। তাই আহমদ কামাল বললেন–

'ঠিক আছে, তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ, এসব জানবার প্রয়োজন আমার নেই। তোমার মত মেয়েদের মুখ থেকে সত্য কথা বের করানোর জন্য কায়রোতে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ আছে। আগামী কাল-ই আমি তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার পরিচয় তারা-ই নিবেন।'

'অনুমতি হলে আমি এখন একটু বিশ্রাম নিই, কাল কায়রো রওনা হওয়ার প্রাক্কালে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাব।' বলল মেয়েটি

গত রাতে এক তিল ঘুমুতে পারেনি মেয়েটি। আর দিনটি কেটেছে ভয়াবহ এক সফরের মধ্য দিয়ে। ক্লান্তিতে অবসন্ন তার দেহ। আহমদ কামালের অনুমতি নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় সে। অমনি দু' চোখের পাতা এক হয়ে আসে তার। রাজ্যের ঘুম এসে চেপে ধরে তাকে।

আহমদ কামাল দেখলেন, ঘুমের মধ্যে মেয়েটি বিড় বিড় করছে। অস্থিরতার কারণে মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে তার। মনে হল ঘুমের মধ্যে-ই কাঁদছে সে।

সাথীদের ডেকে আহমদ কামাল বলে দিলেন, একটি সন্দেহভাজন ফিরিঙ্গী মেয়েকে ধরে আনা হয়েছে। আগামীকাল তাকে কায়রো পাঠিয়ে দেয়া হবে। আহমদ কামালের চরিত্র সকলের জানা। তার ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই কারুর।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে মেয়েটি। আহমদ কামাল তাঁবু থেকে বের হয়ে ঘোড়াটির কাছে যান। দেখে হতবাক্ হয়ে যান তিনি। এ যে উন্নত জাতের ঘোড়া। এ জাতের ঘোড়া তো মুসলিম বাহিনী ছাড়া অন্য কারুর নেই। জিনটি ধরে উলট-পালট করে দেখেন আহমদ কামাল। জিনের নীচে মিসরী ফৌজের প্রতীক আঁটা। আহমদ কামালের বাহিনীর-ই ছিল এ ঘোড়াটি।

ঝড়ের কারণে হাবশীরা মেয়েদের পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে জীবিত ফেরত পৌছে যায়। পুরোহিতের নিশ্চিত ধারণা, ঝড়ের কবলে পড়ে মেয়েরা প্রাণ হারিয়েছে; ওদের কথা ভেবে আর লাভ নেই। এর মধ্যে সময়ও কেটে গেছে বেশ। বিপদ নেমে এল রজবের উপর। পুরোহিত তাকে বারবার একই কথা জিজ্ঞেস করছে, 'বল্, মেয়েরা কোথায়?' রজব দিব্যি খেয়ে বলছে, আমি কিছুই জানিনা। আমাকে না জানিয়ে-ই ওরা পালিয়েছে। রজবের উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে হাবশীরা। তরবারীর আগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে রক্তাক্ত করছে আর বলছে, 'বল্ মেয়েরা কোথায়?' রজবের সঙ্গীদেরকেও তারা গাছের সঙ্গে বেঁধে অত্যাচার শুরু করে। দেশ ও জাতির সঙ্গে গাদ্দারী করার শাস্তি ভোগ করছে রজব। রাতেও তার বাঁধন খোলা হয়নি। আঘাতে আঘাতে চালনির মত ঝাঝরা হয়ে গেছে তার দেহ।

আহমদ কামালের তাঁবুতে শুয়ে আছে মেয়েটি। সূর্যাস্তের আগে একবার জেগেছিল সে। তাকে খাবার খাওয়ান আহমদ কামাল। তারপর পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ে সে। তার থেকে দু'-তিন গজ দূরে শয়ন করেন আহমদ কামাল। কেটে যাচ্ছে রাত। টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলছে তাঁবুতে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠে মেয়েটি। ঘুম ভেঙ্গে যায় আহমদ কামালের। ধড়মড় করে উঠে বসে সে। ভয়ে থর্থর্ করে কাঁপছে তার দেহ। চোখে-মুখে ভীতির ছাপ। কাছে এসে বসেন আহমদ কামাল। কাঁপতে কাঁপতে আহমদ কামালের গা ঘেঁষে বসে মেয়েটি। কম্পিত কণ্ঠে বলে, ওদের থেকে আমাকে বাঁচাও। ওরা আমায় কুমীরের ঝিলে নিক্ষেপ করছে। আমার মাথা কাটতে চেয়েছে ওরা!

'কারা?' জিজ্ঞেস করেন আহমদ কামাল।

'ঐ কৃষ্ণাঙ্গ হাবশীরা। এখানে এসেছিল ওরা।' ভয়জড়িত কণ্ঠে বলে মেয়েটি।

হাবশীদের বলির কথা জানতেন আহমদ কামাল। মনে তার সংশয় জাগে, বোধ হয় একে বলি দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন। ভয় যেন আরো বেড়ে যায়। আহমদ কামালের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কর না; আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।' আহমদ কামাল দেখলেন, ভয়ে মেয়েটি আধখানা হয়ে গেছে। তিনি তাকে সান্ত্বনা দেন। অভয় দিয়ে বলেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক, এখান থেকে তোমাকে তুলে নিতে কেউ আসবে না।' মেয়েটি বলল, 'আমি আর ঘুমাতে পারব না। আপনি বসে বসে আমার সাথে কথা বলুন। একা একা জেগেও আমি সময় কাটাতে পারব না। আমি পাগল হয়ে যাব।'

আহমদ কামাল বললেন, ঠিক আছে, আমিও তোমার সঙ্গে সজাগ বসে থাকব। আলতো পরশে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আহমদ কামাল বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে আছি, ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নেই।'

দীর্ঘক্ষণ জেগে কাটায় মেয়েটি। আহমদ কামালও সজাগ বসে থাকেন তার পার্শ্বে। হাবশীদের ব্যাপারে তিনি মেয়েটিকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি। তুরস্ক ও মিসরের গল্প শোনাতে থাকেন তাকে। আহমদ কামালের গা ঘেঁষে বসে আছে সে। আহমদ কামাল অত্যন্ত মিশুক মানুষ। রসের কথা বলে বলে মেয়েটির মন থেকে ভয় দূর করে দেন তিনি। এক সময় প্রসন্নচিত্তে ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটি।

মেয়েটির যখন ঘুম ভাঙ্গে, রাতের তখন শেষ প্রহর। আহমদ কামাল নামায পড়ছেন। মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার প্রতি। তন্ময়চিত্তে আহমদ কামালের নামায পড়া দেখছে সে। দু'আর জন্য হাত উঠান আহমদ কামাল। চোখ দু'টো বন্ধ করেন। একনাগাড়ে নির্নিমেষ নয়নে মেয়েটি তাকিয়ে আছে আহমদ কামালের মুখের প্রতি। দু'আ শেষ করে হাত নামান আহমদ কামাল। চোখ খুললে দৃষ্টি পড়ে জাগ্রত মেয়েটির প্রতি।

'হাত তুলে খোদার কাছে আপনি কি প্রার্থনা করলেন?' কৌতূহলী মনে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'অন্যায় প্রতিরোধের সাহস।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

আপনি কি খোদার কাছে কখনো সুন্দরী নারী আর সোনা-দানা চাননি?

'এ দু'টি বস্তু তো প্রার্থনা ছাড়া-ই আল্লাহ আমাকে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ওসবের উপর আমার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ বোধ হয় আমায় পরীক্ষা নিতে চাইছেন।' বললেন আহমদ কামাল।

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি আপনাকে অন্যায়ের মোকাবেলা করার হিম্মত দিয়েছেন?' প্রশ্ন করে মেয়েটি।

'কেন! তুমি কি দেখনি? তোমার এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর তোমার রূপ-মাধুর্য্য তো আমাকে আমার আদর্শ থেকে এক চুল সরাতে পারেনি! এ আমার প্রচেষ্টা আর আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের প্রতিফল।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

'আল্লাহ কি গুনাহ মাফ করেন?' জানতে চায় মেয়েটি।

'আলবৎ, তাওবা করলে আমাদের আল্লাহ মানুষের গুনাহ মাফ করে দেন। শর্ত হল, তাওবা করার পর সে পাপ আবার করা যাবে না।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

আহমদ কামালের জবাব শুনে মাথা নত করে মেয়েটি। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকে দু'জন। মেয়েটির ফোঁপানির শব্দ পান আহমদ কামাল। অবনত মাথাটা ধরে উপরে তুলে দেন তিনি। গুমরে কাঁদছে মেয়েটি। চোখ তার অশ্রুসজল। আহমদ কামালের হাত চেপে ধরে সে। হাতে চুমো খায় কয়েকবার। আহমদ কামাল নিজের হাত গুটিয়ে নেন।

রুদ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলে, 'আজ-ই আমরা সম্পর্কহীন হয়ে পড়ব। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন কায়রো। আর হয়ত কোনদিন দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটবে না। আমার মন আমাকে বাধ্য করছে যে, আমি বলে দিই, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি। তারপর আপনাকে জানিয়ে দিই, এখন আমি কী।'

'তোমার যাত্রার সময় হয়ে গেছে। আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যাব। এমন একটি স্পর্শকাতর গুরুদায়িত্ব আমি অন্য কারো উপর ন্যাস্ত করতে পারি না।'

'তবে কি শুনবে না আমার পরিচয়, আমার ইতিবৃত্ত?' নিরাশার সুরে বলল মেয়েটি।

'উঠ, এসব শ্রবণ করা আমার কাজ নয়।' বলে-ই তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন আহমদ কামাল।

❁❁❁

কায়রো অভিমুখে এগিয়ে চলছে ছয়টি ঘোড়া। একটিতে আহমদ কামাল। তাঁর পিছনের ঘোড়ায় মেয়েটি আর তার পিছনে পাশাপাশি চলছে রক্ষীদের চারটি ঘোড়া। একেবারে পিছনে একটি উট। তাতে সফরের সামান-খাবার-পানি ইত্যাদি বোঝাইকরা।

আহমদ কামালের ক্যাম্প থেকে কায়রো অন্তত ছত্রিশ ঘন্টার পথ। এগিয়ে চলছে কাফেলা। মেয়েটি দু' দু'বার তার ঘোড়াটি নিয়ে আসে আহমদ কামালের পাশে। কিন্তু প্রতিবার-ই তিনি তাকে পিছনে পাঠিয়ে দেন। কোন কথা বলছেন না মেয়েটির সঙ্গে। সূর্যাস্তের পর এক স্থানে কাফেলা থামান আহমদ কামাল। এখানে রাত যাপন করতে হবে। তাঁবু ফেলতে আদেশ করেন তিনি।

রাতে আহমদ কামাল নিজের তাঁবুতে ঘুমুতে দেন মেয়েটিকে। প্রদীপ জ্বালিয়ে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যান নিজে।

হঠাৎ চোখ খুলে যায় আহমদ কামালের। কে যেন আলতো পরশে হাত বুলাচ্ছে তার মাথায়। চমকে উঠেন তিনি। ঘুমের রেশ কাটিয়ে তিনি দেখতে পান, মেয়েটি তার শিয়রে বসা। মেয়েটির হাত তার মাথায়। দ্রুত উঠে বসেন আহমদ কামাল। তাকালেন মেয়েটির প্রতি। অশ্রুর বন্যা বইছে যেন তার চোখে। দু' হাতে আহমদ কামালের হাত চেপে ধরে চুম্বন করে সে। শিশুর মত রয়ে রয়ে কাঁদতে শুরু করে। গম্ভীর চোখে একদৃষ্টে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে থাকেন আহমদ কামাল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মেয়েটি বলল, 'আমি তোমার দুশমন। আমি গুপ্তচরবৃত্তি, তোমাদের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি এবং সালাহুদ্দীন আইউবীকে হত্যা করার আয়োজন সম্পন্ন করতে ফিলিস্তীন থেকে তোমাদের দেশে রওনা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমার হৃদয় থেকে তোমাদের প্রতি শত্রুতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আর আমি গুপ্তচর নই, তোমাদের শত্রুও নই।'

'কেন?' প্রশ্ন করেন আহমদ কামাল। কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না করে-ই তিনি বললেন, তুমি একটি ভীরু মেয়ে। তুমি স্বজাতির সঙ্গে গাদ্দারী করছ। শূলে চড়েও

তোমাকে বলা উচিত, 'আমি খৃষ্টান। মুসলমান আমার জাতশত্রু। ক্রুশের জন্য জীবন দিয়ে আমি গর্ববোধ করছি।' বললেন আহমদ কামাল।

'কেন?' প্রশ্ন করেছেন, তার জবাবটা শুনে নিন ভাই! আমার জীবনে আপনি-ই প্রথম পুরুষ, যিনি এই রূপ-যৌবনকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেললেন। অন্যথায় কি আপন, কি পর সকলের চোখেই আমি এক খেলনা। আমার দৃষ্টিতেও আমার জীবনের লক্ষ্য এই পুরুষদের নিয়ে তামাশা করব, আনন্দ দেব, আনন্দ নেব, রূপের জালে আটকিয়ে পুরুষদের ধোঁকা দেব, আয়েশ করব। প্রশিক্ষণও পেয়েছি আমি এ কাজের-ই। আপনারা যাকে বেহায়াপনা বলেন, আমার জন্য তা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশল, একটি অস্ত্র। ধর্ম কি, আল্লাহর বিধান বলতে কি বুঝায়, তা আমি জানি না। আমি চিনি শুধু ক্রুশ। শৈশবে-ই আমার মন-মগজে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল, ক্রুশ হল খোদার নিদর্শন, খৃষ্টবাদের মহান প্রতীক। সমগ্র বিশ্বে কর্তৃত্ব করার অধিকার একমাত্র এই ক্রুশের অনুসারীদের আর মুসলমান হল ক্রুশের শত্রু। তাদের রাজত্ব করার অধিকার নেই। বেঁচে থাকতে চাইলে থাকতে হবে ক্রুসেডারদের পদানত হয়ে। এ ক'টি কথা-ই আমার ধর্মের মূল ভিত্তি জানি। আমাকে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের প্রশিক্ষণ দিয়ে বলা হয়েছিল, এটি তোমার পবিত্র কর্তব্য . . . . .।

এ পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে মেয়েটি আহমদ কামালকে জিজ্ঞেস করে–

'রজব নামে আপনাদের এক সালার আছে। তাকে জানেন আপনি?'

'জানি। সে খলীফার রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার। সুদানীদের মিসর আক্রমণের ষড়যন্ত্রে সে-ও জড়িত ছিল।' জবাব দেন আহমদ কামাল।

'এখন সে কোথায়, জানেন?'

'আমার জানা নেই। আমি শুধু এতটুকু আদেশ পেয়েছি যে, রজব পালিয়ে গেছে। যেখানে পাবে, সেখানেই ধরে ফেলবে। পালাতে চেষ্টা করলে তীর ছুঁড়ে শেষ করে দিবে।

'আমি কি বলে দেব, এখন সে কোথায়? সে সুদানে হাবশীদের নিকট আছে। সেখানে একটি মনোরম জায়গা আছে। সেখানে মেয়েদেরকে দেবতার নামে বলি দেয়া হয়। রজব সেখানেই অবস্থান করছে। আমি জানি সে দলত্যাগী সালার। তার সঙ্গে ফিলিস্তীন থেকে এসেছিলাম আমরা তিনটি মেয়ে।'

'অপর দু'জন কোথায়?'

সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠে মেয়েটির দু'চোখ। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে, 'তারা মারা গেছে। তাদের মৃত্যুই আমাকে বদলে দিয়েছে।'

এই বলে মেয়েটি আহমাদ কামালকে সুদীর্ঘ এক কাহিনী শোনায়। রজবের সঙ্গে কিভাবে তারা ফিলিস্তীন থেকে এসেছিল, কিভাবে হাবশীরা তাদের দু'টি মেয়েকে দেবতার নামে বলি দিতে চেয়েছিল, কিভাবে তারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে, কিভাবে মরু ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে তার দুই সহকর্মী প্রাণ হারাল, সব কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করে মেয়েটি। সে বলে–

'আমি নিজেকে রাজকন্যা মনে করতাম। রাজা-বাদশাদের হৃদয়ে আমি রাজত্ব করেছি। একজন আল্লাহ আছেন, মৃত্যু আছে, এমনটি কল্পনায়ও আসেনি আমার কখনো। আমাকে পাপের সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। আমিও অবলীলায় অবগাহন করতে থাকি তাতে। অপার আনন্দ পেতাম সেই অবগাহনে। হাবশীদের মহল্লায় গিয়ে আমি হাঙ্গর-কুমীর দেখলাম। বলি দেয়া মেয়েদের মস্তক আর কর্তিত দেহ নিক্ষেপ করা হয় ওদের মুখে। রজব ও দুই সঙ্গী মেয়ের সাথে যখন ঘুরতে যাই, কুমীরগুলো তখন ঝিলের কূলে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল। তাদের কুৎসিত বিকট দেহ দেখে আমি কেঁপে উঠি। আমার এই দেহটিকে– যা রাজা-বাদশাদের মস্তক অবনত করে দেয়– হাবশীরা কুমীরের আহারে পরিণত করতে চেয়েছিল। আমাকে বলি দেয়ার দিন-তারিখ ধার্য হয়ে গিয়েছিল। আমি মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার দেহের প্রতিটি শিরা জেগে উঠে। আমি নিজের ভিতর থেকে আওয়াজ শুনতে পাই, এই হল রূপ আর দেহের অপব্যবহারের পরিণতি। আমি জীবন বাজি রেখে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। ফিলিস্তীন থেকে আমাদেরকে রজবের সঙ্গে পাঠান হয়েছিল। কথা ছিল, ও আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু সে নিজে-ই আমাদের প্রতি হাত প্রসারিত করে বসে . . . . .।

হাবশীদের কঠিন অক্টোপাশ ছিঁড়ে রাতের আঁধারে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম আমরা তিনজন। রজব আমাদের কোন সহযোগিতা করেনি। হাবশীদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার কোন পদক্ষেপও সে নেয়নি। মরুভূমিতে আমাদের কোন আশ্রয় ছিল না। আমরা ঝড়ের কবলে পড়ে গেলাম। প্রথমে একটি মেয়ে ছিটকে পড়ে যায় ঘোড়ার পিঠ থেকে। তাকে পিষে ফেলে তার ঘোড়া। দ্বিতীয় মেয়েটি যখন ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, তখন এক পা আটকে গেল তার ঘোড়ার রেকাবে। ঝুলন্ত অবস্থায় ঘোড়ার সঙ্গে মাটিতে হেঁচড়াতে লাগল। এভাবে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তার ঘোড়া তাকে অন্ততঃ দু' মাইলেরও বেশী পথ নিয়ে আসে। তার আর্তচীৎকারে আমার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এখনও তার সেই করুণ চীৎকার-ধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। যতদিন বেঁচে থাকব, তার সেই চীৎকার আমার কানে বাজতেই থাকবে।

প্রবল ঝড়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করে আমার ঘোড়া। আমি ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। সঙ্গী দু' মেয়েকে মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমার পরিণতি কী হবে। ওরা ছিল আমার চেয়েও রূপসী। বহু রাজা-বাদশাহ ছিল তাদের হাতের পুতুল। রূপের অহংকার ছিল তাদেরও। কিন্তু এমনি ভয়ংকর মৃত্যু তাদের চাপা দিয়ে রেখেছে মরুভূমির বালির নীচে।

আমি এখন একা। ঝড়ের শো শো শব্দকে মনে হতে লাগল, যেন মৃত্যু দাঁত বের করে আমার দিকে তাকিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসছে। আমার মাথার উপরে, সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে আমি ভুত-প্রেত ও মৃত্যুর অট্টহাসি শুনতে পেলাম।

এমন এক মহাবিপদে নিক্ষিপ্ত হয়েও আমি চৈতন্য হারাইনি। হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে আমি ভাবনার সাগরে ডুবে গেলাম। বুঝলাম, এ আর কিছুই নয়– আল্লাহ্ আমাকে

আমার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র কথা মনে পড়ে যায় আমার। দু' হাত উপরে তুলে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলাম তাঁকে। কেঁদে কেঁদে তাওবা করলাম। ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তারপর চৈতন্য হারিয়ে যায় আমার . . . . .।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে দেখলাম, আমি আপনার কব্জায়। আপনার গৌরবর্ণ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, আপনি ইউরোপিয়ান কেউ হবেন আর আমি ফিলিস্তীনে। এ ধোঁকায় পড়ে আমি কথা বললাম ইংরেজীতে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? আমি কোথায়? যখন জানতে পারলাম, আমি মুসলমানের কব্জায় এসে পড়েছি এবং যেখানে আছি, জায়গাটা ফিলিস্তীন নয়– মিসর, তখন মনটা আমার ছ্যাৎ করে উঠে। ভয়ে আমি শিউরে উঠি। ভাবলাম, এভাবে দুশমনের হাতে এসে পড়ার চেয়ে ঝড়ে জীবন দেয়া-ই তো ভাল ছিল। জীবনে রক্ষা পেয়ে আমার লাভটা কী হল। প্রশিক্ষণে আমাদেরকে ধারণা দেয়া হয়েছিল, মুসলমানরা নারীর সাথে হিংস্র প্রাণীর ন্যায় আচরণ করে। আপনার পরিচয় পেয়ে আমার সে কথাটা-ই মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে যে আচরণ করলেন, তা ছিল আমার কল্পনারও অতীত। আপনি এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে ফেললেন, আমাকেও সরিয়ে দিলেন। আমার এই উপচেপড়া রূপ আর মধুভরা দেহ আপনাকে এতটুকুও আকর্ষণ করতে পারল না। এ এক পরম আশ্চর্য-ই বটে। কিন্তু তখনও আমার ভয় কাটেনি। মনে মনে ভাবছিলাম, যদি একজন সৎ মানুষ পেয়ে যেতাম, যে আমাকে একটু আশ্রয় দেবে, আমায় পবিত্র মনে নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নেবে! আপনার চরিত্র যে এত পবিত্র, তখনও আমি তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারিনি।

আমার আশংকা ছিল, রাতে আপনি আমায় উত্যক্ত করবেন। স্বপ্নে আমি কুমীর দেখলাম, হাবশী-হায়েনা ও মরুঝড়ের তান্ডব দেখলাম। ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। আপনি আমায় বুকের সঙ্গে লাগিয়ে নিলেন, শিশুদের ন্যায় গল্প শুনিয়ে আমাকে শান্ত করলেন, ঘুম পাড়ালেন। শেষ রাতে জেগে দেখলাম, আপনি আল্লাহ্‌র সমীপে সেজদায় পড়ে আছেন। যখন আপনি দু'আর জন্য হাত উঠালেন, চোখ বন্ধ করলেন, তখন আপনার চেহারায় যে আনন্দ, প্রশান্তি আর দ্যুতি আমি দেখতে পেলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো এমনটি দেখিনি কারুর মুখে। আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম, আপনি মানুষ না ফেরেশতা। এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা আর আমার মত যুবতী থেকে কোন মানুষ তো বিমুখ হতে পারে না!

আপনার মুখমন্ডলে আমি যে প্রশান্তি ও দীপ্তি দেখেছিলাম, তা আমার দু'চোখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, এ প্রশান্তি আপনাকে কে দিল? কিন্তু কেন যেন প্রশ্নটা চেপে গেলাম। আপনার অস্তিত্বে আমি এত প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আসল সত্য গোপন রেখে আপনাকে ধাঁধার মধ্যে রাখতে চাইলাম না। আমি চেয়েছিলাম, নিজের সব ইতিবৃত্ত আপনার কাছে প্রকাশ করি। বিনিময়ে আপনি আপনার এই চরিত্র-মাধুর্য আর এই প্রশান্তির পরশ দিয়ে আমার হৃদয়ের

সব ভীতি, সব যন্ত্রণা দূর করে দেবেন। কিন্তু আপনি আমার কথা শুনলেন না; আপনার কর্তব্য-ই ছিল আপনার কাছে প্রিয়।'

আবেগের আতিশয্যে মেয়েটি আহমদ কামালের হাত চেপে ধরে এবং বলে, 'একেও হয়ত আপনি আমার প্রতারণা মনে করবেন। কিন্তু আপনার প্রতি আকুল নিবেদন, আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন, আমার হৃদয়ের কথাগুলো শুনুন। আপনার থেকে আর আমি বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। কাল আপনাকে পাপের আহ্বান জানিয়ে আমি বলেছিলাম, আপনি আমাকে দাসী বানিয়ে নিন। কিন্তু আজ নিতান্ত পবিত্র মনে আমি বলছি, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, আমি আপনার-ই পায়ে পড়ে থাকব। দাসী হয়ে আমি আপনার সেবা করব। বিনিময়ে আমি চাই শুধু সেই প্রশান্তি, যা নামায পড়ার সময় আপনার চেহারায় আমি দেখেছিলাম।

আহমদ কামাল বললেন, 'আমাকে তুমি ধোঁকা দিচ্ছ, একথা যেমন আমি বলব না, তেমনি আমার জাতি এবং আমার মিশনের সঙ্গেও আমি প্রতারণা করতে পারি না। আমার কাছে তুমি আমানত। আমি আমানতে খেয়ানত করতে পারি না। তোমার সঙ্গে আমি যে আচরণ করেছি, তা ছিল আমার কর্তব্য। এ দায়িত্ব থেকে তখন-ই আমি অব্যাহতি পাব, যখন তোমাকে আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতে তুলে দেব আর তারা আমাকে আদেশ করবেন, আহমদ কামাল! এবার তুমি চলে যাও।'

মেয়েটি আসলেই প্রতারণা করছিল না। এবার কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে সে বলল, 'আপনার আদালত যখন আমাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করবে, আপনি তখন আমার হাত ধরে রাখবেন। আমার এই একটি মাত্র আবেদন আপনার কাছে। ফিলিস্তীন পৌঁছিয়ে দেয়ার কথা আমি আর আপনাকে বলব না। আপনার কর্তব্যের পথে আমি বাঁধা সৃষ্টি করতে চাই না। আপনি শুধু আমাকে এতটুকু বলুন যে, আমি তোমার ভালবাসা বরণ করে নিয়েছি। আমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিন, এ আবদার আমি আপনার কাছে করব না। কারণ, আমি একটি অপবিত্র মেয়ে। আমার শিক্ষাগুরুরা আমাকে পাথরে পরিণত করে দিয়েছে। আমার মধ্যে যে মানবিক চেতনা বলতে কিছু নেই; তা-ও আমি বুঝি। কিন্তু আল্লাহ আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ পাথর হতে পারে না। যে যেভাবে-ই গড়ে উঠুক, একদিন না একদিন এ প্রশ্ন করতেই হয় যে, 'সরল পথ কোন্‌টি?'

ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে রাত আর কথা বলে চলেছে দু'জন। এক পর্যায়ে আহমদ কামাল মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, তোমার মত মেয়েদেরকে আমাদের দেশে পাঠিয়ে তাদের দ্বারা কি কাজ নেয়া হয়?'

'নানা রকম কাজ। কতিপয়কে মুসলমানের বেশে আমীরদের হেরেমে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তারা প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা মোতাবেক আমীর-উজীরদের কাবু করে নেয়। তাদের দ্বারা খৃষ্টানদের মনোপূতঃ লোকদেরকে উঁচু উঁচু পদে আসীন করানো হয়। যেসব কর্মকর্তা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করানো হয়। মুসলমান মেয়েরা ততটা চতুর নয়। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিভোর থাকে তারা।

তারা মুসলিম শাসকদের হেরেমের রাণীর মর্যাদা পায় ঠিক; কিন্তু মুসলিমবেশী একটি খৃষ্টান কিংবা ইহুদী মেয়ে বিচক্ষণতার মাধ্যমে তাদেরকে কোণঠাসা করে রাখে। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান মেয়েরাই হয়ে বসে হেরেমের দন্ডমুন্ডের অধিকারীনী।

বর্তমানে ইসলামী সরকারগুলোর আমীর-উজীরদের অন্ততঃ অর্ধেক সিদ্ধান্ত হয় আমার জাতির স্বার্থের অনুকূল।

মেয়েদের আরো একটি দল আছে। তারা ইসলামী নাম ধারণ করে মুসলমানদের স্ত্রী হয়ে যায়। তাদের কাজ হল সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর মেয়েদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে তাদের বিপথগামী করে তোলা। তারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে কু-পথে নামিয়ে দিয়ে তাদের দ্বারা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবৈধ প্রেম-প্রণয় সৃষ্টি করিয়ে মুসলিম সমাজকে কলুষিত করে। আমার মত মেয়েরা অতি গোপনে আপনাদের এমন এমন পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে পৌছে যায়, যারা শেষ পর্যন্ত তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। আমার মত মেয়েদেরকে তারা এমনভাবে হেফাজত করে রাখে যে, তাদের প্রতি সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও থাকে না। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝে পরস্পর দ্বন্ধ-বিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী ও নুরুদ্দীন জঙ্গীর মাঝে বিরাগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ঠিক এমনি বরং এর চেয়ে জঘন্য এক কাজের জন্য আরো দু'টি মেয়েসহ আমাকে তুলে দেয়া হয়েছিল রজবের হাতে।

রাতভর মেয়েটি খৃষ্টানদের গোপন কার্যক্রম ও মুসলমানদের ঈমান বেচাকেনার বিস্তারিত বিবরণ শোনাতে থাকে, আর আহমদ কামাল তন্ময় হয়ে তা শুনতে থাকেন।

পরদিন সূর্যাস্তের আগেই কায়রো পৌছে যায় কাফেলা। আহমদ কামাল আলী বিন সুফিয়ানের নিকট যান এবং মেয়েটির ব্যাপারে সম্পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করেন। আহমদ কামাল আরো জানান, রজব এখন হাবশীদের কাছে। হাবশীরা যে স্থানে নারী বলি দিয়ে থাকে, রজব সেখানে তার আস্তানা গেড়েছে। আহমদ কামাল আলী বিন সুফিয়ানকে আরো বলেন, যদি আদেশ হয়, তাহলে আমি রজবকে জীবিত কিংবা মৃত ধরে আনতে পারি। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান সে আদেশ তাকে দিলেন না। কারণ, এরূপ অভিযানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচক্ষণ ও সুদক্ষ স্বতন্ত্র বাহিনী-ই তার আছে। রজব পর্যন্ত পৌছানোর পন্থাও আহমদ কামাল আলীকে অবহিত করেন। রজবকে ধরে আনার জন্য তিনি আগেই একটি বাহিনী সুদান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে তিনি ছয়জন অতীব বিচক্ষণ সৈন্যকে রজবকে ধরে আনার জন্য আংগুক অভিমুখে রওনা করান। আহমদ কামালকে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দেন। মেয়েটিকে ডেকে আনেন নিজের কাছে।

আলী বিন সুফিয়ান আহমদ কামালকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে মেয়েটির সামনে বসিয়ে দেন। মুচকি একটি হাসি দিয়ে কথা বলতে শুরু করে মেয়েটি। কোন কথা-ই গোপন

রাখল না সে। শেষে বলল, 'আমাকে যদি মৃত্যুদন্ড-ই দিতে হয়, তাহলে আমার একটি অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। আমি আহমদ কামালের হাতে মরতে চাই।' মেয়েটি আহমদ কামালের এত অনুরক্ত কেন হল, তার বিবরণও দিল সে।

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটিকে কারাগারে প্রেরণের পরিবর্তে আহমদ কামালের হাতে অর্পণ করে নিজে সুলতান আইউবীর নিকট চলে যান। মেয়েটির সব কথা তিনি আইউবীকে অবহিত করেন। বলেন, 'আপনার অতিশয় নির্ভরযোগ্য সেনাকর্মকর্তা ফয়জুল ফাতেমী আমাদের দুশমন। তার-ই নিকট আগমনের পরিকল্পনা ছিল মেয়েদের।' সুলতান আইউবী প্রথম বললেন, 'হয়ত বা মেয়েটি মিথ্যে বলছে। তোমাকে সে বিভ্রান্ত করছে। আমার জানামতে ফয়জুল ফাতেমী এমন ধারার লোক নয়।'

'আমীরে মুহতারাম! আপনি ভুলে গেছেন যে, লোকটি ফাতেমী। বোধ হয় এ কথাটাও আপনার মনে নেই যে, ফাতেমী ও ফেদায়ীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক। এরা আপনার অনুগত হতেই পারে না।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান সুলতান আইউবী। সম্ভবতঃ তিনি ভাবছিলেন, এমন হলে বিশ্বাস করব কাকে? কাজ-ই বা করব কাদের নিয়ে? কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'আলী! ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করার অনুমতি আমি তোমায় দেব না। তুমি এমন কৌশল অবলম্বন কর, যেন অপরাধ করা অবস্থায় তাকে হাতে-নাতে ধরা যায়। আমি তাকে স্পটে গ্রেফতার করতে চাই। আর সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দায়িত্ব তোমার। ফয়জুল ফাতেমী যুদ্ধের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্মকর্তা। রাজ্যের সমর বিষয়ক সব তথ্য তার কাছে। লোকটি এত জঘন্য অপরাধের অপরাধী কি-না অতি শীঘ্র আমি তার প্রমাণ চাই।'

আলী বিন সুফিয়ান গোপন তথ্য সংগ্রহে অভিজ্ঞ। এটি তার সৃষ্টিগত প্রতিভা। তিনি কৌশল খুঁজে বের করলেন এবং সুলতান আইউবীকে বললেন, 'মেয়েটি যেসব বিপদ অতিক্রম করে এসেছে, তার ভীতি তার মন-মানসিকতাকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে এবং আহমদ কামালের প্রতি সে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। কারণ, আহমদ কামাল তাকে বিপদসংকুল পথ থেকে উদ্ধার করেছে এবং তার সঙ্গে এমন পবিত্র আচরণ করেছে যে, তাতে মুগ্ধ হয়ে মেয়েটি এখন তাকে ছাড়া কথা-ই বলছে না। আমার আশা, আমি এই মেয়েটিকে কাজে লাগাতে পারব।'

'চেষ্টা করে দেখ। কিন্তু মনে রেখ, সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া ফয়জুল ফাতেমীকে গ্রেফতার করার অনুমতি আমি তোমাকে কিছুতেই দেব না। ফয়জুল ফাতেমীর মত লোক দুশমনের ক্রীড়নক হয়ে গেছে, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' বললেন সুলতান আইউবী।

আলী বিন সুফিয়ান চলে যান মেয়েটির কাছে। তাকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান। জবাবে মেয়েটি বলল, 'আহমদ কামাল যদি বলেন, তাহলে আগুনে ঝাঁপ দিতেও

আমি প্রস্তুত।' সামনে উপবিষ্ট আহমদ কামাল বললেন, 'না, ইনি যেভাবে যা বলেন, তুমি তা-ই কর। পরিকল্পনাটা ভাল করে বুঝে নাও। আবেগমুক্ত হয়ে কাজ কর।'

'কিন্তু এর পুরস্কার আমি কী পাব?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'তোমাকে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে ফিলিস্তীনের দুর্গ শোবকে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। আর এখানে যে ক'দিন থাকবে, তোমাকে মর্যাদার সঙ্গে রাখা হবে।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

'নাহ, এ পুরস্কার যৎসামান্য। আমি যা চাইব, তা-ই আমাকে দিতে হবে। আমি ইসলাম গ্রহণ করব আর আহমদ কামাল আমাকে বিয়ে করে নেবেন।' বলল মেয়েটি।

দাবীর দ্বিতীয় অংশটি সরাসরি নাকচ করে দেন আহমাদ কামাল। আলী বিন সুফিয়ান আহমদ কামালকে বাইরে নিয়ে যান। আহমদ কামাল বললেন, 'মেয়েটি মুসলমান হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও আমি তাকে দুশমন মনে করব।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'দেশ ও জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে এতটুকু তোমাকে ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।' আহমদ কামাল সম্মতি দেন। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'আমি যেহেতু এ যাবত তোমাকে অবিশ্বাস করে আসছি, তাই তোমাকে বিয়ে করতে আমি অস্বীকার করেছি। কিন্তু যদি তুমি প্রমাণ দিতে পার যে, আমাদের ধর্মের জন্য তোমার ত্যাগ স্বীকার করার স্পৃহা আছে, তাহলে আমি আজীবন তোমাকে ভালোবেসে যাব।'

আলী বিন সুফিয়ানকে উদ্দেশ করে মেয়েটি বলল, 'বলুন, আমাকে কী করতে হবে। আমিও দেখে ছাড়ব, মুসলমান প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কতটুকু পরিপক্ক। আমার আরো একটি শর্ত হল, অভিযানে আহমদ কামাল আমার সঙ্গে থাকবেন।

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটির এ শর্তও মেনে নেন এবং আহমদ কামাল ও মেয়েটির বাসস্থানের ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। তারপর কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আহমদ কামালের উপস্থিতিতে মেয়েটিকে তার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করেন।

✿ ✿ ✿

তিনদিনের মাথায় আলী বিন সুফিয়ানের প্রেরিত ছয়জন সৈনিক গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তিন খৃষ্টান মেয়ে যেখান থেকে পলায়ন করেছিল, রজব যেখানে বন্দী আছে, হাবশীদের সেই দেবমন্দিরে এসে তারা উপনীত হয়। তারা সব ক'জন-ই উষ্ট্রারোহী। ছদ্মবেশে নয়– এসেছে তারা মিসরী ফৌজের পোষাকে। হাতে তাদের বর্শা ও তীর-তলোয়ার। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা সরাসরি হাবশীদের দুর্গে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ কোন্ দিক থেকে যেন একটি বর্শা এসে তাদের সম্মুখে মাটিতে বিদ্ধ হয়। এর অর্থ, থাম, আর এক পা-ও এগুবে না। তোমরা আমাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। তারা থেমে যায়। পুরোহিত সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে তার তিনজন হাবশী। হাতে তাদের বর্শা। পুরোহিত সতর্ক করে দিয়ে বলে,

তোমরা আমার গুপ্ত তীরান্দাজদের কবলে আছ। বাড়াবাড়ি করলে একজনও জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে না।

তারা অস্ত্র সমর্পণ করে। হাতের বর্শা-তীর-তরবারী হাবশীদের সামনে ফেলে দেয়। উটের পিঠ থেকে নেমে আসে। কমান্ডার হাবশী পুরোহিতের সঙ্গে মোসাফাহা করে বলেন, 'আমরা আপনার সুহৃদ। বন্ধুত্ব নিয়ে-ই ফিরে যাব। আচ্ছা, মেয়ে তিনজনকে বলি দিয়েছেন আপনি?'

কম্পিত কণ্ঠে পুরোহিত জবাব দেন, 'না, কোন মেয়েরই বলি হয়নি! তা আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'আমরা মিসরী ফৌজের বিদ্রোহী সেনা। আমরা আপনাদের দেবতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই। আপনাদের লোকেরা আমাদের বলেছে যে, দেবতার সমীপে নারী বলি না হওয়া-ই নাকি আপনাদের পরাজয়ের কারণ। আমরা রজবের সঙ্গে ছিলাম। আমরা তাকে বলেছিলাম, তিনটি ফিরিঙ্গী মেয়ে অপহরণ করে নিয়ে আসব এবং একটির স্থানে তিনটি মেয়ে বলি দিয়ে দেবতার কুমীরদের খাওয়াব। পরিকল্পনা মোতাবেক বহু দূর থেকে তিনটি মেয়ে অহরণ করে এনে আমরা তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মেয়েদের নিয়ে সে এখানে চলে এসেছিল। বলির কাজ সম্পন্ন হল কি-না আমরা তার খোঁজ নিতে এলাম।' বললেন কমাণ্ডার।

ফাঁদে আটকে যান পুরোহিত। বললেন, রজব আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। তিনটি মেয়ে সে নিয়ে এসেছিল ঠিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কু-মতলব পেয়ে বসে তাকে। বলির জন্য আমার হাতে অর্পণ না করে বেটা ভাগিয়ে দিয়েছে ওদের। ধরা পড়ে গেছে নিজে। আমরা তাকে পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি। আচ্ছা, তোমরা কি আমাকে দু'টি মেয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পার? দেবতাদের অসন্তোষ যে দিন দিন বেড়ে-ই চলেছে!

'পারব মানে? অবশ্যই পারব। আপনি অপেক্ষা করুন; দেখবেন, অল্প ক'দিনের মধ্যে-ই আমরা মেয়ে নিয়ে হাজির হব। আমাদেরকে রজবের কাছে নিয়ে চলুন। মেয়েগুলো কোথায় আছে তাকে জিজ্ঞেস করি।' বললেন কমাণ্ডার।

তাদের সকলকে ভিতরে নিয়ে যান পুরোহিত। এক স্থানে চওড়া ও গোলাকার একটি মাটির পাত্র। সেটি আরেকটি পাত্র দিয়ে ঢাকা। পুরোহিত উপরের পাত্রটি তুলে সরিয়ে রেখে নীচের পাত্রে হাত দেন। আস্তে আস্তে হাত বের করে আনেন। হাতে রজবের মাথা। মুখমন্ডলের আকৃতি সম্পূর্ণ অবিকৃত। চোখ দু'টো আধা-খোলা। মুখ বন্ধ। টপ্‌টপ্ করে পানি ঝরছে মাথা থেকে। এগুলো কেমিক্যাল। মাথাটা যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য কেমিক্যাল দিয়ে রাখা হয়েছে। পুরোহিত বললেন, 'দেহটি কুমীরদের খেতে দিয়েছি। এর সঙ্গীদেরও আমরা জীবন্ত ঝিলে নিক্ষেপ করেছি। অভুক্ত কুমীরগুলো খেয়ে ফেলেছে ওদের।'

'মাথাটা আমাদেরকে দিয়ে দিন, সঙ্গীদের নিয়ে দেখাব আর বলব, যে-ই আংগুকের দেবতার অবমাননা করবে, তাকেই এই পরিণতি ভোগ করতে হবে।' বললেন কমাণ্ডার।

'দিতে পারি। তবে শর্ত হল, সূর্যাস্তের আগে-ই ফিরিয়ে দিতে হবে। আংগুকের দেবতা এর মালিক। ফেরত না দিলে তোমার মাথাটাও কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।' বললেন পুরোহিত।

❁❁❁

তিনদিন পর। রজবের কর্তিত মস্তক পড়ে আছে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর পায়ের কাছে। গভীর ভাবনায় হারিয়ে যান সুলতান।

সে রাতের-ই ঘটনা। বারান্দায় শুয়ে আছেন আহমদ কামাল ও মেয়েটি। ছ'দিন ধরে দু'জনে তারা থাকছেন একত্রে। মেয়েটির দাবী অনুযায়ী আহমদ কামালকে রাখা হয়েছে তার সাথে– এক ঘরে। মেয়েটি বলছে, এক্ষুণি সে মুসলমান হতে প্রস্তুত। আহমদ কামালকে সে বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আহমাদ কামাল বলছেন, 'আগে কর্তব্য পালন কর; তারপর বিয়ে।' মেয়েটি আশংকা ব্যক্ত করে যে, কাজ উদ্ধার করে তাকে ধোঁকা দেয়া হবে। আহমদ কামাল এখনও তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এতদিনে মেয়েটির মনের সব ভয় দূর হয়ে গেছে। এখন শান্ত মনে ভাবতে পারছে সে।

আহমদ কামাল ও মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে বারান্দায়। বাইরে প্রহরায় নিয়োজিত একজন সিপাহী। মধ্য রাতের খানিক আগে প্রহরী হাঁটতে হাঁটতে সরে যায় অন্যদিকে। এমন সময়ে কে যেন পিছন থেকে ঘাড় চেপে ধরে মেয়েটির। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বেঁধে দেয়া হয় তার মুখে। রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় তার হাত-পা।

তারা চারজন। ঘরের দরজা ছিল বন্ধ। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যায় একজন। আরেকজন তার কাঁধে পা রেখে দেয়াল টপকে প্রবেশ করে ভিতরে। ভিতর থেকে দরজা খুলে দেয় সে। বাকী তিনজনও ঢুকে পড়ে ভিতরে।

চারজনের মধ্যে অধিক সবল লোকটি মুখে কাপড় বেঁধে দেয় মেয়েটির। জাগতে না জাগতে মেয়েটিকে সে ঝাঁপটে ধরে কাঁধে তুলে নেয়। অপর তিনজন আহমদ কামালের মুখেও কাপড় পেঁচিয়ে, রশি দিয়ে হাত-পা শক্ত করে বেঁধে খাটের উপর-ই ফেলে রাখে। প্রতিরোধ করার সব সুযোগ বন্ধ করে দেয় তার। বাইরে নিয়ে গিয়ে মোটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নেয়া হয় মেয়েটিকে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, কাঁধের বস্তুটি মানুষ।

শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে ফেরআউনী আমলের জীর্ণ-পরিত্যাক্ত বিশাল এক বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন এক ভুতের নগরী। ভীতিকর অনেক রূপকথা শোনা যায় বাড়িটির ব্যাপারে। যেমনঃ ভিতরে আছে উঁচু একটি পাথরের টিলা। এই টিলা কেটে নির্মাণ করা হয়েছে অসংখ্য কক্ষ। তার নীচে আছে আরো বেশ ক'টি কক্ষ। বাড়িটি সম্পর্কে যার সম্যক ধারণা আছে, ভিতরে প্রবেশ করে সে-ই কেবল ফিরে আসতে পারে। অন্যথায় মৃত্যু অবধারিত। পথ-ঘাট কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে গেছে, ঠাহর

রাখা দুষ্কর। দীর্ঘদিন ধরে এ বাড়িতে প্রবেশ করার সাহস করছে না কেউ। বাড়িটি এখন জিন-ভূত, দৈত্য-দানবের আবাস। সাপ-খোপ যে কত কি আছে, তার তো কোন ইয়ত্তা-ই নেই। সাপের ভয়ে বাড়ির পাশ দিয়েও হাঁটে না কেউ। এমনি আরো অনেক ভীতিপ্রদ কল্প-কাহিনী।

তথাপি এই চারজন মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে এই ভুতের বাড়িতে-ই ঢুকে পড়ে এবং বেরও হয় এমনভাবে যেন এখানেই তাদের বাস।

মেয়েটিকে নিয়ে তারা বাড়িটির গুহাসম কক্ষাদি ও আঁকা-বাঁকা ঘোর অন্ধকার অলি-গলি অতিক্রম করে অবাধে-অনায়াসে শাঁই শাঁই করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সামনে কতগুলো প্রদীপ জ্বলছে। তাদের পায়ের আওয়াজে চামচিকাগুলো উড়াউড়ি, ফড়ফড় করতে শুরু করে। টিকটিকি ও সরিসৃপগুলো ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে পালাতে থাকে। মাকড়সার জাল আর ময়লা-আবর্জনায় ভিতরটা পরিপূর্ণ।

মেয়েটিকে নিয়ে তারা পাথর কেটে নির্মিত একটি কক্ষে প্রবেশ করে। দীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। আলো দিয়ে পথ দেখিয়ে আগে হাঁটতে শুরু করে লোকটি।

সামনে নীচে অবতরণের কয়েকটি সিঁড়ি। তারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ে। একদিকে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ে প্রশস্ত একটি কক্ষে। মেঝেতে বিছানা পাতা। বহুমূল্যের মনোরম একটি শতরঞ্জী শোভা পাচ্ছে তাতে। কক্ষটি বেশ সাজানো-গোছানো পরিপাটি। বিছানায় রেখে মুখের কাপড় সরিয়ে দেয়া হয় মেয়েটির। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলে, 'আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা হল কেন? আমি মরে যাব, কাউকে আমার কাছে আসতে দেব না।'

'ওখান থেকে যদি তুলে না আনা হত, তাহলে আগামীকাল-ই তোমাকে জল্লাদের হাতে অর্পণ করা হত। আমার নাম ফয়জুল ফাতেমী। তোমাকে আমার নিকট-ই আসবার কথা ছিল। আর দু'জন কোথায়? তুমি একা ধরা পড়লে কিভাবে? রজব কোথায়?' বলল এক ব্যক্তি।

নিশ্চিন্ত হল মেয়েটি। বলল, 'আমি যীশুর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। বড় বড় ভয়ানক বিপথ থেকে রক্ষা করে শেষ পর্যন্ত আমায় তিনি গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিলেন!' এই বলে মেয়েটি ফয়জুল ফাতেমীর নিকট রজব, হাবশী গোত্র, মরুঝড়, সঙ্গী দু'মেয়ের করুণ মৃত্যু ও আহমদ কামালের হাতে ধরা পড়া পর্যন্ত সব কাহিনী আনুপুংখ বিবৃত করে। ফয়জুল ফাতেমী তাকে সান্ত্বনা দেন এবং যে চার ব্যক্তি মেয়েটিকে অপহরণ করে এনে দিয়েছে, ছয়টি করে সোনার টুকরা দিয়ে বললেন, 'তোমরা নিজ নিজ পজিশনে অবস্থান নাও। আমি কিছুক্ষণ পরে চলে যাব। এই মেয়েটি তিন-চারদিন এখানে থাকবে। আমি রাতে রাতে আসব। বাইরের খোঁজাখুঁজি শেষ হয়ে গেলে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাব।'

অপহরণকারী চার ব্যক্তি চলে যায় এবং ভবনটির চারদিকে এমনভাবে অবস্থান নিয়ে বসে, যেন বাইরের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা যায়।

ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে এক ব্যক্তি থেকে যান। ইনি মিসরী ফৌজের একজন কমান্ডার। ফয়জুল ফাতেমী তার এই সাফল্যে বেশ উৎফুল্ল। পাশাপাশি অপর মেয়ে দু'টোর মৃত্যুতে শোকাহতও বটে। রজবের পরিণতির সংবাদ এখনো তার কানে

পৌঁছেনি। তিনি বললেন, 'রজবকে ওখান থেকে বের করে আনা আবশ্যক। সে সালাহুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যা করার একটা আয়োজন সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ আমি এখনো জানতে পারিনি। সম্ভবতঃ ফেদায়ীদের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে। এ দু'টো লোককে হত্যা করা এ মুহূর্তে বড্ড প্রয়োজন। এখন আমার নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে কাল-ই আমি তোমাকে বিষয়টি অবহিত করব। এখন তুমি বিশ্রাম কর, আমি এখন যাই।'

'আপনার উপর সালাহুদ্দীন আইউবীর আস্থা আছে কেমন?' জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

'এত বেশী যে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তিনি আমার পরামর্শ নেন।' জবাব দেন ফয়জুল ফাতেমী।

'আমি জানতে পারলাম যে, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে সালাহুদ্দীন আইউবীর ওফাদার লোকের সংখ্যা-ই অধিক। আর সেনাবাহিনীও তার অনুগত।' বলল মেয়েটি।

'কথা ঠিক। তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ, এত-ই বিচক্ষণ ও সতর্ক যে, কোথাও কেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেই তাঁর খবর হয়ে যায়। তবে পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আরো দু'জন লোক আছেন, যারা আইউবীর বিরুদ্ধে কাজ করছেন। মুহতারাম ফয়জুল ফাতেমী আপনাকে তাদের নাম বলতে পারবেন।' বলল মিসরী কমান্ডার।

ফয়জুল ফাতেমী দু'জনের নাম বললেন এবং মুচকি হেসে বললেন, তোমাকে উচ্চ পর্যায়েই কাজ করতে হবে। আপাততঃ তোমার দায়িত্ব দু'জন কর্মকর্তার মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা আর দু'জনকে বিষ খাওয়ানো, তোমার পক্ষে তা একেবারে সহজ। তবে সমস্যা হল, তোমাকে প্রকাশ্য সভা-সমাবেশে নিতে পারব না। তোমাকে পর্দানশীল মুসলিম নারীর বেশ ধরে কাজ করতে হবে। নতুবা ধরা পড়ে যাবে। এমনও হতে পারে, আমি তোমাকে ফিলিস্তীন ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে তোমার স্থলে অন্য মেয়ে আনিয়ে নেব, যাকে এখানকার কেউ চিনবে না। আমি যে গ্রুপ তৈরি করেছি, তার সদস্যরা অত্যন্ত বিচক্ষণ, অতীব তৎপর। সালারের নীচের কমান্ডার পর্যায়ের লোক তারা। এই চার ব্যক্তি– যারা এত বীরত্বের সাথে তোমাকে তুলে আনল– সে গ্রুপের-ই লোক।

আইউবীর বাহিনীতে আমরা অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু করেছি। সেনাবাহিনী ও জনগণের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা জরুরী। বর্তমান অবস্থাটা হল, সিরীয় ও তুর্ক বাহিনী সদাচার, উন্নত চরিত্র এবং যুদ্ধের স্পৃহার কারণে মিসরীদের কাছে বেশ সমাদৃত ও শ্রদ্ধার পাত্র। সুদানীদেরকে পরাজিত করে তারা নগরবাসীদের মনে আরো শক্ত আসন গেড়ে নিয়েছে। সেনাবাহিনীর এই মর্যাদাকে আমাদের ক্ষুণ্ন করতে হবে। অপদস্থ করতে হবে সালার ও অপরাপর সামরিক কর্মকর্তাদের। এছাড়া আমরা ক্রুসেডার ও সুদানীদের আর কোন সাহায্য করতে পারি না। সরাসরি আক্রমণ কখনো সফল হবে না।

আইউবীর সেনাবাহিনী তাকে কামিয়াব হতে দিবে না। দেশের জনগণ সঙ্গ দেবে সেনাবাহিনীর। মিসরের একদিক থেকে যদি খৃষ্টানরা আর অপরদিক থেকে সুদানীরা একযোগেও হামলা চালায়, তবু আইউবীকে তারা পরাস্ত করতে পারবে না। তখন দেশের জনগণ আর সেনাবাহিনী মিলে কায়রোকে একটি শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করবে। কায়রোকে জয় করার জন্য আগে আমাদের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। জনসাধারণের চিন্তা-চেতনায় অলিক ধ্যান-ধারণা ও সংশয় প্রবণতা এবং যুবকদের চরিত্রে যৌনপূজা ও লাম্পট্য সৃষ্টি করতে হবে।'

'আমাকে তো অবহিত করা হয়েছিল, এ কাজ দু'বছর ধরে চলে আসছে।' বলল মেয়েটি।

'তা ঠিক। বেশ সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। আগের তুলনায় অপকর্ম বেড়েছে। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবী একে তো নতুন ধরনের মাদ্রাসা খুলেছেন, দ্বিতীয়তঃ মসজিদগুলোতে খোতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়ে ভিন্ন এক চমক সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া তিনি মেয়েদেরকেও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছেন।' বললেন ফয়জুল ফাতেমী।

ফয়জুল ফাতেমী আরো কি যেন বলতে চাইছিলেন। এমন সময়ে একজন প্রহরী হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফয়জুল ফাতেমীকে বলে, 'এ মুহূর্তে আপনি বেরুবেন না। বাইরে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

ফয়জুল ফাতেমী ঘাবড়ে যান। প্রহরীর সঙ্গে কক্ষের বাইরে চলে আসেন। একটি উঁচু জায়গায় চুপিসারে বসে বাইরের দিকে তাকান। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। দিনের আলোর ন্যায় বাইরের সবকি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইতিউতি তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এ যে আইউবীর সৈন্য! ঘোড়াও তো আছে দেখছি! চারদিক ভাল করে দেখে আস, আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাতে পারি!'

'দেখা আমার হয়ে গেছে। কোন দিকে পালাবার পথ নেই। তারা পুরো প্রাসাদ ঘিরে রেখেছে। আপনি ওখানেই চলে যান। বাতিগুলো নিভিয়ে দিন। ওখান থেকে বের হলে ভুল করবেন। শত্রুরা ঐ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না।' বলল প্রহরী।

ফয়জুল ফাতেমী অদৃশ্য হয়ে যান। প্রহরী উঁচুস্থান থেকে নেমে ভিতরে না গিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে পঞ্চাশজন পদাতিক সৈনিক। অশ্বারোহী বিশ-পঁচিশজন। তারা গোটা প্রাসাদটিকে অবরোধ করে রেখেছে। লোকটি পা টিপে টিপে চলে যায় তাদের নিকট। এক সৈনিককে জিজ্ঞেস করে 'আলী বিন সুফিয়ান কোথায়?' ইংগিতে আলীকে দেখিয়ে দেয় সৈনিক। প্রহরী দৌড়ে যায় তাঁর কাছে। আলীর সঙ্গে আহমদ কামাল। প্রহরী বলল, 'ভিতরে কোন আশংকা নেই। আপনার সঙ্গে আর দু'জন লোক হলেই চলবে। আমার সঙ্গে আসুন।'

যে চারজন লোক মেয়েটিকে অপহরণ করে এনেছিল, এ প্রহরী তাদের-ই একজন।

দু'টি মশাল প্রজ্বলিত করান আলী। আহমদ কামাল এবং চার সৈনিককে সঙ্গে নেন। দু'জনের হাতে দু'টি মশাল ধরিয়ে দেন, তরবারী কোষমুক্ত করেন সকলে। প্রহরীর পিছনে পিছনে ঢুকে পড়েন ভিতরে। ফয়জুল ফাতেমীর প্রহরী এখন আলী বিন সুফিয়ানের রাহ্বার। হঠাৎ কে একজন একদিক থেকে ছুটে এসে শাঁ করে চলে যায় ভিতরে। রাহ্বর বলল, 'এই যে গেল, বেটা ওদের লোক। টের পেয়ে ভিতরের লোকদেরকে সতর্ক করতে গেল। আপনারা আরো দ্রুত হাঁটুন।' তীব্রবেগে এগিয়ে চললেন তারা। পথ দেখিয়ে নেয়ার কেউ না থাকলে এই আঁকা-বাঁকা পথে ঢুকে তারা দিশে হারিয়ে ফেলত কিংবা ভয়ে পালাতে বাধ্য হত। কিন্তু এখন তারা রাহবরের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দেই অগ্রসর হচ্ছে। অন্য একদিক থেকে দৌড়ে এল আরেকজন। পার্শ্ব দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, 'আমি ওদিকে যাচ্ছি। আপনারা আরো তাড়াতাড়ি আসুন।' এ লোকটি রাহবরের সঙ্গী।

নীচে অবতরণের সিঁড়ির পার্শ্বের কক্ষে পৌঁছে যান আলী। নীচের কক্ষ থেকে কথার শব্দ ভেসে আসে তাঁর কানে, 'আমরা প্রতারণার শিকার। এরা দু'জন ওদের লোক।' তারপর তরবারীর সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে কথা বলার আওয়াজ, 'একেও শেষ করে দাও, যেন কোন সাক্ষ্য দিতে না পারে।'

মশালধারীদের পিছনে পিছনে দ্রুতগতিতে নীচে নেমে পড়েন আলী বিন সুফিয়ান ও আহমদ কামাল। রক্তের জোয়ার বইছে কক্ষে। দু' হাতে পেট চেপে ধরে বসে আছে মেয়েটি। ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে যে মিসরী কমান্ডার বসা ছিল, সে এবং আরেক ব্যক্তি লড়ছে ফয়জুল ফাতেমী ও তার এক প্রহরীর সঙ্গে। ফয়জুল ফাতেমীকে অস্ত্রত্যাগ করতে বললেন আলী বিন সুফিয়ান। সে হাতের তরবারী ছুঁড়ে ফেলে। আহমদ কামাল দৌড়ে যান মেয়েটির কাছে। পেট বিদীর্ণ হয়ে গেছে তার। বিছানার চাদরটি টেনে নিয়ে আহমদ কামাল মেয়েটির পেটটা কষে বেঁধে দেন এবং আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'অনুমতি হলে একে আমি বাইরে নিয়ে যাই।' আলীর অনুমতি পেয়ে আহমদ কামাল মেয়েটিকে নিজের দু' বাহুর উপর তুলে নেন। যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছিল মেয়েটি। বড় কষ্ট হচ্ছিল তার। তারপরও মুখে হাসি টেনে বলল, 'আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি; তোমাদের আসামীকে আমি ধরিয়ে দিয়েছি।'

ফয়জুল ফাতেমীকে এবং যে চারজন লোক মেয়েটিকে অপহরণ করেছিল, তাদের দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাকী দু'জন আর ফয়জুল ফাতেমীর সঙ্গে থাকা মিসরী কমান্ডার আলী বিন সুফিয়ানের লোক।

এটি ছিল একটি নাটক। ফয়জুল ফাতেমীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করার জন্য এ নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। মেয়েটি সহযোগিতা করেছে পুরোপুরি। কিন্তু আহত হয় নিজে।

নাটকটি এভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল যে, মেয়েটির গ্রুপের একজন অপরজনের পরিচয় লাভের জন্য যেসব গোপন সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করার কথা, তার থেকে সেই ভাষা জেনে নেয়া হয়। মেয়েটি আরও জানিয়েছে যে, তার আগমন করার কথা ফয়জুল ফাতেমীর নিকট। আলী বিন সুফিয়ান তাঁর তিনজন বিচক্ষণ গোয়েন্দাকে কাজে লাগান। তাদের একজন ছিলেন কমান্ডার পদের লোক। তাদেরকে গোপন ভাষা শিখিয়ে দিয়ে বলা হয়, ফয়জুল ফাতেমীর নিকট গিয়ে তাকে বলবে, তিন মেয়ের একজন এখানে এসে গেছে। কিন্তু সে অমুকের হাতে অমুক ঘরে বন্দী। সেখান থেকে তাকে সহজে বের করে আনা যায়। তাদেরকে একথাও বলা হয় যে, ফয়জুল ফাতেমীকে একটি ভূয়া পয়গাম শোনাবে যে, রজব যে করে হোক, মেয়েটিকে রক্ষা করতে এবং তৎপরতা জোরদার করতে বলেছেন।

আলী বিন সুফিয়ানের নিয়োজিত গুপ্তচররা তিনদিনের মধ্যে ফয়জুল ফাতেমীর নাগাল পেতে সক্ষম হয় এবং তাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তারা তার গুপ্ত বাহিনীর সদস্য। ফয়জুল ফাতেমী এ আশংকাও বোধ করেন যে, বন্দী মেয়েটি নির্যাতনের মুখে তার সংশ্লিষ্টতার কথা ফাঁস করে দিতে পারে। তাই বিলম্ব না করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। আলী বিন সুফিয়ানের প্রেরিত কমান্ডারকে তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। অবশিষ্ট তিনজনের দু'জন আর নিজের দু' ব্যক্তিকে নিয়ে চারজনের হাতে মেয়েটিকে তুলে আনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। মেয়েটিকে অপহরণ করে ফেরআউনী আমলের যে জীর্ণ ভবনটিতে পৌঁছিয়ে দেয়ার কথা, সে ভবনটিকে ফয়জুল ফাতেমী বেশ কিছুদিন ধরে তাদের গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

ফয়জুল ফাতেমীর এ পরিকল্পনার বিস্তারিত রিপোর্ট আলী বিন সুফিয়ানের কানে চলে আসে। কোন্ দিন কখন এই অভিযান পরিচালিত হবে, আলী বিন সুফিয়ান তা-ও অবগত হন। আহমদ কামাল ও মেয়েটিকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বলা হয়, এ রাতে মেয়েটিকে অপহরণ করা হবে। তোমরা বারান্দায় ঘুমাবে। আক্রমণ হলে প্রতিরোধের চেষ্টা করবে না।

মেয়ে ও আহমদ কামালের বাসস্থানের বাইরে প্রহরায় নিয়োজিত লোকটি গোয়েন্দা বিভাগের একজন সদস্য। কোন রাতে কিভাবে আক্রমণ হবে, তার কী করণীয়, সব তার জানা ছিল। আক্রমণকারীরা ছিল আলী বিন সুফিয়ানের লোক। ফয়জুল ফাতেমীর লোক হলে খঞ্জরের আঘাতে তাকে খুন করত আগে।

এ রাতে ফয়জুল ফাতেমী ও কমান্ডার জীর্ণ ভবনে চলে যান। নির্দিষ্ট সময়ে অপহরণ অভিযান শুরু হয়। পাহারাদার আগেই এক দিকে কেটে পড়ে। অপহরণকারী দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে। আহমদ কামাল জাগ্রত। কিন্তু ঘুমের ভান করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। মেয়েটিকে তুলে নিয়ে অপহরণকারীরা যখন তার হাত-পা বাঁধতে

শুরু করে, তখন তিনি ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করেন। অপহরণকারীরা মেয়েটিকে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়।

অপহরণের পর আলী বিন সুফিয়ান এসে আহমদ কামালের হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী পূর্ব থেকে-ই প্রস্তুত ছিল। অল্পক্ষণ পর তারা ফয়জুল ফাতেমীর আস্তানা অভিমুখে রওনা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা ভবনটিকে ঘিরে ফেলেন।

ভিতর থেকে আলী বিন সুফিয়ানেরই এক ব্যক্তি তাদের দেখে কক্ষে গিয়ে ফয়জুল ফাতেমীকে সংবাদ দেয়। ফয়জুল ফাতেমীকে কক্ষের বাইরে নিয়ে এসে অবরোধ দেখিয়ে তাকে কক্ষে চলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। তার-ই পরামর্শে ফয়জুল ফাতেমী বের হওয়ার চেষ্টা না করে তার গোপন কক্ষে চলে যায়।

লোকটি আলী বিন সুফিয়ান ও আহমদ কামালকে ভিতরে নিয়ে যায়। পথ দেখিয়ে পৌঁছিয়ে দেয় ফয়জুল ফাতেমীর কক্ষে। ঠিক শেষ মুহূর্তে ফয়জুল ফাতেমী বুঝতে পারে যে, মিসরী কমান্ডার এবং মেয়েটির সংবাদ নিয়ে আসা দুই ব্যক্তি আসলে তার দলের লোক নয়। তিনি প্রতারণার শিকার। মেয়েটি একটি ভুল করেছে, তার মুখ থেকে এমন কিছু কথা বেরিয়ে গেছে, যাতে ফয়জুল ফাতেমী বুঝে ফেলেছেন, সে-ও এ প্রতারণায় জড়িত।

বিপদ দেখে ফয়জুল ফাতেমীর দু' প্রহরী চলে যায় তার কাছে। কক্ষের ভিতরে লড়াই শুরু হয়ে যায়। ফয়জুল ফাতেমী তরবারীর পিঠ দিয়ে আঘাত করে মেয়েটিকে আহত করে। পেট কেটে যায় তার।

ফয়জুল ফাতেমী ও তার দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন আলী। তিনজনকে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখেন। তাদেরকে রজবের কর্তিত মাথা দেখিয়ে বলেন, 'বন্ধুর পরিণতি দেখে নাও। তবে সরাসরি হত্যা করে আমি তোমাদের সাজা শেষ করে দেব না। দেশদ্রোহী ঈমান-বিক্রেতাদের দলে আর কে কে আছে, তোমাদের মুখ থেকে তা বের করে ছাড়ব। গাদ্দারীর পরিণতি যে কত ভয়াবহ, হাড়ে হাড়ে টের পাবে তোমরা। তোমাদেরকে আমি মরতেও দেব না, বাঁচতেও দেব না।'

আহত মেয়েটির অবস্থা ভাল নয়। সর্বশক্তি ব্যয় করে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে ডাক্তারগণ। কিন্তু তার কাটা নাড়ি-ভুড়ি জোড়া দেয়া গেল না। কিন্তু তারপরও মেয়েটি নিশ্চিন্ত-উৎফুল্ল, যেন তার কিছু-ই হয়নি। দাবি তার একটি-ই, বিদায় বেলা আহমদ কামালকে আমার শিয়রে বসিয়ে রাখুন। পলকের জন্য আহমদ কামালকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছে না সে।

সুলতান আইউবী মেয়েটিকে দেখতে আসেন। আহমদ কামাল তার মাথার কাছে বসা। সুলতান কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতে উদ্ধত হন তিনি। কিন্তু
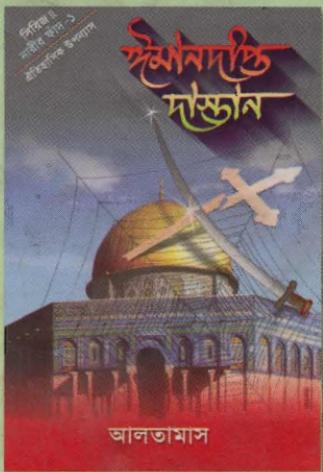
মেয়েটি খপ্ করে তার হাত ধরে টান দিয়ে বসিয়ে ফেলে তাকে। সমস্যায় পড়ে যান আহমদ কামাল। সুলতানের উপস্থিতিতে তিনি বসতে পারেন না। সংকোচে মাথা নুয়ে আসে তার। সুলতান তাকে মেয়েটির কাছে বসবার অনুমতি দেন। সুলতান সস্নেহে মেয়েটির মাথায় হাত বুলান, সুস্থতার জন্য দোয়া করেন।

তৃতীয় রাত্র। আহমদ কামাল বসে আসেন মেয়েটির শিয়রে। হঠাৎ মেয়েটি চোখ তুলে তাকায় আহমদ কামালের প্রতি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'আহমদ! তুমি আমায় বিয়ে করে নিয়েছ, না? আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। তুমিও তোমার ওয়াদা পূরণ করেছ! আল্লাহ আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন . . . . .।'

কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠে মেয়েটির। আহমদ কামালের ডান হাতটি নিজের দু'হাতে চেপে ধরা ছিল তার। ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে আসে হাতের বন্ধন। টের পান আহমদ কামাল। কালেমা তাইয়্যেবা পড়তে পড়তে আহমদ কামাল মেয়েটিকে তুলে দেন আল্লাহর হাতে। পর দিন সুলতান আইউবীর নির্দেশে মেয়েটিকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দু' দিনের নির্যাতনেই ফয়জুল ফাতেমী ও তার সঙ্গীদ্বয় দলের সকলের নাম বলে দেয়। গ্রেফতার করা হয় তাদেরও। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদী লিখেছেন, ফয়জুল ফাতেমীর মৃত্যুদণ্ডাদেশে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে অঝোরে কেঁদে ফেলেছিলেন সুলতান আইউবী।

**প্রথম খণ্ড সমাপ্ত**

দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে খৃষ্টানরা। অর্থ-মদ আর রূপসী নারীর ফাঁদে আটকিয়ে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমীর ও শাসকদের। একদল গাদ্দার তৈরী করে নিতে সক্ষম হয় তারা সুলতান আইউবীর হাই কমান্ড ও প্রশাসনের উচ্চস্তরে। সেই স্বজাতীয় গাদ্দার ও বিজাতীয় ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যান ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী। তাঁর সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দ চিত্রায়ন 'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'। বইটি শুরু করার পর শেষ না করে স্বস্তি নেই। সব বয়সের সকল পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের জ্ঞান ও উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান আলোকিত উপাদান

আবাবীল পাবলিকেশন্স